অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২১

নিরীক্ষা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর গণমাধ্যম সাময়িকী

২৩৮তম সংখ্যা

অর্থনীতি বিষয়ক সাংবাদিকতা

নিরীক্ষা

২৩৮তম সংখ্যা: অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২১

সংবাদমাধ্যমে খবর ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ বা সম্প্রচারই সাংবাদিকতা। তিন ধরনের সংবাদ দিয়ে বিশ্বের প্রথম সংবাদপত্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল। তিনের মধ্যে অর্থনীতিবিষয়ক সাংবাদিকতাও ছিল। সংবাদপত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও দেখা যায়, জন্মলগ্ন থেকেই অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার সূত্রপাত। অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা হচ্ছে, আর্থিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম বিষয়ে সংবাদ পরিবেশন। সময়ের হাত ধরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি ও প্রসারের সঙ্গে সমান্তরালভাবেই অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা এগিয়ে চলে। একসময় রাজনীতি, সরকার, অপরাধ প্রভৃতি বিষয়ে মানুষের আগ্রহ অর্থনীতিবিষয়ক সংবাদ থেকে বেশি ছিল। সেসময় অর্থনীতিবিষয়ক সাংবাদিকতায় আজকের মতো আলাদা কোনো বিট বা পৃথক কোনো ব্যক্তি দায়িত্বে ছিলেন না। সহজ করে বললে, বিশ শতকের শুরুর দশক পর্যন্ত অর্থনৈতিক সংবাদ পাঠকের তেমন কোনো মনোযোগ টানতে পারেনি। অর্থনীতির নানা প্রবণতা, ব্যাবসার নানা বিষয় জটিলই মনে করত সাধারণ মানুষ। অর্থনীতিকে সহজবোধ্য করার জন্যই মূলত অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার আধুনিকায়নের সূচনা। এই ক্ষেত্রে কিছু ব্যবসায়ী পরিবারের যোগাযোগের স্বার্থই বড়ো ভূমিকা রাখে। সেই পথ ধরে বাংলাদেশে অর্থনীতিবিষয়ক সাংবাদিকতা আজ অনেক দূর এগিয়েছে।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে অপরিমেয় ক্ষতি হয় আমাদের অর্থনীতির। দেশ স্বাধীনের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে সমৃদ্ধ করার কাজ শুরু করেন। তিনি দেশের অবকাঠামো নির্মাণসহ ব্যাংক, বিমা, শিল্প-কারখানা, বাণিজ্যিক ক্ষেত্রগুলো জাতীয়করণ করে দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনেন। নানাভাবে সম্পৃক্ত করেন বিশাল জনগোষ্ঠীকে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু ঘাতকদের হাতে নিহত হওয়ার পর অর্থনীতির ওই চলমান গতি সম্পূর্ণ বদলে যায়। নানা অজুহাতে ১৯৭৬ সালে সামরিক সরকারের হাত ধরে শুরু হয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণ। অর্থাৎ সরকারি শেয়ার ৪৯ শতাংশ, বেসরকারি শেয়ার ৫১ শতাংশ। পুঁজির টাকা দেওয়ার মতো সক্ষমতা ছিল না অনেকেরই। তাই সামরিক সরকার নিজের লোকদের সরকারি ব্যাংক থেকে ঋণ দিয়ে পুঁজি (মালিকানা) সরবরাহ করে। খেলাপি ঋণের প্রচলনও মূলত তখন থেকেই শুরু।

তবে আশার কথা, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আজ সুদূরপ্রসারিত। হতশ্রী দরিদ্র দেশ আজ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। মানুষের মাথাপিছু আয় সেই ১৪০ থেকে আজ ২ হাজার ৫৫৪ ডলার। উত্তরণের পথ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অর্থনীতির আকার যত বড়ো হচ্ছে, অর্থনীতির খবরও তত হচ্ছে। এ ধরনের খবরের প্রতি মানুষের আগ্রহও বাড়ছে। একসময় যেখানে অর্থনীতির খবর খুঁজতে হতো, এখন বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় একাধিক অর্থনীতিবিষয়ক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। বিভিন্ন পত্রিকায় আলাদা অর্থ-বাণিজ্য পাতাও রয়েছে। সংবাদমাধ্যমের বড়ো একটি অংশজুড়ে থাকছে অর্থনীতির খবর। টিভি চ্যানেলগুলোয় অর্থ-বাণিজ্য রিপোর্টকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। অর্থনীতি নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন, টকশো সম্প্রচার হচ্ছে। অর্থনীতিবিষয়ক সংবাদ নিয়ে বিশ্লেষণ হচ্ছে। উদ্যোক্তাদের পথের দিশা দিচ্ছেন সাংবাদিকরা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় সাংবাদিকতা পড়ালেখায় অর্থনীতি ও ব্যাবসা-বাণিজ্যবিষয়ক সাংবাদিকতাকে গুরুত্ব দিয়ে পড়ানো হয়। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) বিভিন্ন সময়ে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও প্রকাশনার মাধ্যমে অর্থনীতিবিষয়ক সাংবাদিকতাকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করে আসছে।

সময়ের হাত ধরে বাংলাদেশে অর্থনীতিবিষয়ক সাংবাদিকতা এখন পরিপূর্ণ ও অনুকরণীয়। সেই প্রেক্ষাপটে এবারের পিআইবির প্রকাশনা 'নিরীক্ষা'কে সাজানো হয়েছে অর্থনীতিবিষয়ক সাংবাদিকতা দিয়ে। সংখ্যাটিতে দেশখ্যাত অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিকদের মতামত ও অভিজ্ঞতা সংযোজিত হয়েছে। আশা করি পাঠক, গবেষক ও সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন পূরণে সংখ্যাটি সক্ষম হবে।

সম্পাদক
জাফর ওয়াজেদ

সহকারী সম্পাদক
দুলাল কৃষ্ণ আচার্য

সহ-সম্পাদক
আকিল উজ জামান খান

শিল্প নির্দেশনা
সোহেল আশরাফ খান

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সংশোধক
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান
মো. লুৎফর রহমান

সূ|চি|প|ত্র

ব্যবসায় সাংবাদিকতার পাঁচ দশক ৩
অজয় দাশগুপ্ত

অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার ৫০ বছর ৭
ড. আর এম দেবনাথ

বঙ্গবন্ধু অবাধ বাজার অর্থনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না ১১
ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার গতিপ্রকৃতি: অতীত ও বর্তমান ১৬
তানভীর আহমদ

বাণিজ্য সাংবাদিকতা: কোথায় আছি, কোথায় যাব ২১
শওকত হোসেন

সাংবাদিকতার নয়া ক্ষেত্র 'ব্যাবসা ও মানবাধিকার রিপোর্টিং' ২৬
মাহামুদুল হক

অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার পাঁচফোড়ন ৩৩
মামুন অর রশিদ

ব্যবসায় সাংবাদিকতায় নৈতিকতা: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ৩৫
মামুন আ. কাইউম

অর্থ ও ব্যাবসা-বাণিজ্যবিষয়ক সাংবাদিকতা: শুরু থেকে শেষ ৩৮
মিনহাজ উদ্দীন

অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় প্রতিবেদন তৈরির কৌশল ৪১
আবুজার

দেশে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার বিস্তার ৪৫
মনোয়ার হোসেন

৪৭ **অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা: বিবর্তন ও করণীয়**
কাওসার রহমান

৫১ **অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি এবং অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা**
নিরঞ্জন রায়

৫৮ **স্বাধীনতার ৫০: উন্নয়ন অভিযাত্রায় অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা**
জামাল উদ্দীন

৬০ **এবং অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা**
সুশান্ত সিনহা

৬৪ **ডিজিটাল গণমাধ্যমের অর্থনীতি, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা**
পপি দেবী থাপা

৬৭ **সম্পাদনা ও প্রুফরিডিং প্রকাশনাশিল্পের প্রাণ**
মুস্তাফা মাসুদ

৭৩ **আহমদুল কবির সংবাদের কালপরিক্রমায়**
সালাম জুবায়ের

৭৫ **যুদ্ধদিনের অকুতোভয় বন্ধুর চিরবিদায়**
দুলাল আচার্য

৭৮ **সংবাদপত্রের টিকে থাকা না থাকা**
জাফর ওয়াজেদ

৮১ **গণমাধ্যম সংবাদ**

৮৯ **পিআইবি সংবাদ**

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd
পিআইবি'র সকল প্রকাশনা অনলাইনে পেতে হলে : www.rokomari.com
এবং বাতিঘর ঢাকা ও চট্টগ্রাম

মূল্য ৪০ টাকা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং এসোসিয়েট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
ফোন : ৯৩৩৩৪০৩, ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com • ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

প্রবন্ধ

ব্যবসায় সাংবাদিকতার পাঁচ দশক

অজয় দাশগুপ্ত

স্বাধীনতা-পরবর্তী পাঁচ দশকে বাংলাদেশের ব্যবসায় সাংবাদিকতায় কী পরিবর্তন এসেছে–এমন প্রশ্নের উত্তর প্রতীকীভাবে দেওয়া যায়, ১৪০ ডলার থেকে ২,৫৫৪ ডলারে উত্তরণের পথ পর্যালোচনা করুন, সব স্পষ্ট হয়ে যাবে। অর্থনীতির আকার বড়ো হচ্ছে, অর্থনীতির খবর তৈরি হচ্ছে এবং এ ধরনের খবরের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। একসময় যেখানে জাতীয় দৈনিকে অর্থনীতির খবর খুঁজতে হতো, এখন বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় একাধিক দৈনিক প্রকাশিত হচ্ছে, সেখানে কেবলই অর্থনীতির খবর এবং তা নিয়ে বিশ্লেষণ। উদ্যোক্তাদের পথের দিশা দিচ্ছেন সাংবাদিকরা, অন্যদিকে অর্থনীতির প্রসার ও বৈচিত্র্য তৈরি করছে নতুন নতুন খবর।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার বছর ১৯৭১ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ১৪০ ডলার। ২০২১ সালে, অর্থাৎ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর বছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২,৫৫৪ ডলার। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের অর্থনীতির আকার ছিল ছোটো। সবকিছুতেই পরনির্ভর। বাস্কেট কেস বা ভিখারির দেশ–এ অপবাদেও ভিত্তি ছিল বৈকি। এই সীমিত অর্থনীতির অপরিমেয় ক্ষতি হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে। বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর পুনর্বাসন-পুনর্গঠন ছিল বড়ো চ্যালেঞ্জ।

তবে পরিসংখ্যান সর্বদাই গোলমেলে। মাথাপিছু আয় বের করা হয় মোট জাতীয় আয়কে মোট লোকসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে। একজনের বছরে আয় ৫ কোটি ডলার, আরেকজনের ১০ কোটি ডলার এবং অন্যজনের ৫০০ ডলার–গড় হিসাব হবে। কোটিপতি আর পথের ভিখারি–সবাই সমান!

আরেকটি দিক হচ্ছে লোকসংখ্যা। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না।' পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালিদের দাবায়ে রাখতে পারেনি। ২০২১ সালে বাংলাদেশের লোকসংখ্যা অন্তত ১৭ কোটি। এখন জাতীয় আয় কিংবা জিডিপি বা মোট দেশজ আয়কে ১৭ কোটি দিয়ে ভাগ করে মাথাপিছু জাতীয় আয় কিংবা মাথাপিছু জিডিপি বের করতে হয়। ১৯৭১ সালে ৭ কোটি বা সাড়ে ৭ কোটি দিয়ে ভাগ করে এ হিসাব বের করতে হতো। যদি বাংলাদেশ লোকসংখ্যা ১৯৭১ সালের পর্যায়ে স্থির রাখতে পারত এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা বজায় থাকত, তাহলে ২০২১ সালে আমাদের মাথাপিছু আয় কী দাঁড়াত? মধ্যম আয়ের দেশ নয়, বরং উন্নত দেশের সারিতেই থাকত ত্রিশ লাখ শহিদের আত্মদানে অর্জিত বাংলাদেশ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে হয় ব্যবসায় সাংবাদিকতা। বিষয়টি ইকোনমিক জার্নালিজম বা অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা হিসাবেও পরিচিত। 'ব্যবসায় সংবাদিকতা'–এই নামে অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌসের সঙ্গে আমার একটি বই রয়েছে। শ্রেণিকক্ষে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অনেক বিষয় আলোচনা করতে হয়। এর মধ্যে একটি হচ্ছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ব্যবসায় সাংবাদিকতার পারস্পরিক সম্পর্ক। নানা উদাহরণ দিয়ে বলি–শিল্প-বাণিজ্য কর্মকাণ্ড যত বাড়তে থাকে, বিনিয়োগ-অর্থনৈতিক উদ্যোগ যত দৃশ্যমান হতে থাকে, গণমাধ্যমে এ সংক্রান্ত খবর তত প্রকাশ-প্রচার হয়। অন্যদিকে, ব্যাবসায়িক সাংবাদিকতা ব্যাবসায়িক কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করে। বলা যায়, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যত বাড়ে; সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশনে তত অর্থনৈতিক খবর আমরা দেখতে পাই। আবার গণমাধ্যমের খবর বিশ্লেষণ থেকেও অর্থনৈতিক উদ্যোক্তারা উপকৃত হন। তারা শুল্ক-কর, আর্থিক নীতি এবং এ ধরনের অনেক বিষয়ে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত, দেশ-বিদেশের== বারের সম্ভাবনা ও সমস্যা–এসব বিষয়ে গণমাধ্যম সূত্রে জানতে পারেন। অন্যদিকে, তাদের সমস্যা ও প্রস্তাব সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে অবহিত করার জন্য সহায়তা নেয় গণমাধ্যমের।

উদাহরণ হিসাবে বলতে পারি, ভারত ও চীন আমাদের অনেক ধরনের পণ্যে 'শূন্য শুল্ক' সুবিধা দিচ্ছে। এসব পণ্য রপ্তানি করলে কোনো শুল্ক-কর আরোপ করা হয় না। এ তালিকায় থাকা পণ্য রপ্তানি সহজ। সরকারি ও নিজস্ব সূত্র থেকে এই সুবিধা সম্পর্কে উদ্যোক্তারা জানতে পারেন। গণমাধ্যম থেকেও জানা যায়।

আবার দেখা যায়, শুল্ক হার শূন্য হলেও বিভিন্ন দেশ অনেক অশুল্ক বাধা তৈরি করে। গণমাধ্যমে এসব বিষয় নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে উদ্যোক্তারা যেমন তা জানতে পারে, পাশাপাশি নীতিনির্ধারক মহলেও বাধা দূর করার তাগিদ দিয়ে বার্তা যায়।

স্বাধীনতা-পরবর্তী পাঁচ দশকে গণমাধ্যমে অর্থনীতির সংবাদ কতটা এসেছে, কী ধরনের খবর এসেছে এবং সময়ের বিবর্তনে অর্থনৈতিক সংবাদে কেমন পরিবর্তন, সে বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ওপরের আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনায় রাখা দরকার।

পাঁচ দশকে অর্থনীতির আকার যেমন বড়েছে, সমানতালে গণমাধ্যমে বেড়েছে অর্থনীতির খবর। 'ব্যবসায় সাংবাদিকতা' বইটি লেখার সময় পুরোনো সংবাদপত্রের কপি দেখেছি। ১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় অর্থনীতিসংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র চারটি। একই দিনে দৈনিক সংবাদ প্রকাশ করেছিল অর্থনীতি সংক্রান্ত ছয়টি খবর। দৈনিক ইত্তেফাক তখন সর্বমহলে জনপ্রিয় পত্রিকা। বিশেষভাবে শিল্প-বাণিজ্যজগতে যুক্তরা এ পত্রিকাকে নিজেদের মুখপত্র মনে করতেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রথম পছন্দ ছিল দৈনিক ইত্তেফাক। তারপরও পত্রিকাটিতে অর্থনীতিসংক্রান্ত খবর ছিল মাত্র চারটি। কারণ, অর্থনীতির আকার যে ছিল একেবারেই ছোটো!

২০ বছর পর, ১৯৯৩ সালের ৭ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে অর্থনীতিসংক্রান্ত খবর ছিল পাঁচটি এবং সংবাদে চারটি। স্বাধীনতা অর্জনের পরবর্তী ২২ বছরে অর্থনীতির আকার একটু একটু বাড়ছিল। কিন্তু সংবাদপত্রে অর্থনীতির খবর তেমন ছিল না। দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ, দৈনিক বাংলা ছিল বাংলা ভাষায় প্রধান পত্রিকা। ইংরেজি ভাষায়ও পত্রিকা বের হতো। কিন্তু সাপ্তাহিক অর্থনীতির পাতা বের হতো কেবল সংবাদে। অন্য পত্রিকায় প্রতিদিন অর্থনীতির খবর প্রকাশিত হলেও সাপ্তাহিক পাতা বের করার কথা কেউ ভাবেনি। সংবাদ সম্পাদক আহমদুল কবির শিক্ষাজীবনে অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার অর্থনীতির শিক্ষক ছিলেন ড. অমিয় দাশগুপ্ত। তিনি ছিলেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের পিএইচডির শিক্ষক। আহমদুল কবির চাইতেন তার সম্পাদিত সংবাদে নিয়মিত অর্থনীতির পাতা প্রকাশিত হোক। আমি ১৯৯০ সালে সংবাদের বার্তা বিভাগে যোগ দিই। কিছুদিনের মধ্যে এ পাতার সম্পাদনার ভার আমার ওপর অর্পিত হয়। প্রতি সোমবার পাতাটি বের হতো। একপর্যায়ে আমি মাসে অন্তত একবার বিষয়ভিত্তিক পাতা বের করতে শুরু করি। ধান নিয়ে প্রকাশিত পাতায় ধান গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বিজ্ঞানী বলেছিলেন, বাংলাদেশে বছরে দুই কোটি টন চাল উৎপাদন সম্ভব। এটা ২৫-২৬ বছর আগের কথা। খবরটি তখন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এখন কেবল বোরো মৌসুমেই বছরে দুই কোটি টনের বেশি চাল উৎপাদন হয়।

আরেকটি পাতা বের করেছিলাম পোশাকশিল্প নিয়ে। রাশিয়ায় বাণিজ্য সম্ভাবনা নিয়েও বিশেষ পাতা বের হয়। সেসময় এ ধরনের উদ্যোগ পাঠক মহলে সাড়া জাগাত। আর এখন প্রতিদিন অনেক সংবাদপত্র বের করছে বিশেষ পাতা, একটি নয় অনেক পাতা।

সংবাদে কাজ করার সময়েই সেসময়ের জনপ্রিয় সাপ্তাহিক 'যায়যায়দিন'-এ অর্থনীতির কলাম লিখতে শুরু করি। পত্রিকার সম্পাদক শফিক রেহমান খুব আগ্রহী ছিলেন এ আয়োজন নিয়ে। তিনিও অর্থনীতির ছাত্র ছিলেন। সাপ্তাহিক পত্রিকার পৃষ্ঠা ছিল ৩২টি। একদিন তিনি বলেন, বাইরের লেখকদের জন্য চারটি পৃষ্ঠা তিনি বরাদ্দ রেখেছেন। জনপ্রিয় সাংবাদিক আতাউস সামাদ, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, 'ইত্যাদি'-খ্যাত হানিফ সংকেত এবং আকাশচুম্বী জনপ্রিয় হতে থাকা লেখক তসলিমা নাসরিন যায়যায়দিনে নিয়মিত লিখছেন। কিন্তু শফিক রেহমান চাইছিলেন অর্থনীতি বিষয় নিয়ে প্রতি সপ্তাহে একটি পাতা ছাপা হোক। যদিও আগ্রহ বরাবরই ছিল অর্থনীতি নিয়ে, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন বিষয়ে পড়াশোনা করেছি। আমাকে অর্থনীতির মতো নীরস একটি বিষয়ে লিখতে হবে এবং এই চারজনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। লেখক অন্তত পাঁচজন এবং পাতা চারটি। চারটি লেখাই তিনি রাখবেন। নিজের যোগ্যতায় স্থান করে নিতে হবে। আমার সৌভাগ্য যে টানা চার বছর আমি যায়যায়দিনে অর্থনীতির বিষয়ে লিখতে সুযোগ পেয়েছি। একটি সপ্তাহও বাদ যায়নি। প্রতি লেখার জন্য দেওয়া হতো ৩৫০ টাকা। দুই ঈদে বোনাস আরও ৭০০ টাকা। প্রথম লেখার শিরোনাম ছিল 'জাপানি ব্যবসায়ী কালচারাল শক'। দ্বিতীয় লেখা–'আপেলের দামে পেঁয়াজ'। বাজারে পেঁয়াজের কেজি ৪৫ টাকা হওয়ার পর এ লেখা।

সংবাদে কাজ করার সময়েই দৈনিক ভোরের কাগজ প্রকাশিত হয়। সম্পাদক মতিউর রহমান তার ওয়ারীর বাসায় একদিন ডেকে প্রতি সপ্তাহে অর্থনীতি বিষয়ে একটি পাতা বের করার প্রস্তাব দেন। আমি রাজি হই। পাতার নাম দেওয়া হয় 'ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প'। পুরো পাতার লেখা আমাকে তৈরি করতে হতো। পাতাটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন এটিএম আবদুল হাই। প্রায় চার বছর পাতাটির জন্য লিখেছি। এ দৈনিকটি তখন যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। হাই সাহেব বলতেন, এ পাতার লেখা নিয়ে তার কোনো চিন্তা ছিল না। সময়মতো লেখা পৌঁছে যেত। সম্পাদনা করার প্রয়োজন পড়ত না। যতটা প্রয়োজন, ততটুকু লেখা তার হাতে যেত। তবে লেখক সম্মানি ছিল অনিয়মিত। অনেকটা করুণার মতো মাঝেমধ্যে কিছু দু-চার শ টাকা হাতে ধরিয়ে দেওয়া হতো।

সংবাদে আমার পরে অর্থনীতির পাতার হাল ধরেন শওকত হোসেন মাসুম। সেসময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগ থেকে পাশ করে বের হয়েছেন। পরে দৈনিক জনকণ্ঠ ও দৈনিক

ইত্তেফাক হয়ে প্রথম আলোয় থিতু হয়েছেন। আমার আগে কামরুল ইসলাম চৌধুরী এবং বিশিষ্ট ব্যাংকার মামুন রশিদ সংবাদে দায়িত্ব পালন করেন। আমি যোগ দিই 'মুক্তকণ্ঠ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে। বেক্সিমকো গ্রুপের এ পত্রিকায় শিল্প-বাণিজ্যের খবর প্রাধান্য পেতে থাকে। ক্রমে অন্য দৈনিকগুলোও নিয়মিত অর্থনীতির খবরকে গুরুত্ব দিতে থাকে। মুক্তকণ্ঠ সপ্তাহে দুইদিন বিশেষ অর্থনীতির পাতা বের করত। কিন্তু অর্থনীতি বিষয়ে লেখার জন্য কর্মী নিয়োগে ছিল অনীহা। আমার সঙ্গে কাজ করার জন্য চারজন কর্মী দেওয়া হয়, যারা সদ্য পাশ করেছেন; কিন্তু অর্থনীতি কিংবা বাণিজ্য নিয়ে আনুষ্ঠানিক পড়াশোনা ছিল না। আগে কোনো দৈনিক পত্রিকায় কাজ করেননি। তবে দ্রুতই তারা কাজ শিখে ফেলেন। ১৯৯৮ সালের বন্যার সময় তারা শিল্প-বাণিজ্যের খবর সংগ্রহের জন্য ঝুঁকি নিয়ে ঘুরেছেন নানা স্থানে। বন্যার কারণে অর্থনীতিতে কী কী সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং উত্তরণের পথ কী, সেটা আমরা পাঠককে জানাতে চেষ্টা করি।

তবে পত্রিকার মালিকপক্ষের কারণে নীতিগত কিছু সমস্যা দেখা দেয়। গ্রুপটির প্রচুর ব্যাংক ঋণ ছিল এবং এর একটি অংশ খেলাপি। এ কারণে খেলাপি ঋণ নিয়ে কিছু লেখা যেত না। একবার বাজেট-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, বেক্সিমকো গ্রুপের অনেক ব্যাংক ঋণ। সময়মতো তারা ঋণ পরিশোধ করে না। তবে ঋণ পুনঃতপশিল করে নিয়েছে। মালিকপক্ষ এ মন্তব্য ব্যবহার করে চমৎকারভাবে। পরদিন প্রথম পাতায় বক্স করে ছাপা হয়, শিরোনাম: 'বেক্সিমকো গ্রুপ ঋণখেলাপি নয়–অর্থমন্ত্রী'।

২২ বছর আগের কথা এটা। এখন এ ধরনের সমস্যা আরও বেড়েছে। বিভিন্ন বড়ো ব্যবসায়ী গ্রুপের দৈনিক পত্রিকা আছে, টেলিভিশন আছে। গ্রুপগুলোর স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়, এমন কিছু প্রকাশ বা প্রচার করা কার্যত অসম্ভব। চট্টগ্রাম বন্দরের একজন বড়ো কর্মকর্তা আমাকে একবার বলেন, ঢাকার একটি প্রভাবশালী পত্রিকার সাংবাদিককে বন্দরে তৎপর দেখলে তারা বোঝে ওইদিন ওই পত্রিকা মালিকের কোনো না কোনো কোম্পানির ব্যাবসায়িক স্বার্থসংক্রান্ত কাজ আছে। আমরাও কাস্টমস বা শুল্ক বিভাগের কর্মীদের বলে দিই তাদের সঙ্গে কোনো ঝামেলায় না যেতে। তাদের জন্য বন্দরে যদি কোনো ঝামেলা হয়, তার শোধ নেওয়া হবে বন্দরের কোনো গলদ বের করে। বলতে পারেন ব্যাবসায়িক অন্যায়-অসাধুতা আমরা হজম করি।

একটি পত্রিকায় আমি অন্য ধরনের সমস্যার কথা শুনি। তখন আদমজী জুটমিল চালু ছিল। পত্রিকার মালিকপক্ষ আদমজীতে কিছু ব্যাবসা চাইছিল। কিন্তু বনিবনা হচ্ছিল না। সম্পাদক একদিন এক তরুণ সংবাদকর্মীকে আদমজীর দুর্নীতি-অনিয়ম বিষয়ে রিপোর্ট করতে বলেন। ওই সাংবাদিক কয়েকদিন পরিশ্রম করে আদমজী জুটমিলের নানা সমস্যা তুলে ধরে কয়েকটি রিপোর্ট জমা দেন। কিন্তু কোনোটিই প্রকাশ পায় না। পরে জেনেছি আদমজী কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সাংবাদিকের তৎপরতা জানতে পেরে মালিকের সঙ্গে আপসের পথে গেছেন। ওই মালিক ব্যাবসাটি পেয়ে যান। আদমজী মিলের দুর্নীতির খবর চাপা পড়ে থাকে।

আরেকটি পত্রিকায় একবার প্রতিবেদন ছাপা হলো একটি বিদেশি ব্যাংককে অভিযুক্ত করে। ব্যাংক থেকে একজন গ্রাহক ৮ লাখ টাকা নিয়ে বের হওয়ার পরপরই ছিনতাইকারীর পাল্লায় পড়েন। ওই গ্রাহকের ধারণা হয়েছিল যে, ব্যাংকটির কর্মীদের কেউ না কেউ ছিনতাইকারী চক্রকে তার অর্থ তোলার খবর দিয়েছে। এ নিয়ে তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। বিপুল প্রচারসংখ্যার ওই দৈনিকটিতে এ নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশিত হলে সম্পাদক রুষ্ট হন। তিনি সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক ও বার্তা সম্পাদককে তিরস্কার করে বলেন, ব্যাংকটি নিয়মিত বিজ্ঞাপন দেয়। এ কারণে তাদের বিরুদ্ধে যায়, এমন কিছু প্রকাশ করা যাবে না।

> বিভিন্ন বড়ো ব্যবসায়ী গ্রুপের দৈনিক পত্রিকা আছে, টেলিভিশন আছে। গ্রুপগুলোর স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়, এমন কিছু প্রকাশ বা প্রচার করা কার্যত অসম্ভব

এ ধরনের অনেক নজির দেওয়া যায়, যা ব্যবসায় সাংবাদিকতার সমস্যা তুলে ধরে। তবে এ থেকে এমন ধারণা করা ঠিক হবে না যে অর্থনীতির জন্য এ ধরনের সাংবাদিকতা কল্যাণ বয়ে আনছে না। পত্রিকা-টিভি-বেতারে নানা ধরনের বিট রয়েছে। রাজনীতি, খেলাধুলা, সংস্কৃতি, শিক্ষা–সব বিষয়ে পাঠক-দর্শক-শ্রোতাদের আগ্রহ। অর্থনীতি নিয়েও আগ্রহ। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে অর্থনীতি বিষয়ে পৃথক ডেস্ক রয়েছে। এ ডেস্কে যুক্তরা বিশেষ সম্মান পেয়ে থাকেন। অর্থনীতির সংবাদ এখন আর এক কোনায় পড়ে থাকে না। বরং গুরুত্ব অনুযায়ী উপযুক্ত স্থান করে নেয়। প্রথম পাতায় তো বটেই, লিড নিউজ হয় অর্থনীতিবিষয়ক

সংবাদ। গ্রাম থেকে পাওয়া অর্থনীতির সংবাদও গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ ও প্রচার হয়। কেবল খেলাপি ঋণ বা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের খবর নয়–ধান, পাট বা মাছ কিংবা ফল উৎপাদনের জন্য কৃষকের কী ধরনের সহায়তা প্রয়োজন, উৎপাদিত ফসলের বাজারজাত করায় কী সমস্যা, রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যে নতুন কী সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন–কত ধরনের খবর আমরা দেখি। অর্থনীতি ও নারী উদ্যোক্তা নিয়ে খবর ও বিশ্লেষণ থাকে। নারী উদ্যোক্তারা এখন আগ্রহের কেন্দ্রে। বাজেট পর্যালোচনা তো আছেই।

তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতির যুগে সংবাদকর্মীদের কাজের সুবিধা হয়েছে। যে কোনো বিষয়ে তারা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে দেশের নানা প্রান্তে এমনকি দেশের বাইরে থাকা বিশেষজ্ঞদের মতামত তুলে ধরতে পারেন। মাঠের কৃষক বা কারখানার শ্রমিকের মতামত তুলে ধরতেও বাধা নেই। ফোন করলেই পাওয়া যাবে পরামর্শ, বিশ্লেষণ বা মূল্যায়ন। ধানে চিটা ধরতে থাকলে কিংবা পোকার আক্রমণ হলে বিশেষজ্ঞরা পত্রিকা-টেলিভিশনে পরামর্শ দেন। এর দ্বারা অর্থনীতির উদ্যোক্তারা লাভবান হচ্ছেন, ভোক্তাদেরও সুবিধা। শ্রমজীবীরাও উপকৃত হচ্ছেন। পোশাকশিল্পের কর্মীরা সহজেই জানতে পারেন যে তাদের শ্রমে-ঘামে যে পণ্য উৎপাদন হচ্ছে তা থেকে কারখানার মালিক এবং রপ্তানিকারকরা কী সুবিধা পাচ্ছেন এবং তা থেকে তাদের কী দেওয়া হচ্ছে। বিশ্ববাজারে পণ্যমূল্যের ওঠানামার হালনাগাদ তথ্যও তাদের হাতের নাগালে।

অর্থনীতিবিষয়ক খবর যেন নির্ভুল ও বস্তুনিষ্ঠ হয়, সে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক খবর যেমন অর্থনীতির বড়ো উপকার করতে পারে, তেমনই ভুল খবর ডেকে আনতে পারে সর্বনাশ। দুই দশক আগে একটি প্রভাবশালী পত্রিকা খবর ছেপেছিল–'মুরগির খাবারে ক্যানসারের বিষয় রয়েছে, এমন উপাদান ব্যবহার করা হয়।' একটি গবেষণা প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল; কিন্তু সেই সূত্রকেই সঠিক ধরে নিয়ে খবরটি প্রকাশিত হলে মুরগির মাংস ও ডিমের বাজারে ধস নামে। পত্রিকাটির কৃতিত্ব ছিল যে, খবরটি অনেকে বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু খবরটি ছিল বিভ্রান্তিকর। এতে পোলট্রি শিল্পের অনেক ক্ষতি হয়েছিল। ভুল খবর দিয়ে তারা ক্ষমা চেয়েছিল; কিন্তু তাতে এ শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকের ক্ষতির উপশম হয়নি।

অর্থনীতির সার্বিক চিত্র সম্পর্কে ধারণা না থাকাও ক্ষতির কারণ হয়। ২০১৭ সালের এপ্রিলে আকস্মিক পাহাড়ি ঢলের কারণে হাওড় এলাকায় বোরো ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়। তখন একাধিক প্রভাবশালী দৈনিক পত্রিকা এবং টেলিভিশনে এমনভাবে এ খবর প্রকাশিত হতে থাকে, যেন হাওড় এলাকা থেকেই বাংলাদেশের খাদ্য চাহিদার বড়ো অংশের জোগান আসে। অনেকে এটাও জানেন না যে, হাওড় এলাকায় কেবল বেরো ধান উৎপাদন হয়। আমন বা আউশ মৌসুমে হাওড় থাকে পানির নিচে, যেখানে ধানচাষ সম্ভব হয় না। এক টেলিভিশন আলোচনায় এক 'বিশেষজ্ঞ' বলতে শুরু করেন, বাংলাদেশের সিংহভাগ চালের জোগান আসে হাওড় এলাকা থেকে। কিন্তু সরকার হাওড়ের মানুষকে উপেক্ষা করছে। ওই আলোচককে তথ্য দিয়ে বলি–বাংলাদেশে রবি, আউশ ও আমন মৌসুমে সাড়ে তিন কোটি টনের বেশি চাল উৎপাদন হয়। এর মধ্যে হাওড় এলাকা থেকে আসে মাত্র ১৫-২০ লাখ টন। তিনি উলটো আমাকেই 'অজ্ঞ' বলে উপহাস করেন।

অনেকে গুজবে কান দিতে পছন্দ করে। গালগল্পও ভালো লাগে কারও কারও। অর্থনীতির খবর হিসাবে এসব কাম্য নয়। আমাদের অর্থনীতি বড়ো হচ্ছে। অনেকেই এখন এ সংক্রান্ত খবর-বিশ্লেষণ-মূল্যায়ন জানতে আগ্রহী। তাদের বিভ্রান্ত করা যাবে না। এতে বড়ো ধরনের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

আবার ভালো খবর দিয়ে, সঠিক তথ্য ও পরিসংখ্যান উপস্থাপন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং সার্বিকভাবে দেশের উপকারও করা যায়। এ পথেই আমাদের চলতে হবে।

শুভ লক্ষণ অবশ্যই রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চতর শিক্ষার আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে ব্যবসায় সাংবাদিকতা গুরুত্ব দিয়ে পড়ানো হয়। বেসরকারি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়েও বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে। এ কারণে দক্ষ জনবলের সমস্যায় কোনো প্রতিষ্ঠান পড়বে না।

বিশ্বও এখন শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। বিশ্বায়নের সুফল ভোগ করছি আমরাও। বহুবছর আমাদের মেধাবী মুখগুলো নানা দেশে চলে গেছে। তাদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা ছিল; কিন্তু তেমন কাজ দেয়নি। এখন তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতির কারণে তাদের সেবাও পাচ্ছে আমাদের অর্থনীতি। গণমাধ্যম উপকৃত হচ্ছে। এ ধারা দিনদিন জোরালো হবে, সন্দেহ নেই।

লেখক: বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিকতায় একুশে পদকপ্রাপ্ত

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

প্রবন্ধ

অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার ৫০ বছর

ড. আর এম দেবনাথ

অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা তো দূরের কথা, সাংবাদিকতা সম্পর্কেও আমার উৎসাহ ছিল খুবই কম। স্বাধীনতার পূর্বে আমি ছিলাম সরকারি জগন্নাথ কলেজের (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়) একজন শিক্ষক। বিষয় ব্যবস্থাপনা। তখন লিখতাম গল্প। তা ছাত্রজীবন থেকেই। ছাপা হতো 'দৈনিক সংবাদ'-এ। তৎকালীন প্রভাবশালী উদারপন্থি কাগজ। লেখা দিতাম রণেশদার (রণেশ দাশগুপ্ত) কাছে। অধীর আগ্রহে থাকতাম গল্পটি ছাপা হলো কি না! তা ভাগ্যক্রমে ছাপাই হতো। মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি ঢাকায় আসি। শুনি দৈনিক সংবাদ অফিসটি পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পুড়িয়ে দিয়েছে। আরও কত কত দুঃসংবাদ। খুঁজি আমার পুরোনো আশ্রয়ের জায়গা। কে কোথায় আছে? যাই জগন্নাথ হলে। এই হলের নর্থ হাউসের ১০নং রুমে আমি থাকতাম 'ডাবলিং' করে আরেক জনের সঙ্গে। সেখানে ছিল আমার অনেক বইপুস্তক, সার্টিফিকেট, পারিবারিক অনেক দলিলদস্তাবেজ। এসে দেখি কিছুই নেই। চারদিকে রক্তের দাগ। হাহাকার। শুধু মৃত্যুসংবাদ। ধ্বংসের ছাপ, অত্যাচারের ছাপ। যাই তাঁতীবাজারে–পুরান ঢাকায়। একই চিত্র সেখানে। যাই আমার পুরোনো আবাসস্থল নর্থব্রুক হল রোডে, বিউটি বোর্ডিংয়ে। পুরোনোদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের আনন্দ একদিকে, অন্যদিকে দুঃসংবাদ। মৃত্যুর সংবাদ, নিখোঁজের সংবাদ। নির্মম অত্যাচারের সংবাদ। দখলদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অত্যাচারের কাহিনি। ঘুরতে ঘুরতে যাই বংশাল রোডে, যেখানে দৈনিক সংবাদের অফিস। সবাইকে তো চিনি না। চিনতাম রণেশদাকে, শহিদুল ইসলাম নামে একজন সাংবাদিককে। সংবাদের বিল্ডিংয়ের চিত্র থেকে বুঝতে পারি পাকিস্তানিদের কত আক্রোশ ছিল এই বামপন্থি কাগজের প্রতি। এখানে যাই, সেখানে যাই। খুঁজি বন্ধুদের, আত্মীয়দের, স্বজনদের, পরিচিতিদের এবং 'দেশের' (গ্রামের) প্রতিবেশীদের। এই করতে করতে একদিন সংবাদ অফিসে দেখা প্রয়াত আহমদুল কবিরের সঙ্গে। তিনি পত্রিকাটির সম্পাদক-মালিক। তিনিই বলে উঠলেন, এই ছেলে তোমাকে কোথায় দেখেছি? আমি বললাম, ১৯৬৪-৬৫ সালের 'প্রাদেশিক পরিষদ'-এর (প্রোভেন্সিয়াল অ্যাসেম্বলি) নির্বাচনে আপনার জন্য ঘোড়াশালে কাজ করেছি। আমি নরসিংদী কলেজের ছাত্র। ছাত্র ইউনিয়নের একজন কর্মী। আমরা তখন প্রগতিবাদী প্রার্থী আহমদুল কবিরের কর্মী। তিনি বুঝলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কী করো? বললাম, আমি জগন্নাথ কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক। ভালোই হলো। তিনি কাজ

দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ অধ্যাপকদের ওপর ধারাবাহিক ফিচার লিখতে। তা শুরু করলাম। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। যে নামে লিখছি তা হলো 'পাভেল দেবনাথ'। কিছুদিন পর তিনি বললেন অর্থনীতির ওপর রিপোর্ট লিখতে। তার যুক্তি, আমি বাণিজ্যের ছাত্র। কাজেই এদিকেই আমার কাজ করা উচিত। প্রথম 'অ্যাসাইনমেন্ট' ছিল আদমজী জুট মিলের ওপর। যতদূর মনে পড়ে, জনৈক আওয়াল সাহেব তখন আদমজী জুট মিলের 'প্রশাসক' (অ্যাডমিনিস্ট্রেটর)। বলা দরকার, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর পাকিস্তানিদের কর্তৃক পরিত্যক্ত সব মিলকারখানা, ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার দায়িত্ব দেন প্রশাসকদের ওপর।

আজকের বাংলাদেশ ব্যাংকেরও প্রথম প্রধান অর্থাৎ প্রশাসক মুশফেক-উস-সালেহীন। প্রথম গভর্নর এএন হামিদুল্লাহ। আদমজী জুট মিল বিশ্বের মধ্যে বৃহত্তম জুট মিল। স্বাধীনতা-উত্তরকালের অব্যবস্থাপনা, অনিয়ম প্রভৃতির ওপর রিপোর্ট জমা দেওয়ার পর দেখি সেটি ছাপা হয়েছে সম্পাদকীয় হিসাবে। অনেক কাটছাঁটের পর। ব্যাবসাবাণিজ্য আমার কাছে অপরিচিত একটি জগৎ। ব্যবসায়ীদের কাউকে চিনি না। বড়ো বড়ো কর্মকর্তা কাউকে চিনি না। কী করে সম্ভব ব্যাবসার ওপর, অর্থনীতির ওপর রিপোর্ট করা। তাছাড়া রয়েছে শিক্ষকতার কাজ। শত হোক আমি তো সরকারি চাকরি ছেড়ে সংবাদের কর্মী হচ্ছি না। এমতাবস্থায় সহায় হলেন কবির ভাই (মনুভাই) নিজেই। একেকটি দায়িত্ব দেন, ব্রিফিং করেন, আর বলে দেন কোথায় যেতে হবে, কার সঙ্গে দেখা করতে হবে। তখন সুবিধা ছিল। অর্থনীতির আকার ছিল খুবই ছোটো, ব্যাবসাবাণিজ্যের পরিমাণ কম। মতিঝিলপাড়াতেই সব। কারওয়ান বাজার, গুলশান, বনানী, উত্তরা ইত্যাদি দূরান্ত। রিপোর্ট করার জন্য যাওয়ার জায়গা প্রায় সব মতিঝিলেই। স্বাধীনতার পর পাকিস্তানি মালিকের ব্যাংক এবং বাংলাদেশি মালিকানার ব্যাংক এক করে ছয়টি বাণিজ্যিক ব্যাংক হয় রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে। দুটো শিল্পব্যাংক, একটি বিনিয়োগ কোম্পানি, একটি কৃষির জন্য ব্যাংক। সবকটির প্রধান কার্যালয়ই মতিঝিলে। ঢাকাস্থ 'স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান'-এর শাখাকে করা হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক–বাংলাদেশ ব্যাংক। পুরো শিল্পকে যতদূর মনে পড়ে, ১০টি সেক্টর করপোরেশনে বিভক্ত করা হয়। তৈরি করা হয় ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি), আমদানি ব্যাবসার জন্য। তৈরি হয় কনজিউমার সাপ্লাই করপোরেশন (কসকর), অভ্যন্তরীণ বিপণনের জন্য। পাটের ওপর হয় তিনটি করপোরেশন। বস্ত্র, ইস্পাত, রসায়ন, চিনি ইত্যাদির জন্য একেকটি করপোরেশন–সবই সরকারি। বিমা কোম্পানি করা হয় সাধারণ বিমা ও জীবন বিমা আলাদাভাবে। বলা যায়, বড়ো ব্যাবসার প্রায় সবই সরকারি খাতের ব্যাবসা, সবই জাতীয়করণকৃত। প্রধান ব্যাবসা-বাণিজ্যস্থল মতিঝিল। এসবের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ব্যাংক ও পাট। রয়েছে চা ও চামড়াশিল্প, যা তখনকার দিনে ছিল গুরুত্বপূর্ণ খাত–রপ্তানির ক্ষেত্র। এসব ক্ষেত্রে রিপোর্ট যখন শুরু করি, তখন হঠাৎ আদেশ–অর্থনীতির পাতা বের করতে হবে। সেটা ১৯৭২ সালের শুরুর দিকেই। নাম দিলাম 'ব্যবসা-বাণিজ্য-অর্থনীতি'। সপ্তাহে একদিন সোমবার তা ছাপা হবে। রোববার হচ্ছে সাহিত্যের পাতা। এ এক নতুন উত্তেজনা, নতুন অভিজ্ঞতা। এতদিনে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক। দেশে তখন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ সর্বত্র। নতুন সংবিধানে সমাজতন্ত্র অন্যতম স্তম্ভ। তখন দেশে কাগজ খুবই কম। দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলা আর দৈনিক সংবাদ বাদে কাগজ কোথায়! 'সংবাদ' সমাজতন্ত্রের সমর্থক। দৈনিক বাংলা সরকারি কাগজ। দৈনিক ইত্তেফাক সমাজতন্ত্রের সমর্থক সেভাবে নয়। আমার তখন নতুন উত্তেজনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা একদিকে, অন্যদিকে বিনা বেতনে সংবাদের অর্থনীতির পাতা সম্পাদনা করা। বলা বাহুল্য, দেশে দৈনিক সংবাদই প্রথম অর্থনীতির পাতা বের করে। আর কোনো কাগজ অর্থনীতির পাতা করত না। অর্থনীতির ওপর রিপোর্টে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে দুজনকে পাওয়া যায়। এক. প্রয়াত জাহিদুজ্জামান ফারুক, দুই. প্রয়াত মোয়াজ্জেম হোসেন। আমি আমার পাতায় সমাজতন্ত্রের পক্ষে জোরালো অবস্থান নিই। দৈনিক সংবাদের নীতিও ছিল তাই। আজ ভালো লাগে দেখে যে, অর্থনীতির ওপর দৈনিক কাগজ হয়েছে ইংরেজি ও বাংলায়। আবার রোজই দৈনিকগুলোয় দুই-তিন পৃষ্ঠা নিবেদিত হয় অর্থনীতির ওপর। ১৯৭২ সালে যখন 'ব্যবসা-বাণিজ্য-অর্থনীতি' নামীয় সাপ্তাহিক পাতা বের করি, তখন অনেকেই বলত, কী অর্থনীতি, তার আবার অর্থনীতির পাতা। তখন অর্থনীতি ও বাণিজ্যের ওপর রিপোর্টিং এবং পাতা করা ছিল দুঃস্বপ্ন। কারণ, অর্থনীতি ও বাণিজ্যের অনেক টার্ম বাংলায় আমাদের অনেকের জানা ছিল না। অথচ বাংলা আমাদের রাষ্ট্রভাষা। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও একই অবস্থা। ১৯৭২-৭৩ সালের দিকে আমি ছাত্রদের জন্য 'বিপণন নীতিমালা ও বাংলাদেশে বিপণন' নামীয় একটা বই প্রকাশ করি। 'বাজারজাতকরণ'-এর বিপরীতে 'বিপণন' লেখা ছিল একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। ব্যাংক ও ব্যাংকব্যবস্থার ওপর রিপোর্ট লেখা এবং নিবন্ধ লেখার সময় বিপদ ঘটত। কারণ অনেক 'টার্ম'-এর বাংলা কী হবে, তা অনেকের জানা ছিল না। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর প্রতিবেদন ও মন্তব্য করতে গিয়ে সমস্যা হতো। 'ন্যারো মানি', 'ব্রড মানি'র বাংলা কী হবে? আমাদের কারও জানা ছিল না। 'মানি অ্যাট কল', 'ক্রেডিট', 'অ্যাডভান্সের' বাংলা কী, একের সঙ্গে অন্যের তফাত কী, তা বোঝার উপায় কী? 'নোটস ইন সার্কুলেশন'-এর বাংলা কী হবে, 'মানি' কি টাকা না মুদ্রা? ডিমান্ড ডিপোজিট, টাইম ডিপোজিটের বাংলা কী হবে? তখন বাংলা একাডেমিরও কোনো বই ছিল না, যেখান থেকে সাহায্য নেওয়া যেত। দু-একজন ছিলেন যারা বাংলায় অনুবাদ করতে উৎসাহী ছিলেন। তেমন লুৎফর রহমান সরকার (এলআর সরকার), যিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হয়েছিলেন। ছিলেন খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ (কেআই খালেদ), যিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সাহায্য করতেন আরও দুজন–সৈয়দ আলী কবীর এবং এ কে গঙ্গোপাধ্যায়। দুজনই ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এএন হাবিবুল্লাহ। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন বাংলায় অনুবাদ করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমাকে। আমি এই কাজটি পরপর ৫-৬ বছর করেছি। বার্ষিক প্রতিবেদন বাংলা করার কাজ করেছি সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক ও শিল্প ব্যাংকের। এসব ক্ষেত্রেও ৫-৬ বছর একনাগাড়ে কাজ করেছি। জনতা ব্যাংকের ডিজিএম, পরে জিএম সৈয়দ আতিকুল্লাহ, শিল্পব্যাংকের আহমেদ জামাল বাংলায় অনুবাদে যথেষ্ট সাহায্য করতেন। তখন ছিল ভীষণ সমস্যা। 'অথরাইজড ক্যাপিটাল', 'সাবস্ক্রাইব ক্যাপিটাল', পেইড আপ ক্যাপিটালের বাংলা কী? অনেকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে এসবের অনুবাদ করতে হয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন, 'ব্যালেন্স শিট', প্রফিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টের ওপর রিপোর্ট লেখা বা মন্তব্য করা ছিল যথেষ্ট ঝুঁকির কাজ। সঠিক বাংলা অনুবাদ হলো কি না, তা ভেবেচিন্তে তারপর লিখতে হতো। অনেক সময় অভিধানের সাহায্য নিতাম। কিন্তু অভিধানের শব্দটি পাঠকরা বুঝতে পারছেন কি না, তা লক্ষ করতে হতো। এসব বিষয়ে সংবাদ সম্পাদক প্রয়াত আহমদুল কবির, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক প্রয়াত বজলুর রহমান যথেষ্ট সহায়তা করতেন। রিপোর্টিংয়ে একবার এলো কাঁচা মরিচের দাম। তখনকার সময়ে কাঁচা মরিচের দাম

ওঠে ১৬ টাকা সেরে (তখনও কেজি হিসাব হয়নি)। আমি আমার পাতায় শিরোনাম করি 'কাঁচা মরিচের বাজারে আগুন'। বিখ্যাত সাংবাদিক প্রয়াত জহুর হোসেন চৌধুরী সংবাদে ফোন করে আমাকে ধরলেন। বললেন, 'ও মিঞা ১৬ টাকা সেরেই বাজারে আগুন লাগালেন, যখন আরও বাড়বে তখন কী শিরোনাম করবেন?' বুঝলাম খবরের শিরোনাম করতে সাবধান হতে হবে।

১৯৭২-৭৫ সালে যতদিন বঙ্গবন্ধু ছিলেন, ততদিন অর্থনৈতিক খবরের মধ্যে খবর ছিল ১০টি সেক্টর করপোরেশনের খবর, বাণিজ্যিক ব্যাংকের খবর, রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অনিয়মের ওপর খবর। কিছু কিছু কাগজ ছিল অনিয়মকেই প্রধান খবর করত। আমরা সংবাদে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতকে যেহেতু সমর্থন করি, তাই রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের শিল্প এবং রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের ব্যাংকের ওপর রিপোর্ট করতাম রয়ে-সয়ে। ইতিবাচক দিকগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরাকেই আমার পাতার অন্যতম উদ্দেশ্য বলে ঠিক করেছিলাম। অবশ্যই এটা সংবাদের সম্পাদনা নীতি ছিল।

আজকের দিনে বড়ো বড়ো খবরের বিষয়বস্তু কী? 'জিডিপি' (জাতীয় উৎপাদন, মাথাপিছু আয়, নিম্নমধ্য আয়ের দেশ-চ্যালেঞ্জ, তৈরি পোশাক রপ্তানি, আমদানি, প্রবাস আয় বা রেমিট্যান্স। রয়েছে বড়ো বড়ো সরকারি প্রকল্প। বিষয়বস্তু হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি), রপ্তানি বৃদ্ধি প্রভৃতি। শেয়ারবাজার হচ্ছে আরেকটি বড়ো বিষয়। রয়েছে বড়ো বড়ো করপোরেট হাউস, বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী শিল্পপতি। স্বাধীনতার পরপর সময়ে আট-দশ বছর এসব অর্থনৈতিক রিপোর্টের বিষয় ছিল না, মন্তব্যেরও না। নিবন্ধ রচনার তো নয়ই। পোশাক খাত বলতে একটা খাত হতে পারে, সেই সম্পর্কে কারও স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। রেমিট্যান্স আয়ের একটা উৎস হতে পারে, তা জানা ছিল না। জিডিপি, মাথাপিছু আয় প্রভৃতি কোনো বড়ো বিষয় ছিল না। একমাত্র জহুরুল ইসলামই (ইস্টার্ন হাউজিং, নাভানা ইত্যাদি) হচ্ছেন দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তি। মতিঝিলে ইস্টার্ন হাউজিংয়ের বিল্ডিং এবং পরে শিল্পব্যাংকের বিল্ডিং ছাড়া উঁচু বিল্ডিংই ছিল না। 'বেক্সিমকো'র নাম কিছু কিছু শোনা যাচ্ছে। আর শেয়ারবাজার? শেয়ারবাজারের প্রশ্নই ওঠে না। সবকিছুই সরকারি খাতে। তাহলে আমরা কীসের ওপর রিপোর্ট লিখতাম, নিবন্ধ লিখতাম। বঙ্গবন্ধুর আমলের একটা বড়ো ঘটনা গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকের বিস্তৃতি। কৃষিঋণ, গ্রামীণ ঋণ ছিল একটা বড়ো কার্যক্রম। 'রুরাল ডেভেলপমেন্ট'। দুই-তিন বছর গেছে অর্থনীতির পুনর্গঠনে, পুনর্বাসনে। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস দেশে মিল-কারখানা ছিল বন্ধ। কৃষিকাজে স্থবিরতা। মানুষ ছিল দৌড়ের মধ্যে। ব্যাংক কিছু কিছু ক্ষেত্রে খোলা ছিল। পুনর্গঠন, পুনর্বাসনের খবর ছিল। ভারত ও বসনিয়ার খবর ছিল। তাদের সঙ্গে বাণিজ্য ছিল। চীনের আগমন বহু পরে। ভাঙা রাস্তাঘাট, রেললাইন, বিমানবন্দর প্রভৃতি মেরামত কাজের ওপর রিপোর্ট করতাম। রিপোর্ট হতো কৃষিঋণ, গ্রামীণ ঋণের ওপর–এর সমস্যার ওপর। রিপোর্ট হতো পাট, পাটজাত দ্রব্য, চা ও চামড়ার ওপর। এই তিনটিই ছিল আমাদের রপ্তানি পণ্য। এখনকার মতো রপ্তানি ক্ষেত্রে এত বৈচিত্র্য আসেনি। আর শিল্প কোথায়? সীমিতসংখ্যক এসব কোম্পানি আর ৭৫-৭৬টি পাটকল ও বস্ত্রকল ছিল। আমরা ছিলাম বিশ্বে এক নম্বর কাঁচা পাট উৎপাদক। রপ্তানিতেও তাই। প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে ভারত। ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক প্রতিযোগিতামূলক না সহযোগিতামূলক–এই বিষয় ছিল একটা গরম আলোচনার বিষয়। সংবাদ এসব ক্ষেত্রে সংযত, যুক্তিসংগত, উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করত। মূল্যবৃদ্ধি ছিল আরেকটা বড়ো বিষয়। ১৯৭২-৭৬ সালে তেলের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বাড়ার কারণে অভ্যন্তরীণভাবে সব জিনিসের দাম বেড়ে যায়। কুচক্রীরা তখন প্রচার চালায় স্বাধীনতার এই হচ্ছে ফল। কিসিঞ্জারের সেই বিখ্যাত বক্তব্য–'বাংলাদেশ একটা তলাবিহীন ঝুড়ি'। এর ওপর আমরা মন্তব্য, ইন্টারভিউ, খবর ছাপতাম। একটা কথা বলতেই হয়। তখন পরিসংখ্যানের বড়ো অভাব ছিল। বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকস ও এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো এবং ১০টি সেক্টর বায়োলেশন (শিল্প খাত) ছাড়া খবরের কোনো উৎস ছিল না। এগুলোও ছিল চরমভাবে অসংগঠিত। বস্তুত স্বাধীনতার পর বেশ কিছুদিন অর্থনীতি, প্রতিষ্ঠান, বিভাগ প্রভৃতি গঠন, পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার কাজ চলে। তখন অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, শিল্পমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পাটমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, তারা যথেষ্ট সহযোগিতা করতেন। অর্থনীতির ওপর যারা রিপোর্ট করেন, লেখালেখি করেন, তাদের সঙ্গে তারা মতবিনিময় করতেন। ছোটো অর্থনীতি, রপ্তানি, আমদানি, জাতীয়

> এখন অর্থনীতির ওপর বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক আছে। আবার দৈনিক কাগজগুলো অর্থনীতির ওপর প্রতিদিন খবর ছাপছে। বস্তুত অর্থনীতি, ব্যাবসাবাণিজ্যই এখন প্রধান খবর

বাজেট প্রভৃতির আকার ছোটো; কিন্তু সমস্যা বহু ছিল। স্বাধীনতার পর দেখা গেল পাটের গুদাম পুড়ানো হচ্ছে। অথচ পাট আমাদের প্রধান রপ্তানি পণ্য। দেশে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যক্রম ছিল। অর্থনীতিতে অনিয়ম-ঘুস-দুর্নীতি ছিল। এসবের ওপর রিপোর্ট হতো। রিপোর্টিংয়ে কোনো বাধা ছিল না। মতপ্রকাশেও কোনো বাধা ছিল না। ১৯৭৪-৭৫ সালের দিকের ঘটনা। বঙ্গবন্ধু সরকার ১০০ টাকার নোট বাতিল করলেন। এসব নোট ছাপা হতো ভারতে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিশাল আলোচনার বিষয় ছিল এই ১০০ টাকার নোট। অভিযোগ, ভারত ১০০ টাকার নোট বেশি ছাপিয়ে আমাদের অর্থনীতির ক্ষতি করছে। নোট বাতিলের পর দেখা গেল, যত নোট বাজারে চালু ছিল, সামান্য কিছু বাদে আর সবই ব্যাংকে জমা হয়েছে। এসব ব্যাপারে প্রচুর লেখালেখি হতো। আমার পাতায় আমরা অনেকবার বিশিষ্টজনের মতামতসহ এ বিষয়ে লিখেছি। বস্তুত, স্বাধীনতার পরপর সময়ে সরকারবিরোধী একটা শক্তি প্রচার-প্রচারণার দ্বারা সরকারি কাজে, অর্থনৈতিক কাজে বাধা সৃষ্টি করে। এসবও ছিল প্রতিবেদন লেখার বিষয়বস্তু।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতাবিরোধীদের হাতে শহিদ হওয়ার পর অর্থনীতির হাওয়া সম্পূর্ণ বদলে যায়। ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে শুরু করে। বেসরকারি খাতের পুনর্জন্ম হতে শুরু করে। ১৯৭৬ সালেই তৈরি হয় একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বেসরকারি খাতে। সরকারি শেয়ার ৪৯ শতাংশ, বেসরকারি শেয়ার ৫১ শতাংশ। এই ফিন্যান্স কোম্পানিটিই বর্তমানের 'আইএফআইসি' ব্যাংক। পুঁজির টাকা দেওয়ার মতো সক্ষমতা ছিল না বাঙালিদের। সরকার সরকারি ব্যাংক থেকে ঋণ দিয়ে পুঁজি সরবরাহ করে। এই নিয়ে কত লেখা কাগজে, বিশেষ করে 'দৈনিক সংবাদে' 'ব্যাংকের টাকায় ব্যাংক'। আজও এই ঘটনা ঘটে চলেছে। খেলাপি ঋণও তখন হচ্ছে। এটিও আলোচনার বিষয়বস্তু। বড়ো বিষয়বস্তু। সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তন শুরু হয় জেনারেল এরশাদ যখন দেশের রাষ্ট্রপতি ও সেনাপ্রধান। তিনি বেসরকারি খাতের দুয়ার খুলে দেন। বাঙালির মালিকানাধীন দুটো ব্যাংক তিনি বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেন। এ দুটো ব্যাংক হচ্ছে উত্তরা ব্যাংক ও পূবালী ব্যাংক। তিনি বেসরকারি খাতে ব্যাংক, বিমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান অনুমতি দেন। শিল্প ও ব্যবসায় ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করেন। শেয়ারবাজার বহুদিন বন্ধ থাকার পর আবার চালু হয়। এই প্রক্রিয়ার সাক্ষী হিসাবে আমিও যথেষ্ট লিখেছি। নামে-বেনামে, স্বনামে, ছদ্মনামে। তখন চাকরিরত। অতএব স্বনামে লেখা বড়ো সমস্যা। এখন লিখছি স্বনামে, অবসরপ্রাপ্ত নাগরিক হিসাবে। স্বাধীনতার পরপরের লেখা আর এখনকার লেখার মধ্যে অনেক তফাত। বিষয়বস্তু, সংখ্যা বেড়েছে। জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থনীতির আকার বিশাল হয়েছে। মাথাপিছু আয় যথেষ্ট বেড়েছে। আমরা এখন নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ। এসবের মধ্যেও বলা যায়, এখনো অর্থনীতি, ব্যাবসাবাণিজ্যের ওপর লেখক, কলাম লেখক কম। রিপোর্টিংয়ে অনেক তরুণ ভালো করছে। প্রায়ই ভালো ভালো রিপোর্ট দৈনিক কাগজগুলোয় ছাপা হয়। এখন অর্থনীতির ওপর বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক আছে। আবার দৈনিক কাগজগুলো অর্থনীতির ওপর প্রতিদিন খবর ছাপছে। বস্তুত অর্থনীতি, ব্যাবসাবাণিজ্যই এখন প্রধান খবর। বড়ো বড়ো হাউসের খবর আছে। উদ্যোক্তার সফলতা-ব্যর্থতার ওপর আলোচনা আছে। খেলাপি ঋণের ওপর চর্চা আছে। বস্তুত ব্যাংক অনেক সময় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। এগিয়ে যাচ্ছে অর্থনীতি, এগিয়ে যাচ্ছে অর্থনৈতিক রিপোর্টিং, এগিয়ে যাচ্ছে অর্থনীতির ওপর লেখা কলাম। স্বাধীনতার পর লেখালেখির প্রধান বিষয়বস্তু ছিল সংস্কার, পুনঃসংস্কার, পুনর্গঠন, কাঠামোগত পরিবর্তন। লক্ষ্য সমাজতন্ত্র নির্মাণ। আজকের লেখার বিষয়বস্তু হচ্ছে উন্নয়ন, বেসরকারি খাত, বড়ো বড়ো প্রকল্প, ঋণখেলাপি, বিনিয়োগ প্রভৃতি। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে/হচ্ছে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার বিষয়বস্তু। নতুন নতুন লেখকও আসছে, যাদের অনেকেই অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। তাদের অংশগ্রহণে অর্থনীতির ওপর লেখালেখি অনেক সমৃদ্ধ হচ্ছে।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও কলামিস্ট

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

বঙ্গবন্ধু অবাধ বাজার অর্থনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

জাতির পিতাকে ঘিরে রহস্য রোমাঞ্চ আছে। তিনি কি একজন সমাজতন্ত্রী ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আস্থাভাজন ও শ্রদ্ধার আসনে থাকা দুনিয়াখ্যাত অর্থনীতিবিদ প্রফেসর নুরুল ইসলাম (পরিকল্পনা কমিশনের সাবেক ডেপুটি চেয়ারম্যান, মন্ত্রী) বলেছেন, '১৯৭২ সালে জাতীয়করণ নীতি নিয়ে ক্যাবিনেটে আলোচনার সময় দুই শিবিরের মধ্যে বিভেদ স্পষ্ট ছিল। ক্যাবিনেটের বাইরে জাতীয়করণের পক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ছিল ছাত্র ও শ্রমিকরা, যারা সেসময় দারুণ প্রতিবাদী। বঙ্গবন্ধু অনেকটাই এদের পক্ষে ছিলেন। কারণ তিনি তার নির্বাচনি প্রতিশ্রুতির প্রতি সৎ থাকা কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। সমাজতন্ত্রের প্রতি নিজের অঙ্গীকারের কথা বারবার তিনি জনসমক্ষে প্রচার করেছিলেন। জাতীয়করণ নীতিতে আপস করা তার জন্য কঠিন ছিল।' (বণিক বার্তা, ২৯ জুলাই ২০১৮)

বঙ্গবন্ধুর আরেকজন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহচর ও সহযোদ্ধা প্রফেসর রেহমান সোবহান (সদস্য, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন), রেদোয়ান মুজিব সিদ্দিক কর্তৃক সম্পাদিত অতিশয় বিশ্বমানের সাময়িকী হোয়াইটবোর্ডে (স্বাধীনতার তীর্থস্থান বাড়ি ৬৭৭, সড়ক ৩২, ধানমন্ডি থেকে প্রকাশিত) ড. রওনক জাহানের সঙ্গে যৌথভাবে লিখেছেন, '...nationalization and the extension of the public sector by the development of the corporate enterprises and by the evolution of new institutional arrangements such as worker participation in the equity and management of industrial enterprises.' (Mujib's economic policies and their relevance today: by Rounaq Jahan and Rehman Sobhan–Cover Story White Board March ২০)

আমার এ দুজন শিক্ষক এবং আরও অনেকেই জাতির পিতাকে একজন সাচ্চা সমাজতন্ত্রী হিসাবে তুলে ধরেন বটে; কিন্তু আমি ভিন্নমত পোষণ করি। বঙ্গবন্ধু আসলে পোড় খাওয়া একজন জনদরদি রাজনীতিক, যিনি বাঙালির ধ্যানধারণা, চিন্তাচেতনার সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন। তাই সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা এই সোনার বাংলায় সমাজতন্ত্রী না হয়ে একজন প্রয়োগবাদী (প্র্যাগমেটিক) স্নেহশীল অভিভাবক হিসাবে আবির্ভূত হন। সংবিধানের চারটি স্তম্ভের অন্যতম ছিল সমাজতন্ত্র; সেই মহান দলিলের ১৩নং অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের সহায়-সম্পত্তির মালিকানা তিন ধরনের রাষ্ট্রীয়, ব্যক্তিগত ও সমবায়ী হবে বলে উল্লেখ করা আছে। সমাজতন্ত্রে কিন্তু অল মিনস

অব প্রডাকশন আর ওনড বাই দ্য স্টেট। তবে সমাজতন্ত্রের অন্যতম নির্যাস সমতাপ্রবণ বিতরণে টেকসই উন্নয়ন আর বৈষম্য নির্মূলে জাতির পিতার একটি কৃতসংকল্প সাধনা ছিল।

প্রয়োগবাদী হলেও মোটেও ধনতান্ত্রিক অবাধ বাজার অর্থনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না বঙ্গবন্ধু। বৈষম্য তাঁকে ভীষণ পীড়া দিত। ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ ভাষণে তিনি সমতাপ্রবণ বণ্টনব্যবস্থার প্রতি জোরদার বক্তব্য দেন। সংবিধানের অনেক অনুচ্ছেদে মানুষে মানুষে, নারী-পুরুষে, ধনী-নির্ধনে, গ্রামে-শহরে বৈষম্য পরিহার করে সমতা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) দলিলে বলা হয়েছে, দেশের বার্ষিক সামষ্টিক আয় বৃদ্ধির হারের তুলনায় কম বিত্তবানদের আয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি করাতে হবে। প্রয়োজনে বিত্তবানদের ওপর বেশি হারে কর ধার্য করে সেই অতিরিক্ত রাজস্ব দিয়ে কিষান-কিষানি ও শ্রমজীবী মানুষের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে কল্যাণকর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাতে হবে। সমবায়ব্যবস্থা ছিল জাতির পিতার হৃদয়ের গভীরে। তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি, 'ভাইয়েরা আমার, আসুন সমবায়ের জাদু স্পর্শে সুপ্ত গ্রামগুলোকে জাগিয়ে তুলি। নবসৃষ্টির উন্মাদনায় আর জীবনের জয়গানে তাকে মুখরিত করি।'

ক. স্থিতিপত্র বাংলাদেশ

১. বাংলাদেশ এখন সারা পৃথিবীতে সাড়া জাগানো অর্থনৈতিক উন্নয়নের মহাসড়কে দ্রুতগতিতে অগ্রসরমান। ১৯৭২ সালের ৮০০ কোটি ডলারের ক্ষুদ্র জিডিপি এখন ৩৪ হাজার ৫০০ কোটি মার্কিন ডলারের একটি বেশ বড়ো অর্থনীতি। ১৯৭০-৭১ অর্থবছরে সামষ্টিক আয়ে ছিল নেতিবাচক ১২ শতাংশ সংকোচন। আর করোনার ছোবলের আগ পর্যন্ত বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি শতকরা ৮ ভাগের ওপরে বিরাজমান ছিল। মাথাপিছু আয়ে ১৯৭২ সালে ৮৫ মার্কিন ডলার এখন ২ হাজার ২২৭ মার্কিন ডলারে। সামষ্টিক আয়ের অনুপাত হিসাবে বহির্বাণিজ্যে ১৯৭২ সালে শতকরা ২ ভাগের কম ছিল। এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৩৫ ভাগে। মোট সামষ্টিক আয়ে মাধ্যমিক খাতের অবদান ১৯৭২ সালে ছিল শতকরা ১৭ ভাগ। তার মধ্যে শিল্পোৎপাদনের অংশ ছিল শতকরা ৮ ভাগ। করোনা-পূর্ববর্তী সময়ে বার্ষিক সামষ্টিক আয়ে মাধ্যমিক খাতের অবদান ছিল শতকরা ৩৩ ভাগ (শিল্পোৎপাদনে শতকরা ১৮ ভাগ)।

২. ১৯৭২ সালে ৭.৫ কোটি মানুষের মধ্যে ছয় কোটি ছিল দারিদ্র্যসীমার নিচে; করোনা-পূর্ববর্তী ২০২০-২১ সময়ে ১৬.৫০ কোটি জনসংখ্যার বাংলাদেশে দরিদ্র লোকের সংখ্যা ছিল ৩.১ কোটি। এ অর্ধশতকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ৩.৩ থেকে শতকরা ১.৩ হারে নামানো সম্ভব হয়েছে। এরই মধ্যে খাদ্যোৎপাদন ১.১ থেকে প্রায় চার কোটি টনে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের জনগণের গড় আয়ুষ্কাল ৪৩ থেকে বেড়ে এখন ৭২ বছর। শিশুমৃত্যুর হার হাজারে প্রায় ২০০ থেকে ৩০-এর নিচে নামানো সম্ভব হয়েছে।

৩. ১৯৭২ সালের ৭৮৬ কোটি টাকার বাজেট এখন ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

খ. মতাদর্শের উন্মেষ ও বিকাশ

৪. ওপরে বর্ণিত আর্থসামাজিক অগ্রগতি এবং হাল আমলে শিল্প ও বাণিজ্য সমৃদ্ধির বিবরণ এ নিবেদনের পরবর্তী অংশে আবারও উত্থাপন করা হবে। তবে এসবই যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রদর্শিত মত ও পথ ধরে সংঘটিত হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কী সেই মত ও পথ, অর্থাৎ জাতির পিতার দর্শনের উদ্ভব ও বিকাশ এবং আজকের দিনে এর প্রাসঙ্গিকতার আলোচনা খুবই জরুরি। একই সঙ্গে প্রয়োজন বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির গভীরে প্রবেশ করা। কেন তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়ার মাধ্যমে গরিব-দুঃখী সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক দৈন্যদশা ও সামাজিক নিগ্রহ থেকে মুক্তির অন্বেষা ছোটোবেলা থেকে শাহাদত পর্যন্ত লড়াই-সংগ্রাম করেছেন। তাছাড়া যে মজবুত রাজনৈতিক দলকে লালনপালন আর মহিরুহ করে স্বাধীনতা অর্জনের সাংগঠনিক বাহক হিসাবে শেখ মুজিবুর রহমান ব্যবহার করেছেন, তার মূল দর্শন, কালান্তরে এর বিবর্তন এবং বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বাকশালে আত্মস্থ হওয়ার বিবরণ বিশ্লেষণও জানা জরুরি।

৫. গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বাল্যকালে শেখ মুজিব মধুমতীর তীরে প্রকৃতির নিবিড় সাহচর্যে বেড়ে ওঠেন। পিতা শেখ লুৎফর রহমান ছিলেন অত্যন্ত সৎ, স্বচ্ছ, সাহসী ও কর্তব্যনিষ্ঠ। মা সায়েরা খাতুন ধনাঢ্য পূর্বপুরুষের আমানত রক্ষার দৃঢ় নীতি থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করেন মুজিব। গৃহশিক্ষক কাজী আব্দুল হামিদ ও প্রধান শিক্ষক রসরাজ সেনগুপ্তের কাছ থেকে কিশোর মুজিব পরোপকার এবং দুর্বলকে রক্ষা করার দীক্ষা পান। গুরু সদয় দত্তের ব্রতচারী আন্দোলনের মর্মার্থ অর্থাৎ হিংসা-বিদ্বেষ ঈর্ষামুক্ত হয়ে পরধনে লোভী না হওয়ার বিষয়টি মুজিব চরিত্র গঠনে প্রভাব ফেলে। সুভাষচন্দ্র বসুর স্বদেশি আন্দোলনের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করা যাবে এবং সমাজের নিচতলাদের কল্যাণসাধন করা যাবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তবে সেই ত্রিশের দশক থেকেই শেখ মুজিব নেতাজির সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের পরিবর্তে অহিংস সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় ইংরেজদের বিতাড়িত করা যাবে বলে মনে করতেন। ওই সময়টাতে পিতা শেখ লুৎফর রহমান কতিপয় আক্ষেপকারীকে বলেন, 'আমার সন্তান শেখ মুজিব দেশ ও মানুষের সেবা করে দেখে আমি আনন্দিত ও গর্বিত। সে কোনো অন্যায় করছে না, দেশমাতৃকার মুক্তির পথ অন্বেষায় তার জেল-জুলুম হলেও আমি তাকে সমর্থন করে যাব।' শেখ মুজিবের চিন্তাচেতনা ও আদর্শ গঠনে এবং কিষান-কিষানির প্রতি মমত্ববোধে দাওয়াল প্রথা ভূমিকা রাখে। ১৯৩৮ সালে বাংলা প্রেসিডেন্সির প্রধানমন্ত্রী শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ও শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ সফরে এসে যুবক মুজিবের সৎসাহস ও জনসেবা প্রবৃত্তি দেখে মুগ্ধ হন। সেই থেকে সোহরাওয়ার্দী তার রাজনীতির শিক্ষাগুরু। নিজের অজান্তে হলেও গরিব কৃষককুলের ঋণভার লাঘবে এবং তাদের অধিকার সুরক্ষার নীতিতে প্রভাবিত হন শেখ মুজিব। ইসলামিয়া কলেজ ও বেকার হোস্টেলে দার্শনিক অধ্যাপক সাইদুর রহমান এবং বঙ্গীয় মুসলিম লীগের প্রগতিশীল সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম শেখ মুজিবের হৃদয় গভীরে জনসেবা ও অসাম্প্রদায়িক আদর্শের বীজ বপন করে দেন। ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের সময় কলকাতা ও গোপালগঞ্জে শেখ মুজিবুর রহমান বন্ধুবান্ধবদের নিবেদিতপ্রাণ সহযোগিতায় দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর স্থায়ী দীক্ষা গ্রহণ করেন। বেসামরিক সরবরাহ ও খাদ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক চালু করা লঙ্গরখানা স্থাপন ও পরিচালনা শেখ মুজিবের দারিদ্র্য নির্মূলের দর্শন গঠনে সহায়তা করে। ১৯৪৬ সালের মারাত্মক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় অকুতোভয় শেখ মুজিব দাঙ্গারত উভয় সম্প্রদায়কে বলেন, 'এটা হিন্দু-মুসলিম বিরোধ নয়, বরং সমন্বিত শক্তিতে উপনিবেশবাদী ইংরেজ শত্রুদের বিতাড়নে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সময় এটি।' কলকাতা করপোরেশনের মেয়র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, ডেপুটি মেয়র এইচএস সোহরাওয়ার্দী ও মুখ্য নির্বাহী সুভাষচন্দ্র বসুর নিয়মনীতি: সংখ্যাসাম্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত করপোরেশনের সব নিয়োগে ৬০ শতাংশ পদে মুসলমানদের নেওয়া হবে। শেখ মুজিব অসাম্প্রদায়িক চেতনায় মুগ্ধ হন।

গ. ভাষা আন্দোলনের সূচনা, বৈষম্যের পাহাড়

৬. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান (পূর্ববাংলার লোক!) করাচিতে শিক্ষা সম্মেলনের আয়োজন করান রাষ্ট্রভাষা উর্দুর পক্ষে কৌশল নির্ধারণের জন্য। এমনকি বাঙালি মায়ের মুখের ভাষাকে আরবি অথবা রোমান হরফে লেখারও ঘৃণিত প্রস্তাবে ফজলুর রহমানই উসকানি দেন। দেখা গেল দেশের শতকরা ৫৬ ভাগ অধ্যুষিত পূর্ববাংলার ভাগে রাজনীতি, প্রশাসন, সম্পদ বরাদ্দ, সশস্ত্রবাহিনী কেন্দ্রীয় আমলা বহরে নিয়োগ শতকরা ১৫-২০ ভাগ মাত্র। এদিকে পূর্ববাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সব পণ্য বিশ্বমূল্যে কিনতে হতো। আর পূর্ববাংলার চাল, পাট, কাগজ, নিউজপ্রিন্ট, লবণ, দেশলাই বিপুল ভর্তুকি মূল্যে কিনে নিত করাচির শাসককুল। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে বারবার বিধ্বংসী বন্যায় পূর্ববাংলার ফসল নষ্ট হতো এবং প্রাণহানি ঘটে যেত। পাকিস্তানিরা কিছুতেই ক্রুগ মিশন বাস্তবায়ন করে পূর্ববাংলার বন্যা নিয়ন্ত্রণে অর্থ বরাদ্দ করেনি। এদিকে কোরিয়া যুদ্ধে বোমা বানাতে জুতসই পাটের আঁশ উচ্চমূল্যে রপ্তানি করা হতো। সোনালি আঁশ নামে তখন থেকেই পরিচিত হয় পাট। চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজে ওঠা পাটের বৈদেশিক মুদ্রায় উচ্চমূল্য দিয়ে মূলধনি যন্ত্রপাতি ও শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল কিনে তা করাচি বন্দরে নামানো হতো পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিকভাবে মজবুত করার জন্য। এদিকে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের ভাষা বাংলায় পরিষদের কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করার দাবি উত্থাপন করলে পূর্ববাংলার কোনো মুসলিম লীগ সদস্যই এ প্রস্তাব সমর্থন করেননি। ১৯৪৭ সালের আগস্টে গণপরিষদ গঠিত হলে পূর্ববাংলা দেশহিতৈষী মহানুভবতা প্রদর্শন করে ছয়জন উর্দুভাষীকে এ প্রদেশের কোটায় গণপরিষদ সদস্য করতে সম্মত হয়। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এ ছয়জনের একজন। ভারত থেকে আসা উচ্চপদস্থ বহুসংখ্যক উর্দুভাষী কর্মকর্তাকে পূর্ববাংলার কোটায় নিয়োগ দেওয়া হয়। এমনকি চৌকশ বাঙালি প্রবীণতর কর্মকর্তা গোলাম মুরশিদকে ডিঙিয়ে পূর্ববাংলার চিফ সেক্রেটারি হিসাবে কট্টরপন্থি 'মাউরা' আজিজ আহমদকে পদায়ন করা হয়। আজিজ আহমদ করাচিতে বার্ষিক গোপনীয় রিপোর্টে পূর্ববাংলার বাংলাভাষী মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে তথ্য পাঠাতেন।

ঘ. বঙ্গবন্ধুর দর্শন: রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, কূটনীতি

৭. একটি পশ্চিমা ধাঁচের উদার গণতান্ত্রিক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করা আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে বামধারার একটি শক্তিও ছিল। চুয়ান্নর নির্বাচনে অনেক কমিউনিস্ট ও বামধারার নেতাকর্মী হুলিয়া থেকে বের হয়ে আওয়ামী লীগে যোগ দেন। সামরিক চুক্তিতে পাকিস্তানের থাকা-না-থাকা নিয়ে দলটিতে মতদ্বৈততা ও বিতর্ক এমনিতে ছিল। ১৯৫৭ সালে কাগমারী সম্মেলনের পর মওলানা ভাসানী সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী অংশটিকে নিয়ে আলাদা হয়ে গেলে শেখ মুজিবুর রহমান মূলধারায় সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নেতৃত্বে উদার গণতান্ত্রিক অংশকে বলীয়ান করতে সচেষ্ট হন। ততদিনে তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি। সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী 'সমাজতন্ত্রেই মুক্তি' ধারাকে জিইয়ে রাখেন।

৮. ষাটের দশকে বিশ্বব্যাপী 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' ইত্যাকার স্লোগানে বিশেষ করে ধনতান্ত্রিক বিশ্বে বৈষম্যের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ আওয়াজ ওঠে। ভারত ও পাকিস্তানে অর্থনৈতিক সক্ষমতা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংকিং ও বিমা খাতকে রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়।

> প্রয়োগবাদী হলেও মোটেও ধনতান্ত্রিক অবাধ বাজার অর্থনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না বঙ্গবন্ধু। বৈষম্য তাঁকে ভীষণ পীড়া দিত। ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ ভাষণে তিনি সমতাপ্রবণ বণ্টনব্যবস্থার প্রতি জোরদার বক্তব্য দেন

পাকিস্তানের ২২ পরিবার কোটিপতির (মাত্র একজন পূর্ব পাকিস্তানে) হাতে সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড গণবিক্ষোভ দানা বাঁধে। আওয়ামী শব্দের অর্থ জনগণ। আওয়ামী লীগ সেসময় জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সমাজতন্ত্রকে একটি মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করে।

৯. উনসত্তরের বিশ্বখ্যাত গণঅভ্যুত্থানের ঢেউ আগরতলা মামলাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়; বিচারপতি পালিয়ে যান। মহীয়সী নারী শেখ ফজিলাতুন নেছার পরামর্শ গ্রহণ করে শেখ মুজিব প্যারোলে গোলটেবিলে যেতে অস্বীকার করেন। বাংলার দামাল ছেলেমেয়েরা জেলের তালা ভেঙে শেখ মুজিবকে মুক্ত করে। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং দেশবাসীর পক্ষে ডাকসু ভিপি তথা ছাত্রলীগ সভাপতি তোফায়েল আহমেদ ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯-এ জনগণের প্রাণপ্রিয় সম্মোহনী শক্তির অধিকারী শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু অভিধায় ভূষিত করেন। অনুরূপভাবে পাকিস্তান শক্তিমান সেনা সরকারের কারাগারে আটক ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার অপেক্ষমাণ বঙ্গবন্ধুকে অতিশয় সম্মানের সঙ্গে মুক্তি দেওয়া হয় ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি। ১০

জানুয়ারি বীরবেশে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পদার্পণ করেন মুক্ত বিহঙ্গ বঙ্গবন্ধু। রেসকোর্সের ময়দানে জমায়েত ১০ লাখ জনতা গগনবিদারী স্লোগানে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাদের বিজয়ী বীরকে জাতির পিতা হিসাবে বরণ করে নিল।

১০. স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাঝে ওইদিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, 'এই স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে, যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়, এ স্বাধীনতা পূর্ণ হবে না যদি, বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়, এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এ দেশের যুবক যারা আছে তারা কাজ না পায়। আজ থেকে বাংলায় যেন আর চুরি-ডাকাতি না হয়, লুটতরাজ না হয়।' মোদ্দা কথায় এটিই জাতির পিতার আজীবন সাধনা ও আত্মত্যাগের রাজনীতির মূল উপজীব্য এবং অর্থনীতির মোটা দাগের দর্শন। সমাজ সংস্কারে সুষম এবং সমতাপ্রবণ জাতিগোষ্ঠী গড়ার প্রত্যয়ও এতে ফুটে ওঠে। 'সবার সাথে সখ্য কারও সাথে বৈরী নয়' ঘোষণা দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। কোনো সামরিক ব্লকে যোগ না দিয়ে জোটনিরপেক্ষ থাকার সাহসী পথচলাও মুজিব ও বাংলাদেশের প্রতি বিশ্ববাসীর অসাধারণ শুভকামনা সৃষ্টিতে বিরাট অবদান রাখে। জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলের সর্বকাণ্ডে বাংলা ভাষা ব্যবহারের নীতিতে দৃঢ়কণ্ঠ ছিলেন বঙ্গবন্ধু।

১১. প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল অংশের প্রথম বাক্য হলো:

'২.১ Objectives of the Plan

The basic objectives of the plan are as follows:

To reduce poverty. This is the foremost objective of the plan.'

পাকিস্তানি শোষণের ২৪ বছরে বাংলাদেশের মানুষ দরিদ্র হয়েছে বলে দারিদ্র্য নির্মূল বঙ্গবন্ধুর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

১২. মধ্যস্বত্বভোগীদের অতিরিক্ত মুনাফার কারণে উৎপাদনকারী ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ, তারা পণ্যের উপযুক্ত মূল্য থেকে বঞ্চিত হন। আবার ক্রেতাকে গুনতে হয় অতিরিক্ত মূল্য। সেজন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ মধ্যস্বত্বভোগী উৎপাত ব্যাপকভাবে হ্রাস করার পক্ষপাতী ছিলেন। চুয়াত্তরের মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষে মধ্যস্বত্বভোগী মিল মালিক মজুতদারদের নষ্ট ভূমিকা অনেকাংশেই দায়ী ছিল। বর্তমান সময়েও প্রায় সংবৎসরের চাল, পেঁয়াজ, ভোজ্য তেল প্রভৃতি পণ্যে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে মুনাফাখোরি করা হচ্ছে।

১৩. ৫০ বছরের অর্জন ও অপূর্ণতা নিয়ে গবেষণা চলছে, চলছে লেখালেখিও। তবে মোটা দাগে কয়েকটি কথার অবতারণা না করলেই নয়। প্রবৃদ্ধি আর সামাজিক রূপান্তরের অতিরিক্ত যে বিশাল স্বীকৃতি এলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসাবে আমার মায়ের ভাষা বাংলার, তার তুলনা নেই। বিশ্বব্যাংকের অন্যায় ঘাউরামির মুখে ঋণ বাতিল করে শেখ হাসিনা নিজস্ব অর্থাৎ নকশা, কারিগরি, ব্যবস্থাপনা ও শ্রমজীবী নিয়ে প্রায় চার মাইল দৈর্ঘ্য পদ্মা সেতু নির্মাণ করেছেন, তাতে বিশ্ববলয়ে দেশের ভাবমূর্তি অনেক উজ্জ্বল হয়েছে। অতিরিক্ত অগ্রাধিকারে রেলের কাজ ত্বরান্বিত করে জুন ২০২২-এ যদি একযোগে সেতু, সড়ক ও রেলপথ চালু হয়, তাহলে অর্থনৈতিক সংযুক্তির মাধ্যমে বার্ষিক সামষ্টিক আয় প্রবৃদ্ধিতে ১.০২ থেকে ১.০৭ শতাংশ যোগ হবে, হবে কর্মসংস্থান, পণ্যের বেশি মূল্য পাবেন কিষান-কিষানিরা, পর্যটনের ঢেউ আসতে পারে। প্রতিবছর দারিদ্র্য হ্রাস পাবে শতকরা ০.৮৪ থেকে ১.০০ ভাগ। কর্ণফুলি টানেল, মেট্রোরেল, বাংলাদেশব্যাপী নদী ড্রেজিং, রেলের ব্রডগেজকরণ ও বিদ্যুদায়ন ইত্যাকার মেগা প্রকল্প অভ্যাসে পরিণত হওয়া সময় ও খরচ বাড়ানোর দুর্নীতিতে লাগাম দিতে পারলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক রূপান্তরে আরও গতি আসবে। মহান স্বাধীনতার পরই অর্জনের দিক থেকে শীর্ষস্থানে আছে জাতিসংঘসহ বিশ্বময় শেখ হাসিনার অকুতোভয়, উদ্ভাবনী ও অসাধারণ নেতৃত্ব; এটি পদ্মা সেতু নির্মাণের পর আরও বেড়েছে, যেমনটি ইতিবাচক হয়েছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি।

১৪. বঙ্গবন্ধুর কাঙ্ক্ষিত ও প্রদর্শিত পথে যে দুটো কাজ করা হয়নি এর একটি হচ্ছে সমবায়ব্যবস্থা প্রবর্তন। তিনি সুস্পষ্টভাবেই গ্রামীণ সমবায় সমিতি গঠন এবং এর মাধ্যম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সম্পদ বিতরণের কথা বলে গেছেন। উৎপাদন ও বিপণন সমবায় সমিতি গঠন, তাদের সাশ্রয়ী সুদে (৩%-৪%) ঋণদান, খাদ্য সংরক্ষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি, এতে অগ্রাধিকারভিত্তিক সমবায়ী ধান, চাল, পেঁয়াজ, আলু রাখার ব্যবস্থা করা হলে উৎপাদনকারীরা নিজের ফসল সমবায় মাধ্যমে নিজেই কিনে গুদামজাত করবেন এবং বছরব্যাপী তা বিক্রি করে নিজেরা এখনকার চেয়ে বেশি দাম পাবেন এবং ক্রেতারা কম দামে কিনতে পারবেন। মূল্য থাকবে স্থিতিশীল। শুধু লোকসান হবে ১ হাজার ২০০ মিল মালিক আর তাদের দোসর কিছু দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার। মিল মালিকরা হুমকি দিচ্ছে, সরকার দাম না বাড়ালে তারা সরকারের কাছে ধান, চাল বিক্রি করবে না। দেশদ্রোহিতা নয়তো! খবর নিয়ে জানা যায়, বর্তমানে চালের মজুত ৫.৫ লাখ টন। আতঙ্ক না হলেও ভয় লাগতেই পারে। কারণ আমনের সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী হয়নি। তার মূল কারণই হচ্ছে মিল মালিক ও দুর্নীতিবাজদের কারসাজি। তথ্যানুসন্ধান বলছে, আউশের ফসল সামান্য কমে ১৫.৭ লাখ টন হলেও শুধু সংগ্রহমূল্য বাজারমূল্যের কম ধার্য করার ফলে (অন্তর্ঘাত নয়তো!) সংগ্রহ একেবারেই ছিটেফোঁটা। স্মর্তব্য যে, ১৯৭৪ সালের অক্টোবরে যে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা হয়েছিল তারও মূল চাবিকাঠি ছিল মধ্যস্বত্বভোগীদের গুজব সৃষ্টি করে দাম বাড়িয়ে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের ভাষায় রংপুর, জামালপুর ও টাঙ্গাইলের কয়েকটি এলাকার অনেকজনের 'এনটাইটেলমেন্ট' চলে যাওয়া ক্রয়ক্ষমতার অভাবে। সামগ্রিকভাবে দেশে খাদ্যশস্যের অভাব ছিল না। মঙ্গা (শেখ হাসিনা সরকার মঙ্গা শব্দটি বাংলার অভিধান থেকে উঠিয়ে দিতে পেরেছে) এলাকার চাল-গম পরিবহণের কোনো পরিকল্পনাই করা হয়নি। বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গে সংযুক্ত হয় মার্কিনদের সংগতকারণে দুটো খাদ্যবোঝাই জাহাজ আগস্টের বদলে নভেম্বরে আসার কারণে। পরিকল্পনা কমিশন ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উচিত ছিল পিএল-৪৮০ এর শর্তাধীনে বাংলাদেশের মতো মার্কিন খাদ্য মঞ্জুরি গ্রহণকারী দেশ সমাজতান্ত্রিক দেশ কিউবায় পাট রপ্তানি করলে খাদ্য মঞ্জুরি বাতিল হয়ে যাবে। সে সম্পর্কে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে অবহিত করা। তারা মোটেও হোমওয়ার্ক করেনি।

১৫. বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ ১৯৭৫-এর বিপর্যয় এবং মাঝেমধ্যে জনস্বার্থে উদাসীন সরকারের গদিনশিন থাকার ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা এসেছে। তবে গত এক যুগে সর্বনাশা করোনার ছোবলের আগ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং হৃদয় উষ্ণ করা এর সামাজিক রূপান্তর বিশ্ববাসীর সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মাথাপিছু আয়ের হিসাবে ২০১৭ সালে পাকিস্তানকে এবং ২০২০ সালে ভারতকে টপকে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। তবে আত্মপ্রসাদের কোনোই অবকাশ নেই।

১৬. দেশের কৃষককুল আমাদের খাবার অন্ন নিশ্চিত করেছেন। বস্ত্রে আমরা স্বয়ম্ভর, যদিও তৈরি পোশাকে আমদানি করা কাপড়ে এবং বন্ডের ছিদ্র দিয়ে দুর্নীতি অপব্যবহার রোধ করা জরুরি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবকাঠামো বিস্তৃত ও মজবুত হয়েছে বাংলাদেশে। শ্রমজীবী ভাইবোনরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি করেছেন। তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার রপ্তানি করে বিপুল সম্ভার দিয়ে

প্রায় ৪ হাজার ৬০০ কোটি ডলারের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গড়তে অবদান রেখেছেন। প্রবাসে শ্রমজীবীদের সেবায় কষ্টার্জিত রেমিট্যান্সপ্রবাহ এখন দৃষ্টিনন্দন। শূন্যের কোঠায় শুরু করা বাংলাদেশের শিল্পোদ্যোক্তারা এখন বিশ্বসভায় নন্দিত।

ঙ. বর্তমান ভবিষ্যতের হালচাল ও করণীয়

১৭. করোনার কশাঘাতে অর্থনীতি বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রাক্কলিত বার্ষিক সামষ্টিক আয় প্রবৃদ্ধি ৮.১ শতাংশ ছিল; অর্জন ৩.৫১ শতাংশ। অনুরূপভাবে ২০২০-২১ অর্থবছরে মূল প্রাক্কলন ৮.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি সংশোধন করে ৫.৪৭ শতাংশে হ্রাস করা হয়েছে; এটিও অর্জিত হয়েছে কি না সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। বর্তমান বছরের ২০২১-২২ বাজেটে বার্ষিক সামষ্টিক আয়ের প্রবৃদ্ধি শতকরা ৭.২ হবে বলে যে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, তা অর্জনের আশা করা খুবই বাস্তবসম্মত নয়। মার্কিন অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি শুরু হয়েও থেমে যাচ্ছে। ইউরোপীয় সম্প্রসারণও করোনায় আবারও হুমকির সম্মুখীন। ভারতের অবস্থাও তেমন ভালো নেই। চীন ভালো করছে। তবু দেশটি তৈরি পোশাকে পুঁজি প্রত্যাহার করছে। এর সিংহভাগ দেশান্তর হচ্ছে ভিয়েতনামে। ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও মালয়েশিয়া তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বেশ ভালোভাবে অগ্রসরমান; উৎপাদনশীলতার অগ্রসরতা এবং ব্যবস্থাপনার মুনশিয়ানা এ অর্জনের দাবিদার। বিশ্বব্যাংক বলছে, সস্তা শ্রমে নিম্ন আয়ের জন্য কম মূল্যের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে বেশি দূর যাওয়া যাবে না। ডিজাইন ও গন্তব্য বহুমুখীকরণ ছাড়া পোশাক রপ্তানি টেকসই হবে না। বিদেশি বিনিয়োগও প্রয়োজন। আমাদের রপ্তানি বাড়ছে না, আমদানি স্থিতিশীল, তবে ভোগ্যপণ্য আমদানি বাড়ছে। রেমিট্যান্সপ্রবাহে আশঙ্কিত কমে যাওয়া শুরু হয়েছে। করোনার আঘাত থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য যে সাহসী ও বিপুল প্রণোদনা প্যাকেজ সরকারপ্রধান ঘোষণা করেছেন শুরু থেকেই তার যে অংশটি কুটির, অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র শিল্পের পুনরুত্থান ঘটানোর কথা তার সিংহভাগ অব্যবহৃত থাকছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের কর্মসংস্থান তথা আয়-রোজগার শুধু যে কমছে তা নয়, আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাচ্ছে। ফলে অভ্যন্তরীণ বিশেষ করে ভোগ্যপণ্যের খরচ দিয়ে অর্থনীতির পুনর্জাগরণের ধারাটি সচল হচ্ছে না। এ ব্যাপারে সরকার ও শিল্প বণিক সমিতিগুলো যৌথভাবে সমীক্ষা করে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় কুটির, অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র শিল্পের ধারাটিকে দ্বিগুণ আলোয় প্রজ্বালন করতে পারেন। এক্ষেত্রে ভেঞ্চার ক্যাপিটালের সহায়তা কাজে আসবে।

১৮. বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় একটি বড়ো দুর্বলতা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অপ্রতুল বাস্তবায়ন এবং বছরের শেষের দিকে তাড়াহুড়ার খরচ। ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সংশোধিত বরাদ্দের মাত্র শতকরা ৬০ ভাগ বাস্তবায়ন হয়; আর মে-জুনে খরচ হয় শতকরা ৪০ ভাগ। মে-জুনের বৃষ্টি আর বন্যার পানির নিচে আর নদীভাঙন ও বাঁধের ফাটলে দেশের অর্থসম্পদের একটি অংশ তলিয়ে যায়, দশের তেমন কোনো উপকার হয় না। অনাচার রোধে জানুয়ারি-ডিসেম্বর অর্থবছর করার জোর সুপারিশ পুনরায় পেশ করছি।

১৯. বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রাপথে সবচেয়ে লজ্জার জায়গা হলো পৃথিবীর প্রায় সর্বনিম্ন ট্যাক্স: জিডিপি অনুপাত (শতকরা ১০ ভাগের নিচে এবং প্রবণতা নিম্নগামী)। বস্টন কনসালটিং গ্রুপ ও মাস্টার কার্ড ২০১৬ সালেই সমীক্ষা করে দেখিয়েছে যে, বাংলাদেশে ২.৫ কোটি লোকের হাতে পাঁচ হাজার মার্কিন ডলারের মাথাপিছু আয় এবং ভোগ্যপণ্যে চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী রয়েছে। অথচ কর আদায় করেন মাত্র ২৫ লাখ করদাতা অর্থাৎ করযোগ্য আয় অর্জনকারীর মাত্র শতকরা ১০ ভাগের কাছ থেকে। আর কর রাজস্ব আদায় করতে না পারলে বিনিয়োগে পাবলিক সেক্টর কীভাবে অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি ব্যক্তি খাতের প্রসারে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এ ব্যাপারে আপৎকালীন অগ্রাধিকারে সম্মিলিত এবং আপস-মীমাংসার মাধ্যমে কার্যকর কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব এবং উচিত।

> অর্থনীতির পুনরুত্থানে এবং জাতির পিতার দর্শন–সোনার বাংলায় কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি খাতের সব অংশীদার দৃষ্টিনন্দনভাবে সফল ও বিশ্বনন্দিত সরকারের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে সংস্কার ও সংস্কার কর্মসূচি হাতে নিতে হবে

অর্থনীতির পুনরুত্থানে এবং জাতির পিতার দর্শন–সোনার বাংলায় কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি খাতের সব অংশীদার দৃষ্টিনন্দনভাবে সফল ও বিশ্বনন্দিত সরকারের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে সংস্কার ও সংস্কার কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। উৎপাদন ও রপ্তানিতে বহুমুখিতা নিশ্চিতের কাজ এবং সমতাপ্রবণ বিতরণ অর্থনীতি দিয়েই সংস্কার শুরু করা যায়।

লেখক: সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য

অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার গতিপ্রকৃতি অতীত ও বর্তমান

তানভীর আহমদ

সে ই দিন গত হয়েছে, যখন মানুষ ভাবত–ব্যাবসাবাণিজ্য, অর্থনীতির খবর কেবল ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী ও অর্থনীতিসংশ্লিষ্টরাই রাখবে। এখন নানা ধরনের অর্থনৈতিক সংবাদ খুবই সাধারণ একজন নাগরিকের কাছেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ এখন যে ব্যাংকের সেবাগ্রহীতা বা যে কোম্পানির পণ্যের ক্রেতা, সে সম্পর্কে আরও বেশি জানতে চায়। পরিবহণব্যবস্থার অগ্রগতি, ই-কমার্সের বিস্তার, বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর বাজার সম্প্রসারণের কারণে বিভিন্ন পণ্য ও সেবার ভোক্তার পরিমাণ আগের চেয়ে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর তথ্যচাহিদা মেটাতে সংবাদমাধ্যমগুলো সাম্প্রতিক সময়ে অর্থনীতি ও ব্যাবসাবাণিজ্যের খবরে আরও বেশি মনোযোগ দিচ্ছে। পত্রপত্রিকায় অধিকতর জায়গা, রেডিয়ো-টিভিতে অধিকতর সময় বৈচিত্র্যময় বিষয়ের অর্থনৈতিক সংবাদ প্রকাশিত, প্রচারিত হচ্ছে।

অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা হচ্ছে অর্থনীতি ও আর্থিক খাত সম্পর্কিত নানা খবর ও বিষয়াদি নিয়ে সাংবাদিকতা। Kariithi (2003:153)-এর মতে, অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ঘটনা ও বিষয়াবলি কাভার করে, ব্যাবসা সাংবাদিকতা স্থানীয় অর্থনৈতিক বিষয়াদি গভীরভাবে অনুসন্ধান করে এবং আর্থিক সাংবাদিকতা আর্থিক খাতের বিভিন্ন বিষয়কে ব্যষ্টিক অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরে। তার মতে, এই তিন ধরনের সাংবাদিকতার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও এদের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ এবং এদের কার্যত একই ধরনের বলে বিবেচনা করা হয়। এই নিবন্ধে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা শব্দবন্ধটি দিয়ে এই তিন ধরনের সাংবাদিকতাকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা অন্যান্য ধরনের সাংবাদিকতা থেকে স্বতন্ত্র, ঘটনার বিবরণ তুলে ধরাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়, নিয়ত পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক বাস্তবতাটি এবং ঘটনাবলির আন্তঃসম্পর্কের বিষয়টিও এক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হয়। এ কারণেই Roush (2004:2) মনে করেন, বর্তমান সময়ের সংবাদমাধ্যমে অর্থনৈতিক সাংবাদিকের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আর কেউ করেন না।

অতীত

ব্যাবসা ও অর্থনীতিবিষয়ক সাংবাদিকতার ইতিহাস খোদ সাংবাদিকতার ইতিহাসের সমপরিমাণ প্রাচীন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সংবাদপত্রের জন্মই হয়েছিল শাসক এলিট ও বড়ো ব্যবসায়ীদের

আর্থরাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য। তাই প্রারম্ভিক সংবাদপত্রগুলোর সংবাদ গহ্বরের বেশির ভাগ জায়গাই পূর্ণ থাকত সওদাগরি জাহাজগুলোর বন্দরে পৌঁছানো ও বন্দর ত্যাগের খবর, জিনিসপত্রের দাম, বাণিজ্যসংশ্লিষ্ট সরকারি সার্কুলার প্রভৃতিতে। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম সংবাদপত্র হিকির বেঙ্গল গেজেট এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

সাংবাদিকতার ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, মধ্যযুগের ইউরোপে বিত্তবান ব্যবসায়ী পরিবারগুলো নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের সুবিধার্থে নিউজলেটার প্রকাশ করত। জার্মানির অগসবার্গ শহরে বিখ্যাত ফাগারস পরিবার 'ফাগারজেইটাঙ্গেন' (ফাগার সংবাদপত্র) ব্যবহার করত অর্থনৈতিক সংবাদ সংগ্রহের জন্য। ১৫৬৮ থেকে ১৬০৪ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালে প্রকাশিত হাতে লেখা এই নিউজলেটারগুলোয় পণ্যের মূল্যসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক তথ্যাদি থাকত। এসব নিউজলেটারের লক্ষ্য আধুনিক অর্থনীতিবিষয়ক সংবাদমাধ্যমের মতোই ছিল বাজারসংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করা এবং ওইসব তথ্য বিশ্লেষণ করা। ফাগার নিউজলেটারগুলোয় প্রকাশিত বিষয়াবলির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রাজা-রানির মৃত্যু, যুদ্ধ, জাহাজের আগমন-নির্গমন, ১৫৩১ সালে স্থাপিত এন্টওয়ার্প এক্সচেঞ্জে অগ্নিকাণ্ডের খবর প্রভৃতি।

সপ্তদশ শতক থেকে ব্রিটিশ পত্রপত্রিকাগুলো ব্যাবসায়িক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে শুরু করে। ব্যাবসাসংক্রান্ত প্রথম যে তথ্য আমরা এসব পত্রিকায় পাই তা হলো পণ্যবাহী জাহাজগুলোর বন্দরে পৌঁছানো ও বন্দর ছেড়ে যাওয়ার খবর। ১৭৫০-এর দশক থেকে সংবাদপত্রে বিভিন্ন পণ্যের মূল্যতালিকা অন্তর্ভুক্ত হতে দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম অর্থনীতিবিষয়ক সংবাদপত্র দ্য নিউ হ্যাম্পডেন জার্নাল ১৭৯৩ সালে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে ১৮৩৫ সাল থেকে নিউইয়র্ক হেরাল্ড পত্রিকা ব্যাবসা-অর্থনীতির খবরের জন্য একটি আলাদা পৃষ্ঠা বরাদ্দ করতে শুরু করে। লন্ডন ও নিউইয়র্কের জনপ্রিয় কফিশপগুলোয় জমায়েত হওয়া ব্যবসায়ীদের আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে ব্যাবসায়িক তথ্য আদান-প্রদানের যে ঐতিহ্য অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে গড়ে উঠেছিল, এর ধারাবাহিকতায় এভাবে প্রথমে নানা ধরনের প্যাম্ফলেট এবং পরে সংবাদপত্রের আবির্ভাব হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের আদি বসতি স্থাপনকারীরা ফসল ও গবাদিপশুর দাম, বন্দরে কোন জাহাজ কী ধরনের পণ্য নিয়ে ভিড়েছে–এজাতীয় খবরের জন্য সংবাদপত্রের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দী নাগাদ কেবল অর্থনৈতিক সংবাদকে উপজীব্য করে পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮২৭ সালেই দ্য জার্নাল অব কমার্স প্রকাশিত হয়। ১৮৮৮ সালে যুক্তরাজ্যের বাজারে আসে দ্য ফিন্যান্সিয়াল টাইমস এবং যুক্তরাষ্ট্রে দ্য ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল, যা এখনো যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাধিক বিক্রীত সংবাদপত্র।

তবে ওই সময়কার সবচেয়ে আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সংবাদগুলো প্রধানত মূলধারার সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হতে দেখা যায়। বিখ্যাত সাংবাদিক হোরেস গ্রিলি নিউইয়র্ক ট্রিবিউন পত্রিকায় ১৮৫০-এর দশকের শেষদিকে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী একটি রেলপথের গুরুত্ব নিয়ে প্রতিবেদন লেখেন। এটি আঞ্চলিক অর্থনীতিগুলোকে সমন্বিত করে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে কাজে লাগানোর প্রথম বড়ো প্রচেষ্টা হিসাবে বিবেচিত। গ্রিলি মার্কিন অর্থনীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, খামার স্থাপনের জন্য স্বল্পমূল্যে জমি বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন। এর এক দশক পর নিউইয়র্ক সান পত্রিকা প্রথম আন্তঃমহাদেশীয় রেলপথ নির্মাণের ক্ষেত্রে দুর্নীতির ঘটনা উন্মোচন করে। প্রতিবেদনে বলা হয়, রেল কোম্পানিগুলো পারস্পরিক যোগসাজশে একটি নির্মাণ কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত করেছিল, কংগ্রেস সদস্যদের হ্রাসকৃত মূল্যে কোম্পানির শেয়ার ঘুসের বিনিময়ে রেলপথ স্থাপনের কন্ট্রাক্ট সেই কোম্পানিকে পাইয়ে দেওয়া হয়। মার্কিন কংগ্রেস প্রতিবেদনটিকে আমলে নিয়ে কোনো করপোরেশনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রথম বড়ো ধরনের তদন্তে নেমেছিল (Roush, 2004)।

অর্থনীতি ও ব্যাবসাভিত্তিক সাংবাদিকতা কখনো কখনো ব্যাবসাসংক্রান্ত আইনকানুন প্রবর্তন ও সংশোধনেও ভূমিকা রাখছিল। যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে মাংস প্যাকেটজাতকরণ শিল্পের অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশ তুলে ধরে ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয় আপটন সিনক্লেয়ারের দ্য জাঙ্গল নামের একটি বই। মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট বইটি পড়ে এ বিষয়ে অনুসন্ধানের নির্দেশ দেন, যার ফলে ১৯০৬ সালে পিউর ফুড অ্যান্ড ড্রাগস অ্যাক্ট এবং মিট ইনস্পেকশন অ্যাক্ট অনুমোদিত হয়। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার এক পথিকৃৎ ইডা টারবেল ম্যাক ক্লিউরস ম্যাগাজিনে বৃহৎ জ্বালানি তেল পরিবেশক সংস্থা স্ট্যান্ডার্ড অয়েলের অনৈতিক অর্থনৈতিক আচরণ তুলে ধরেন। কোম্পানিটি নানা কূটকৌশলে প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানিগুলোকে বাজার থেকে সরিয়ে একাধিপত্য কায়েম করতে চাচ্ছিল। প্রতিবেদনটি প্রকাশের পর ১৯১১ সালে সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে স্ট্যান্ডার্ড অয়েলকে ছোটো ছোটো কয়েকটি কোম্পানিতে বিভক্ত করে দেওয়া হয়। ১৯০৬ সালে কসমোপলিটন পত্রিকায় শিশুশ্রম নিয়ে প্রতিবেদন লেখা হলে পুরো যুক্তরাষ্ট্রে কলকারখানায় অল্পবয়সি শ্রমিকদের অপব্যবহার নিষিদ্ধ হয়।

বিনিয়োগ খাতের সংস্কারেও অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার ভূমিকা রয়েছে। ১৯২০ সালে বোস্টন পোস্ট পত্রিকায় চার্লস পনজি নামে এক আর্থিক বিশেষজ্ঞের অপকর্ম তুলে ধরা হয়। সে বিনিয়োগকারীদের বিশাল মুনাফাপ্রাপ্তির লোভ দেখিয়ে প্রতারণা করছিল। পনজিকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত যে কোনো অবৈধ পিরামিড স্কিম, যেখানে এক বিনিয়োগকারীর অর্থ থেকে আরেক বিনিয়োগকারীর পাওনা পরিশোধ করা হচ্ছে, পনজি স্কিম নামে অভিহিত করা হয়। এ ধরনের স্কিম বাংলাদেশের আর্থিক খাতের কয়েকটি বড়ো দুর্ঘটনার কারণ হয়েছে। ১৯৫২ সালে রিডার্স ডাইজেস্ট পত্রিকায় ধূমপানের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি ও ক্যানসার রোগের সঙ্গে এর সম্পর্ক তুলে ধরার মধ্য দিয়ে ধূমপানবিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয়, তামাক শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে যার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। যানবাহনের নিরাপত্তা ত্রুটি নিয়ে ১৯৫৯ সালে দ্য নেশন পত্রিকায় র‍্যালফ নাদের যে প্রতিবেদন লেখেন, এর ফলে অটোমোবাইল শিল্পের ব্যাপক সংস্কার ঘটে, যানবাহনের নিরাপত্তাসংক্রান্ত নতুন বিধিবিধান অনুমোদিত হয়। এ ঘটনা সারা বিশ্বে ভোক্তা আন্দোলন বিস্তৃত হওয়ার প্রধান অনুঘটক হয়ে উঠেছিল।

১৯২৯-এ মার্কিন শেয়ারবাজারে ধস এবং তৎপরবর্তী বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মহামন্দার ঠিক আগে প্রকাশিত হয় বিজনেস উইক ম্যাগাজিন। পরের বছর বাজারে আসে ফরচুন। এই দুটি প্রকাশনা পরবর্তী দশকগুলোয় অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার বহু অনুসরণযোগ্য উদাহরণ তৈরি করেছে।

১৯৭০ সালে পাবলিক টেলিভিশনে লুই রুকিয়ারের উপস্থাপনায় সম্প্রচারিত হয় ওয়ালস্ট্রিট উইক নামে এক অনুষ্ঠান, যেখানে আলোচনার মূল বিষয় ছিল স্টক মার্কেট ও অর্থনীতি। আজকের দিনের সিএনবিসি, ব্লুমবার্গ টেলিভিশন, ফক্স বিজনেসের মতো ব্যাবসাবাণিজ্য, অর্থনীতির খবরভিত্তিক ২৪ ঘণ্টার টিভি চ্যানেলগুলোর পূর্বসূরি হিসাবে যাকে বিবেচনা করা হয়।

বিশ্বজুড়ে তথ্য বিতরণের বাণিজ্যে সক্রিয় বার্তা সংস্থাগুলোর উদ্ভব ও বিস্তারের পেছনেও রয়েছে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার প্রণোদনা। ১৮৪০-এর শেষদিকে জার্মানির উলফ, ফ্রান্সের হাভাস এবং যুক্তরাজ্যের রয়টার্স তথ্য ও সংবাদকে অর্থনৈতিক পণ্য এবং অর্থনীতির সংবাদকে এর মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান সওদা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। পরবর্তী সময়ে ইউপিএ (ইউনাইটেড প্রেস অ্যাসোসিয়েশন), এপি (অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস), আরও সাম্প্রতিক সময়ে নাইট রাইডার, ডাউ জোনস এবং ব্লুমবার্গ যুক্ত হয় এই বাণিজ্যে। এসব বার্তা সংস্থা শুরু থেকেই কেবল পত্রপত্রিকার কাছে সংবাদ নয়, বড়ো ব্যবসায়ী, ব্রোকারদের কাছে আর্থিক, ব্যাবসায়িক তথ্যও বিক্রি করে আসছে। গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের শেষার্ধেও রয়টার্সের বার্ষিক আয়ের ৯০ শতাংশই আসত নানা রকম আর্থিক সেবা থেকে। বার্তাসংস্থাগুলোর প্রতিষ্ঠাতাদের সবারই ব্যাংকিং খাতের কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল; লন্ডন, বার্লিন ও প্যারিসের স্টক এক্সচেঞ্জগুলোর কর্মকাণ্ডেও তারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

১৯৯০ সালে শুধু অর্থনৈতিক সংবাদ পরিবেশনের জন্যই ছয়জন কর্মী নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যাত্রা শুরু করা ব্লুমবার্গ নিউজ নামের বার্তা সংস্থা এখন ৭২টি দেশে ১৪৬টি ব্যুরো আর আড়াই হাজার সম্পাদক, প্রতিবেদকের বিশাল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এ ধরনের বার্তা সংস্থার মধ্যে আরও আছে ডাউ জোনস নিউজ ওয়্যারস, রয়টার্স বিজনেস।

সাংবাদিকতার সম্মানজনক পুলিৎজার পুরস্কারে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার জন্য আলাদা কোনো ক্যাটাগরি না থাকলেও উদ্যমী সাংবাদিকরা উচ্চমানসম্পন্ন প্রতিবেদন তৈরির মাধ্যমে ব্যাবসা ও অর্থনীতির নানা দিক পাঠকের কাছে উন্মোচন করে অনেকবারই পুরস্কার অর্জনের গৌরব অর্জন করেছে। ১৯২১ সালে পনজি স্কিম নিয়ে রিপোর্টের জন্য বোস্টন পোস্ট, ১৯২৯-এ ফেডারেল অফিসের মাধ্যমে গোপনে তেলের মজুত লিজের ঘটনা তুলে ধরে সেন্ট লুইস ডিসপ্যাচের পুলিৎজারপ্রাপ্তি থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক সময়ে অ্যাপল কোম্পানির চীনা কারখানাগুলোয় ক্ষতিকর রাসায়নিকের উপস্থিতি, মেডিকেয়ার চিকিৎসকদের দুর্নীতি, বিত্তশালী নাগরিক ও করপোরেশনগুলোর কর ফাঁকির ঘটনা উন্মোচন করে পুলিৎজার লাভ এর উদাহরণ।

১৯৭০-এর দশকে মধ্যপ্রাচ্যে সংকটের কারণে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশে জনগণকে অর্থনৈতিক খবরাখবরে উৎসাহিত করে তোলে। বাংলাদেশে আশির দশকে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ) ও বিশ্বব্যাংকের প্রস্তাবিত কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির ব্যর্থতা জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমে এ সম্পর্কিত লেখালেখির কলেবর বৃদ্ধি করেছিল। পরবর্তী সময়ে নব্বইয়ের দশকের দারিদ্র্যবিমোচন কৌশলপত্র বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতাও বাংলাদেশের জন্য সুখকর হয়নি। বাজার অর্থনীতির জন্য বাংলাদেশকে তৈরি করার পূর্বপ্রস্তুতি হিসাবে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষমতা হ্রাস ও বিলুপ্তি; বিপরীতে বেসরকারি ব্যাবসা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আধিপত্য বৃদ্ধি; আমদানির সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় কৃষি ও শিল্প খাত থেকে সমর্থন প্রত্যাহার; স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ মৌলিক সেবাগুলো থেকে ভর্তুকি প্রত্যাহার এবং তেল, গ্যাস, বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, গার্মেন্ট খাতের মতো সস্তা শ্রমভিত্তিক রপ্তানি পণ্যকে উৎসাহদান করা হয়েছিল। ফলে নতুন যে অর্থনৈতিক বাস্তবতা বাংলাদেশে সৃষ্টি হয়েছিল, এর তাৎপর্য অনুধাবন ও প্রভাব মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চাহিদা মেটাতে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার বিকল্প ছিল না। ফলে নব্বইয়ের দশকের শেষ ভাগ থেকে সংবাদপত্রগুলো অর্থনীতি, ব্যাবসাবাণিজ্য, শেয়ারবাজারের খবরাখবরের জন্য আলাদা পৃষ্ঠা বরাদ্দ করতে শুরু করে। পরবর্তী সময়ে অর্থনীতিবিষয়ক বিশেষায়িত সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকার উপস্থিতি বাজারে লক্ষ করা যায়। টিভি চ্যানেলগুলোও বিশেষত শেয়ারবাজারের তাৎক্ষণিক আপডেট প্রদান করার মধ্য দিয়ে এই ধারায় শামিল হয়। অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন এই প্রবণতাকে আরও গভীর ও বিস্তৃত করেছে।

ফলে নতুন যে অর্থনৈতিক বাস্তবতা বাংলাদেশে সৃষ্টি হয়েছিল, এর তাৎপর্য অনুধাবন ও প্রভাব মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চাহিদা মেটাতে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার বিকল্প ছিল না

বর্তমান

তথ্য অপ্রাচুর্যের যুগেও অর্থনীতি ও ব্যাবসাবাণিজ্য বিষয়ে সমৃদ্ধ অনুসন্ধানী ও বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদনের ঐতিহ্যের বিপরীতে হাল আমলের অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা অগভীর, সাদামাটা, নেতিবাচক ও

অতিরঞ্জিত বলে নিন্দিত। গবেষণার পর গবেষণায় দেখা যায়, সংবাদমাধ্যম অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে যথাযথভাবে তুলে ধরে না, বরং নেতিবাচক দিকগুলোকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়। যেমন: Shah et al.(1999) দেখেছেন, যখন অর্থনীতিতে সুসময় থাকে, গণমাধ্যম তখন তাতে কম মনোযোগ দেয়। কিন্তু অর্থনীতিতে মন্দাভাব দেখা গেলে গণমাধ্যম সেটাকে অনেক বেশি কাভারেজ দেয়। Haller and Norpoth (1997)-এর মতে, সাংবাদিকরা নেতিবাচক অর্থনৈতিক খবরে বেশি আসক্ত। কারণ ভালো অর্থনৈতিক সময়ের চেয়ে মন্দ অর্থনৈতিক সময়কে অধিক সংবাদযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়। গবেষণার এই ফলাফলে সংবাদমূল্য তত্ত্বকে সমর্থন করে। স্থিতিশীল অবস্থা খবর নয়, পরিবর্তন খবর। তাই অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাংবাদিকের কাছে খবর, বিশেষত নেতিবাচক পরিবর্তন। নেতিবাচক পরিবর্তনের মাত্রা ও অর্থনৈতিক সংবাদের পরিমাণের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে।

কোনো নির্দিষ্ট দিন অথবা নির্দিষ্ট সময়ে ঘটে যাওয়া পুরো ঘটনার বিবরণ তুলে ধরা সংগত কারণেই সংবাদমাধ্যমের সাধ্যাতীত। তাই প্রকাশযোগ্য খবর নির্বাচনের কাজটি অবশ্যম্ভাবী। সাংবাদিক, সম্পাদকরা ওই খবরগুলোকেই প্রকাশ-প্রচারযোগ্য বলে নির্বাচন করেন, জনগণ যেসব খবর জানতে আগ্রহী বলে তারা অনুমান করেন। প্রচলিত মত হচ্ছে: 'মানুষ ধারণার চেয়ে অন্য মানুষের ব্যাপারে বেশি আগ্রহী, বিমূর্তের চেয়ে মূর্ত বিষয়গুলো দ্রুত ধরতে পারে। কে কী বলল, তার চেয়ে কে কী করল, তাতে বেশি মনোযোগী।' (Tiffen, 1989)

এই নির্বাচিত খবরগুলোর ভিত্তিতেই জনগণ অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বাস্তবতা সম্পর্কে ধারণা নির্মাণ করে। কারণ Lippman (1965 [1922]:11)-এর ভাষায়, 'প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের পক্ষে আমাদের পরিপার্শ্ব সার্বিকভাবে অতি বৃহৎ, অতি জটিল ও অতি স্বল্পস্থায়ী।' যেসব বিষয়ে মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যত কম, সেসব বিষয় সম্পর্কে ধারণা নির্মাণে গণমাধ্যমের ওপর মানুষের নির্ভরশীলতা তত বেশি। আধুনিক জটিল অর্থনৈতিক জগতের সামান্য অংশই মানুষের সরাসরি অভিজ্ঞতায় পড়ে। অবশিষ্ট বিশাল এক জগৎ সম্পর্কে তথ্য-জ্ঞান-অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য মানুষ সংবাদমাধ্যমের সাহায্য নেয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় অর্জিত অর্থনৈতিক তথ্যের ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যম অডিয়েন্সের ওপর সামান্যই প্রভাব ফেলতে পারে; কিন্তু অবশিষ্ট বিপুল পরিমাণ অর্থনৈতিক তথ্য আহরণের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের প্রভাব ব্যাপক। Broad and Philips (1997:101) লিখেছেন: 'বেকারত্ব বা মন্দার মতো যেসব অর্থনৈতিক বিষয়ের অভিজ্ঞতা অডিয়েন্স প্রত্যক্ষ ও নাটকীয়ভাবে অর্জন করে, সেখানে গণমাধ্যম প্রভাবের সুযোগ কম...। দেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের সাধারণ অবস্থা তুলনামূলকভাবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরের বিষয়, যেখানে সম্পাদকদের সুযোগ রয়েছে ওইসব অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব সম্পর্কে অডিয়েন্সের সচেতনতা বৃদ্ধির।'

সংবাদ আমাদের জন্য এক প্রতীকী ভুবন নির্মাণ করে, যেখানে তথ্যগুলো অগ্রাধিকারের ক্রমানুসারে সাজানো থাকে। সংবাদমাধ্যম চলমান ঘটনাগুলোর মধ্যে কোনটিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত, কোনটিকে কম এর একটি বৈধ প্রমাণপত্র হাজির করে (Schudson, 1998)। বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে প্রতিদিন সহজলভ্য এই তালিকা অর্থনীতির কোন বিষয়গুলোকে এ মুহূর্তে জানা জরুরি, জনগণের মধ্যে সেই ধারণার ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। তাই কী ধরনের অর্থনৈতিক তথ্য কী পরিমাণে সংবাদমাধ্যমে স্থান পাচ্ছে, সে বিষয়টি কোনো দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে সে দেশের মানুষের জ্ঞানমাত্রা নির্ধারণের একটি প্রধান উপাদান। শুধু অর্থনীতি নয়, নানা ধরনের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত (যেমন, নির্বাচন) গ্রহণের সময়ও এই জ্ঞান ব্যবহৃত হয়।

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের অর্থনৈতিক জ্ঞানের ভান্ডার হিসাবে সংবাদমাধ্যমের এই বিপুল গুরুত্ব সত্ত্বেও নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য সঠিক পরিমাণে সরবরাহের দায়িত্ব পালনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। রাষ্ট্রপরিচালনায় প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানগুলো নিজ নিজ কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করছে কি না, প্রথাগতভাবে সংবাদমাধ্যম তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে রাষ্ট্রের 'চতুর্থ স্তম্ভ' হিসাবে কাজ করে। ক্ষমতাশালীদের বিষয়ে অনুসন্ধান করা এবং তাদের জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীল আচরণ নিশ্চিত করার প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিরাও সংবাদমাধ্যমের নজরদারিতে আসে। তাদের ভুলত্রুটি, কর্তব্যে অবহেলা এবং এর প্রভাবে জনদুর্ভোগ প্রভৃতি নেতিবাচক সংবাদে পূর্ণ হয় সংবাদ গহ্বর। নেতিবাচক তথ্যের পরিমাণ যত বাড়ে, সীমিত স্থান ও সময়ের বিবেচনায় প্রয়োজনীয় ইতিবাচক তথ্য তত বাদ পড়তে থাকে। নানা ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক চাপ সংবাদমাধ্যমকে বাধ্য করে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এলিটরা যেমনভাবে চান তেমনভাবে সংবাদ কাভার করতে। গণমাধ্যম নিজেও প্রকৃতিগতভাবে একটি ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান। ক্রমহ্রাসমান পাঠক সংখ্যা, অনিশ্চিত বিজ্ঞাপনী আয়, সদা চলমান ডেডলাইনের তাড়া এবং বিনামূল্যের অনলাইন ডেটার সহজলভ্যতা–এসব কিছুই সাংবাদিকদের এমন এক প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের দিকে ঠেলে দিয়েছে যে মানসম্পন্ন ভালো রিপোর্টের পেছনে অতিরিক্ত অর্থ, জনশক্তি ও সময় ব্যয় করার সামর্থ্য এখন অনেক প্রতিষ্ঠানেরই নেই। তাই করপোরেট উৎস থেকে পাওয়া জনসংযোগ মালমশলা, সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তি ও রিপোর্ট, সুনির্দিষ্ট কয়েকজন আর্থিক বিশেষজ্ঞের গৎবাঁধা উৎস থেকে অর্থনৈতিক তথ্যের নিয়মিত জোগানের ওপর তাদের নির্ভর করতে হয়। প্রভাবশালী বিজ্ঞাপনদাতা ও প্রভাবশালী বিশেষজ্ঞ সূত্রের ওপর অতিনির্ভরতার কারণে সংবাদমাধ্যম প্রায়ই অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে জনস্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়। ২০০৭-২০০৮ সালের বিশ্ব আর্থিক সংকটের পূর্বাভাস দিতে না পারা এর বড়ো উদাহরণ। বাংলাদেশে ২০১০-২০১১ সালের শেয়ারবাজার ধসের আগাম বার্তাদানে ব্যর্থতাও এই প্রবণতা দ্বারা ব্যাখ্যাযোগ্য। অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় নয়া উদারপন্থি প্যারাডাইমের প্রভাব এত প্রবল যে অতি সংকটজনক পরিস্থিতিতেও সাংবাদিকরা ছকবদ্ধ চিন্তার বাইরে গিয়ে ওই বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে পারেননি।

Schifferes (2011)-এর মতে, সাম্প্রতিক সময়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণের অভাবনীয় প্রাযুক্তিক অগ্রগতি এবং অর্থনৈতিক তথ্যবিশ্লেষণ-খবরের বিশ্বায়ন উদ্ভূত বিশ্বজনীন বাজারের কারণে ব্যাবসা-বাণিজ্যবিষয়ক সংবাদ কাভারেজের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটেছে। প্রথমত, টেলিভিশন চ্যানেলগুলোয় অর্থনীতিবিষয়ক অনুষ্ঠানের পরিমাণ এবং প্রধান সংবাদপত্রগুলোয় এ বিষয়ক খবরের পৃষ্ঠার সংখ্যা ও পরিধি অনেক বেড়েছে। দ্বিতীয়ত, ইন্টারনেট এবং অর্থনৈতিক তথ্যভিত্তিক বার্তা সংস্থাগুলোর কারণে সাংবাদিক ও জনগণের কাছে লভ্য অর্থনৈতিক তথ্যের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তৃতীয়ত, সাধারণভাবে লভ্য তথ্য উৎস থেকে নিজেদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে বড়ো সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্লেষণ ও মন্তব্যধর্মী প্রতিবেদনের দিকে ঝুঁকেছে। চতুর্থত, বিশ্বায়নের প্রভাবে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংবাদগুলো স্থানীয় প্রভাবের উল্লেখসহ জাতীয় প্রকাশনাগুলোয় ঠাঁই পাচ্ছে।

আপাতদৃষ্টিতে ইতিবাচক মনে হলেও উপরিউক্ত চারটি বাস্তবতা অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় কিছু উদ্‌বেগের জন্ম দিয়েছে, যে বিষয়ে সাংবাদিকদের সচেতন থাকা উচিত। আরও বেশি তথ্যের জন্য পাঠক-অডিয়েন্সের অতৃপ্ত চাহিদা সীমিতসংখ্যক সূত্রের ওপর গণমাধ্যমকে নির্ভরশীল করে তুলেছে। ফলে সূত্রগুলো কখনো কখনো নিজেদের স্বার্থ

পূরণ করতে সংবাদমাধ্যমকে ব্যবহার করার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। ধরাবাঁধা সময়সীমার মধ্যে বেশি পরিমাণ রিপোর্ট জমা দেওয়ার চাপের কারণে রিপোর্টাররা অগভীর, ফর্মুলামাফিক রিপোর্ট তৈরি করতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে রিপোর্টের পরিমাণ বেড়েছে, মান কমেছে।

Reese et al (1987) তাদের গবেষণায় ব্যাপারটিকে আরও রূঢ় ভাষায় বর্ণনা করেছেন, 'অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে–এটি সত্য উপস্থাপনে অসতর্ক; অতি সরলীকৃত ও চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী; ইস্যুর চেয়ে ব্যক্তিত্বের ওপর, প্রবণতার চেয়ে বিচ্ছিন্ন ঘটনার ওপর, দীর্ঘমেয়াদির চেয়ে স্বল্পমেয়াদি বিষয়ের ওপর এবং ভালোর চেয়ে মন্দ খবরের ওপর বেশি আলোকপাত করে।'

Loiko (2011)-এর মতে, ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক সাংবাদিকতাকে আরও গভীর ও উপযোগী করে তুলতে হলে সে লক্ষ্যে কাজ শুরু করার এখনই সঠিক সময়। কারণ বিশ্ববাজারে তেল ও স্বর্ণের মূল্যের পরিবর্তন, মুদ্রাবিনিময় হারের উত্থানপতন, আবাসন শিল্পের অবস্থা,

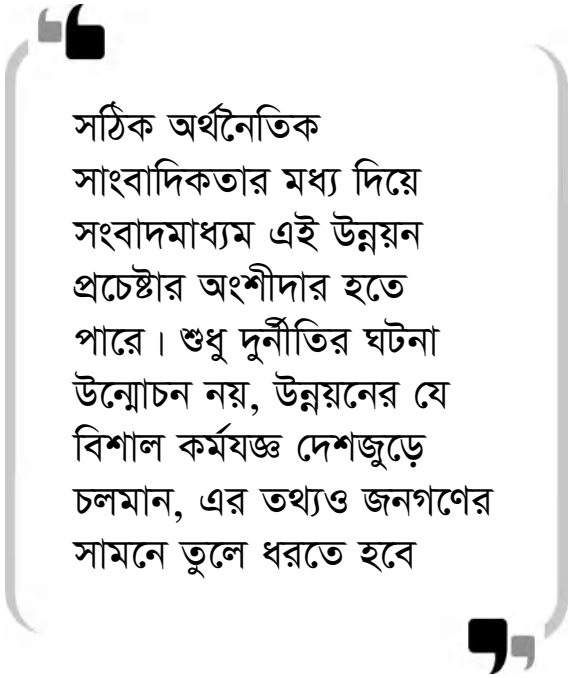

বেকারত্ব, শ্রম রপ্তানির মতো বিষয়গুলো এখন আর বিশেষজ্ঞ মহলের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়; বিভিন্ন দেশের সাধারণ মানুষের জীবনকেও প্রভাবিত করছে। নয়া প্রযুক্তির উদ্ভাবনের ফলে পাঠকের চাহিদা নিরূপণ এবং তা পূরণ করার নানা উপায় সাংবাদিকদের হাতে এসেছে। বাজার অর্থনীতির পথে সদ্য যাত্রা শুরু করা এবং শুরু করতে যাওয়া দেশগুলোয় অর্থনীতির খবরে আগ্রহী পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এ কারণে অর্থনৈতিক তথ্য-পরিসংখ্যানকে সাধারণ মানুষের বোধগম্যভাবে উপস্থাপন করার কৌশল সাংবাদিকদের রপ্ত করতে হবে। এ লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি সাংবাদিকদের নিজস্ব উদ্যোগে নিজেকে সময়োপযোগী করে তোলার চেষ্টা করতে হবে। আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে মানুষ যেহেতু সরাসরি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত তাই তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যের জোগান দিতে পারাটা সংবাদমাধ্যমের বাণিজ্যিক স্বার্থেরও অনুকূল। অধিক দর্শক, অধিক পাঠক মানেই অধিক বিজ্ঞাপনপ্রাপ্তির সম্ভাবনা।

অর্থনৈতিক সংবাদ সঠিকভাবে পরিবেশনায় সাংবাদিক, সংবাদমাধ্যমের পেশাগত দক্ষতার ওপর পরিপূর্ণ আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠাই এখন একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এজন্য প্রয়োজন নেতিবাচকতার ওপর অতি গুরুত্বারোপের বিপরীতে ইতিবাচক অর্থনৈতিক খবরগুলোকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা। বিশেষ করে উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর ক্ষেত্রে এ বিষয়টি অতি জরুরি। আমাদের দেশ ২০২৬ সাল নাগাদ স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের সারিতে পৌঁছে যাচ্ছে। সঠিক অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার মধ্য দিয়ে সংবাদমাধ্যম এই উন্নয়ন প্রচেষ্টার অংশীদার হতে পারে। শুধু দুর্নীতির ঘটনা উন্মোচন নয়, উন্নয়নের যে বিশাল কর্মযজ্ঞ দেশজুড়ে চলমান, এর তথ্যও জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে। এ মুহূর্তে জনগণের অর্থনৈতিক করণীয় কী কী, এর পাশাপাশি উন্নয়নের কী কী সুফল তারা পাবে, সেটা উল্লেখ করাও জরুরি। আমরা যদি একটি উন্নততর, আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতি চাই, তাহলে আমাদের নতুন ধরনের অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার কথা ভাবতে হবে, যে সাংবাদিকতা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কেবল প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করাবে না, এগুলোকে আরও উন্নত করার উপায় এবং সেক্ষেত্রে জনগণ কীভাবে সহায়তা করতে পারে, সেই পথেরও নির্দেশনা দেবে।

তথ্যসূত্র

* Blood, DJ, and Philips, PCB (1997) 'Economic headline news on the agenda: New approaches to understanding causes and effects' In M. Mc Combs, DL Shaw, & D Weaver (Eds), Communication and Democracy: Exploring the Intellectual Frontiers in Agenda Setting Theory (pp.97-113). London: Lawrence Erlbaum Associates.
* Haller, HB and Norpoth, H (1997) Reality Bites: News Exposure and Economic Opinion, Public Opinion Quarterly, 61(4), 555-575.
* Kariithi, N. (2003) 'Business and Economic Journalism', In Encyclopedia of International Media and Communications, Volume1, 153-161, San Francisco: Academic Press.
* Lippmann, W. (1965) Public Opinion, New York, NY: Free Press.
* Loiko, O (2011) Business Journalism for the Reader: An Inquiry into New Media and Business Reporting, Reuters Institute Fellowship Paper, University of Oxford.
* Reese, SD, Daly, JA, and Hardy, AP (1987) Economic News on Network Television, Journalism Quarterly, 64(1), 137–144.
* Roush, C (2004) Show Me the Money: Writing Business and Economic News for Mass Communication. London: Lawrence Erlbaum Associates.
* Schifferes, S (2011). 'The future of financial journalism in the age of austerity', Inaugural Lecture, 17 February. London: City University. Downloaded from: http://www.scribd.com/doc/49084191/The?Future?of?Financial?Journalism?in?the?Age?of? Austerity
* Schudson, M. (1998) 'Creating public knowledge' In E Dennis and R Snyder (Eds.) Media and Democracy (pp.29-34). New Brunswick, NJ: Transaction.
* Shah, DV, Watts, MD, Domke, D, Fan, DP and Fibison, M (1999) 'News Coverage, Economic Cues, and the Public's Presidential Performanece, 1984-1996, Journal of Politics, 61, 914-948.
* Tiffen, R. (1989) News and Power, Allen & Unwin, Sydney.

লেখক: অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বাণিজ্য সাংবাদিকতা: কোথায় আছি, কোথায় যাব

শওকত হোসেন

২

০০১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ফরচুন ম্যাগাজিন এনরনকে 'মোস্ট ইনোভেটিভ কোম্পানি অব আমেরিকা' বলে ঘোষণা দিয়েছিল। একই সঙ্গে 'মোস্ট এডমায়ারড কোম্পানি'-এর তালিকায় এনরন ছিল ১৮তম স্থানে। কিন্তু ফরচুনেরই রিপোর্টার বেথানি ম্যাকলিনের মনে হলো কোথাও একটা ঝামেলা আছে। অনুসন্ধান শুরু করলেন। এনরনের কোম্পানি অ্যাকাউন্ট পরীক্ষা করলেন। সবকিছু ভালোভাবে পড়েও ম্যাকলিন বুঝতেই পারলেন না, এনরন কোম্পানিটির এত বেশি আয়ের উৎস কী? কেবল বুঝলেন যে শেয়ারের দর বৃদ্ধির সঙ্গে কোম্পানির আর্থিক সূচকগুলো মিলছে না। সেই ফরচুনেই পরের মাস মার্চে এনরন নিয়ে অনুসন্ধানী রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সে বছরেই দেউলিয়া হয়ে গেল এনরন। ইঙ্গিত বা সূত্র কিন্তু এনরনের স্থিতিপত্র বা ব্যালেন্স শিটেই ছিল। অর্থাৎ তারা কীভাবে অর্থ বানাচ্ছে–এই উত্তরটা সেখানে ছিল না বলেই সন্দেহ হয় সেই রিপোর্টারের।

সুতরাং, বাণিজ্য সাংবাদিকতার মূল কথাই হলো–অর্থ কোথায় যাচ্ছে। অর্থাৎ, 'ফলো দ্য মানি'।

সারা বিশ্বেই বাণিজ্য সাংবাদিকতা এখন অন্য মাত্রা পেয়েছে। অনেকেই হয়তো বলেন অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা কঠিন, বুঝতে পারা সহজ নয়। তাই আগ্রহ পান না, অথবা কম আগ্রহ। কিন্তু যিনি এটা বলেন তাকেও প্রতিনিয়ত নানা অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আয়ের ভালো ব্যবস্থাপনা করতে হয়। কেনাকাটায় পছন্দ নির্ধারণ করতে হয়। জীবনযাপনকে আরেকটু স্বস্তি দিতে পরিকল্পিত হতে হয়। চালের দাম এক টাকা বাড়লে চিন্তিত হতে হয়, জ্বালানি তেলের দাম বাড়লে নতুন করে হিসাব কষতে হয়। কেউ হয়তো বলবেন, এসব কোনোটা নিয়েই তিনি ভাবেন না। আয় তার পর্যাপ্ত, সামান্য দাম বাড়া-কমায় তেমন কোনো প্রভাব তার অর্থনৈতিক জীবনে পড়বে না।

তাহলে ধরুন, আপনার ইচ্ছে হয়েছে একটা কোমল পানীয় খাবেন। আপনি দোকানে গেলেন। তারপরে পেপসি কিনে বাসায় চলে এলেন। আপনি কেন কোকাকোলা কিনলেন না? পেপসি-কোকাকোলা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। বাজার দখল করার জন্য যুগ যুগ তারা প্রতিযোগিতা করে আসছে। কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ খরচ করে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। কিন্তু আপনি কিনলেন পেপসি। কোকাকোলা ব্যর্থ হলো আপনার কাছে। এর অর্থ–তাদের বাজারজাত পরিকল্পনায় হয়তো ঘাটতি

আছে। আপনার কর্মকাণ্ড কিন্তু অর্থনীতিরই অংশ। সুতরাং আপনার একটা সিদ্ধান্ত অনেক কিছুর ওপরেই প্রভাব ফেলছে।

বাণিজ্য সংবাদের ইতিহাস

বাণিজ্য সংবাদের শুরুটা কিন্তু পাঠককে মাথায় রেখে হয়নি। মূলত বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী পরিবারগুলো নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য বাণিজ্যবিষয়ক তথ্য আদানপ্রদান শুরু করেছিলেন। আরেকটি লক্ষ্য ছিল পণ্য আমদানি-রপ্তানির চিত্রটি জানা।

সংক্ষেপে বাণিজ্য সংবাদের ইতিহাসটা এ রকম

১৫৫৮ সাল: ফুগার পরিবার প্রথম নিউজলেটার প্রকাশ করে। জার্মানির এই পরিবার একসময় পুরো ইউরোপের অর্থনীতির অধিকাংশই নিয়ন্ত্রণ করত। তারাই তাদের গ্রাহকদের জন্য নিউজলেটার বের করেছিলেন। একেই বলা হয় প্রথম বাণিজ্য সাংবাদিকতার শুরু।

১৭০০ সাল: ব্রিটিশ নিউজপেপার প্রথম পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা শুরু করে। একই সময় ইংল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশগুলো জাহাজ আসা-যাওয়ার তথ্য প্রকাশ করা শুরু করে।

১৭৫০ সাল: পত্রিকাগুলো প্রথম পণ্যের মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা শুরু করে।

১৭৯৩ সাল: কৃষকদের নানা তথ্য নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম প্রকাশ পায় হাম্পডেন জার্নাল, এটাকেই বলা হয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম বিজনেস পত্রিকা।

১৮৩৫ সাল: দ্য নিউইয়র্ক হেরাল্ড প্রথম তাদের পত্রিকায় মানি পেজ নামে একটি পাতা বের করে। এটাই হচ্ছে কোনো দৈনিক পত্রিকার প্রথম বাণিজ্য পাতা।

১৮৪৩ সাল: স্কটিশ টুপি প্রস্তুতকারক জেমস উইলসন ইংল্যান্ডে প্রথম দি ইকোনমিস্ট পত্রিকা প্রকাশ করেন।

১৮৪৯: জুলিয়াস রয়টার রয়টার্স বিজনেস নিউজ সার্ভিস শুরু করেন।

১৮৭৬: আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল টেলিফোন আবিষ্কার করেন, যা নিউজ প্রচারে ব্যাপক সহায়তা করে।

১৮৮২ সাল: চার্লস ডাউ, এডওয়ার্ড জোনস এবং চার্লস বার্গস্ট্রেস প্রথম ওয়ার সার্ভিস শুরু করেন, যার সাহায্যে ওয়ালস্ট্রিটের বিনিয়োগকারীরা তথ্য পেতে শুরু করে।

১৮৮৯ সাল: দ্য ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল-এর আত্মপ্রকাশ।

১৯০২ সাল: ইদা তারবেলস প্রথম স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানির একচেটিয়া কর্মকাণ্ড নিয়ে ম্যাকক্লারস ম্যাগাজিনে সিরিজ রিপোর্ট প্রকাশ করেন।

১৯১৫: দ্য ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদ সম্মেলন করা শুরু করে।

১৯২৭ সাল: ফোর্বস ম্যাগাজিন প্রকাশ।

১৯২৯ সাল: স্টক মার্কেটের পতন অর্থনীতিকে মন্দার দিকে নিয়ে যায়। দ্য গ্রেট ক্রাশ নামে কেনেথ গলব্রথের একটা বই আছে। সেখানে তিনি লিখেছেন, '১৯২৯ সালে যখন বাজারের পতন হয়, তখনকার সাংবাদিকরা ছিলেন মাতাল ও অদক্ষ।' (রিপোর্টার্স এট দ্য টাইম অব দ্য ১৯২৯ মার্কেট ডাইভ ওয়্যার ড্রাঙ্কস অ্যান্ড ইনকমপিটেন্স?

১৯৩৩ সাল: বিনিয়োগকারীদের স্বার্থরক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র প্রথম সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন গঠন করে।

১৯৪১ সাল: বার্নে কিলগোর মাত্র ৩২ বছর বয়সে ওয়ালস্ট্রিট জার্নালের দায়িত্ব নেন। এরপর থেকেই পত্রিকাটির জয়যাত্রা শুরু। বার্নে কিলগোরকেই আধুনিক বিজনেস জার্নালিজমের জনক বলা হয়।

১৯৫১ সাল: সিবিএস টেলিভিশন প্রথম বিজনেস শো শুরু করে।

১৯৫২ সাল: ধূমপান যে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, তা বলা শুরু হয় এ বছর রিডার্স ডাইজেস্ট বিশেষ প্রতিবেদন ছাপা হওয়ার পরে। এর আগে সিগারেটকে স্বাস্থ্যের জন্য ভালো মনে করা হতো।

১৯৫৫ সাল: ফরচুন ম্যাগাজিন প্রথম সেরা ৫০০ কোম্পানির তালিকা তৈরি করে। প্রথম তালিকায় জেনারেল মোটরস ছিল শীর্ষে।

১৯৬০ সাল: সিলভিয়া পোর্টার, প্রথম বিজনেস জার্নালিস্ট, তাকে নিয়ে প্রচ্ছদ করে টাইম ম্যাগাজিন। ১৯৩৫ সাল থেকে তিনি নিউইয়র্ক পোস্টে পারসোনাল ফিন্যান্স নিয়ে প্রথম কলাম লেখা শুরু করেন। তিনি এর মাধ্যমে বিজনেস রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারা তৈরি করেন। পরে তিনি প্রেসিডেন্ট জনসনের উপদেষ্টাও হয়েছিলেন।

১৯৬৭ সাল: প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করা শুরু করে, যা শেয়ারবাজার নিয়ে বিজনেস রিপোর্টের ধারা পালটে দেয়।

১৯৬৮ সাল: সিবিএস প্রথম ৬০ মিনিটের বিজনেস শো শুরু করে।

১৯৯০ সাল: মাইকেল ব্লুমবার্গ প্রতিষ্ঠা করেন ব্লুমবার্গ বিজনেস নিউজ। বলা হয়, তারাই প্রথম সর্বাত্মকভাবে অ্যাগ্রেসিভ বিজনেস রিপোর্টিং শুরু করে। এরপরই অন্যরাও বিজনেস নিউজ বাড়িয়ে দেয়।

২০০১ সাল: ফরচুন এনরন নিয়ে প্রথম অনুসন্ধানী রিপোর্ট প্রকাশ করে, যা থেকে বিজনেস রিপোর্টকে নতুন করে শিক্ষা নিতে হয়।

আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও বাণিজ্য সাংবাদিকতা

বাণিজ্য সাংবাদিকতা করতে দেশ-বিদেশের অর্থনীতি নিয়ে ভালো ধারণা থাকতে হবে। আমরা সবচেয়ে গুরুত্ব দেব স্থানীয় সংবাদকেই। আর একটি আন্তর্জাতিক সংবাদকে যখনই স্থানীয় প্রেক্ষিত দেওয়া যাবে, সেটাই হবে সবচেয়ে ভালো কাজ।

খুব সহজ কথায়– কীভাবে একটি দেশের উৎপাদিত পণ্য আরেক দেশ কিনে নেবে এবং এর মূল্য পরিশোধের জন্য কীভাবে একটি দেশের মুদ্রা আরেক দেশের সঙ্গে বিনিময় হবে, সেটাই হচ্ছে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। মূলত বিশ্ব অর্থনীতির দুটি দিকের দিকেই নজর রাখতে হয় বাণিজ্য সাংবাদিককে। একটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যব্যবস্থা, আরেকটি আন্তর্জাতিক অর্থায়নব্যবস্থা। অর্থাৎ কীভাবে বাণিজ্যব্যবস্থা পরিচালিত হবে এবং কীভাবে এর অর্থ পরিশোধ হবে। অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে অর্থায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অর্থাৎ অর্থ কোথা থেকে আসবে এবং কোথায় যাবে।

বাণিজ্যব্যবস্থায় যেহেতু আমদানি-রপ্তানি রয়েছে, তেমনই আছে বাণিজ্য ঘাটতি। সবার আয় ও ব্যয় সমান নয়। অর্থ পরিশোধের জন্য বিভিন্ন উৎসের সন্ধান করতে হয়। আয় বাড়াতে বিনিয়োগ করতে হয়। ফলে আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থায় আছে ব্যাংক, স্টক মার্কেট। রয়েছে বিভিন্ন বন্ড। আর আছে বৈদেশিক বিনিময় বাজার। এভাবেই পুরো পৃথিবী একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

বাংলাদেশের রপ্তানি মানে অন্য আরেকটি দেশের আমদানি। অর্থনীতিতে তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্ব বলে একটা কথা আছে। এই 'অ্যাবসলিউট অ্যাডভানটেজ' অনুযায়ী কিছু দেশ উৎপাদন করে, অন্যরা তা কিনে নেয়। এভাবে চলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। এখানে চাহিদা ও সরবরাহ একটি বড়ো বিষয়। চাহিদার ওঠানামা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে।

এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কি ইচ্ছামতো চলবে, যে যার মতো করে করবে? এজন্য আছে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা বা ডব্লিউটিও। তারাই নিয়মকানুন ঠিক করে দেয়। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়

> তবে স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এখানে বাণিজ্য সাংবাদিকতা হয়েছে একগতিতে। এরপর পরিবর্তন এসেছে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। অর্থনীতি যত এগিয়েছে, বাংলাদেশেও সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য সাংবাদিকতার বিকাশ ঘটেছে

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হচ্ছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ। বিশেষ করে কোনো দেশ লেনদেনের ভারসাম্যহীনতায় পড়লে হস্তক্ষেপ করতে হয় আইএমএফকে। এ কারণে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হচ্ছে ডব্লিউটিও এবং আইএমএফ। বিনিময় হার আর লেনদেনের ভারসাম্যের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থায় আইএমএফই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তন আসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, যা ১৯৩৯ সালে শুরু হয়ে শেষ হয় ১৯৪৫ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণ। এরই মধ্যে ধারাবাহিক তিনটি ঘটনা ঘটে যায়।

১. মার্কিন শ্রমিক ধর্মঘট: ১৯৪৬ সালে ২৭ জানুয়ারি থেকে যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট শুরু হয়। যুদ্ধের সময় আমেরিকার অর্থনীতি ছিল চাঙা। অস্ত্র নির্মাণ ছাড়াও যানবাহনের বিশাল চাহিদা ছিল সেসময়। যুদ্ধে এগুলো কাজে লেগেছিল। ফলে যুদ্ধ উপকরণ খাতে বড়ো ধরনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। মুনাফা বাড়ে। যুদ্ধ শেষ হলে এসব পণ্যের চাহিদা কমে যায়। শুরু হয় ছাঁটাই। কমে যায় মজুরি। ধর্মঘট শুরু করে শ্রমিকরা। প্রায় ৮০ হাজার শ্রমিক এই ধর্মঘটে অংশ নিয়েছিল।

২. ব্রিটেনে শিল্প জাতীয়করণ: যুদ্ধের পরপর ব্রিটেনে সরকারের পরিবর্তন ঘটেছিল। রক্ষণশীল দলের আমলে যুদ্ধজয় পেলেও ভোটাররা ভোট দেয় লেবার পার্টিকে। কারণ, ব্রিটেনবাসীর আকাঙ্ক্ষা ছিল লেবার পার্টিই অর্থনীতিকে চাঙা করতে পারবে। আমেরিকায় শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হলে লেবার পার্টি বড়ো ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৪৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ব্যাংক অব ইংল্যান্ড জাতীয়করণ করা হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে কয়লা, ইস্পাত, রেল পরিবহণ, হাসপাতাল–এগুলো জাতীয়করণ করা হয়।

৩. মার্শাল প্ল্যান: এটি হচ্ছে ইউরোপ পুনর্গঠনের পরিকল্পনা। সেসময়ে মার্কিন সেক্রেটারি অব স্টেট ছিলেন জর্জ মার্শাল। মূলত তারই নেতৃত্বে ইউরোপ পুনর্গঠনের পরিকল্পনা হয়। এরই নাম মার্শাল প্ল্যান। মূল লক্ষ্য ছিল ইউরোপের দেশগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের বলয়ে চলে না যায়। পরিষ্কারভাবে বললে বলা যায়, যুদ্ধে পরাজিত জার্মানি, ফ্রান্স ও ইতালি যেন সমাজতন্ত্রের দিকে না যায়।

৪. ব্রেটন উডস সম্মেলন: ১৯৪৪ সালের ১ জুলাই থেকে ২২ জুলাই ব্রেটন উডস শহরে জাতিসংঘ মুদ্রা ও অর্থবিষয়ক সম্মেলন হয়। সম্মেলন যোগ দেয় মিত্রশক্তির ৪৪ দেশের প্রতিনিধিরা। মূলত যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক আর্থিক রূপরেখা ঠিক করতেই এই সম্মেলন। সেই সম্মেলনে দুটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যেমন, আইএমএফ এবং পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠা। এর জনক দুজন। ব্রিটেনের স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ জন মেনার্ড কেইনস এবং যুক্তরাষ্ট্রের হ্যারি ডেক্সটার হোয়াইট।

মূলত এই চারটি ঘটনা পুরো বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পালটে দেয়, তেমনি পালটে দেয় বাণিজ্য সাংবাদিকতাকেও। ব্রেটন উডস ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল একটি স্থিতিশীল বিনিময় হার ব্যবস্থার প্রবর্তন, বৈদেশিক বিনিময়ে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার অবসান, সব দেশের মুদ্রার রূপান্তর যোগ্যতার প্রবর্তন এবং অবমূল্যায়ন প্রতিযোগিতার অবসান। এর দায়িত্ব ছিল আইএমএফ-এর। লেনদেনের ভারসাম্যে সমস্যায় পড়লেই মূলত অবমূল্যায়ন করে থাকে একটি দেশ। তাহলে ভারসাম্যহীনতায় দেশগুলো কী করবে? আইএমএফ তখন ঋণ দিয়ে সহায়তা করে।

অন্যদিকে বিশ্বব্যাংকের কাজ হচ্ছে পুনর্গঠনে সহায়তা করা। বিশ্বব্যাংকের ইতিহাসকে দুটি অধ্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম অধ্যায়ে আছে ১৯৪৪ থেকে ১৯৬৮ সাল। ১৯৬৮ সালের আগে বিশ্বব্যাংকের ঋণ ছিল কম। এ সময় তাদের আর্থিক নীতি ছিল রক্ষণশীল। ঋণ পেতে কঠিন সব শর্ত পূরণ করতে হতো।

প্রথম দেশ হিসাবে বিশ্বব্যাংকের ঋণ নিয়েছিল ফ্রান্স। ব্যাংকের প্রথম ছিলেন প্রেসিডেন্ট জন ম্যাককুয়। সেসময়ে ফ্রান্স ছাড়াও ঋণের আবেদন করেছিল পোল্যান্ড ও চিলি। কিন্তু প্রথম দেওয়া হয় ফ্রান্সকে। তাও আবার আবেদন করা ২৫০ মিলিয়ন ডলারের অর্ধেক। ঋণ দেওয়া হয় কঠিন শর্তে। এজন্য ফ্রান্সকে বাজেটের ব্যাপক কাটছাঁট করতে হয়। এছাড়া ঋণ অনুমোদনের আগে যুক্তরাষ্ট্র সরকারে যেসব কমিউনিস্ট সদস্য রয়েছে তাদের বিদায় করার শর্ত দিয়েছিল ফ্রান্সকে। ফরাসি সরকার তাদের কোয়ালিশন সহযোগী কমিউনিস্ট পার্টি অব ফ্রান্সের সব সদস্যকে সরকার থেকে বাদ দেওয়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফ্রান্সের ঋণ অনুমোদন করা হয়।

১৯৬৮ সালের পর থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ঋণ দেওয়া শুরু হয়। এ পরিবর্তনটি হয়েছিল সেসময়ের বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারার সময়ে। তখন থেকে অবকাঠামো ছাড়াও স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ সামাজিক খাতে ঋণ দেওয়া শুরু হয়। ম্যাকনামারা চলে যাওয়ার পর বিশ্বব্যাংক মনোযোগ দেয় কাঠামোগত সংস্কারের ওপরে। এ নিয়ে সমালোচনাই বেশি। শর্ত পূরণের সংস্কার অনেক ক্ষেত্রেই কাজ করেনি। নব্বইয়ের দশকের পর বিশ্বব্যাংক দারিদ্র্যবিমোচন নীতির প্রতি বেশি জোর দেওয়া শুরু করে। এখন যুক্ত হয়েছে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি। ঐতিহ্যগতভাবে আইএমএফ-এর প্রধান নির্বাচিত হন ইউরোপীয় দেশগুলো থেকে আর বিশ্বব্যাংকের প্রধান নির্বাচিত হন যুক্তরাষ্ট্র থেকে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা: বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর পাশাপাশি আরও একটি সংস্থা তৈরির আলোচনা হয়। মূলত বাণিজ্য উদারীকরণ ও বাড়ানো ছিল এর লক্ষ্য। এরপর জাতিসংঘের একটি বিশেষ সংস্থা তৈরি হয়। নাম ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা বা আইটিও। কিন্তু শেষপর্যন্ত আইটিও যুক্তরাষ্ট্রের অনুমোদন পায়নি। ফলে কার্যকর হয়নি আইটিও।

১৯৪৭ সালেই জেনেভায় বাণিজ্য উদারীকরণের বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিল ২৩টি দেশ। তারা একটি চুক্তিও করে। এর নাম দেওয়া হয় জেনারেল অ্যাগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফস অ্যান্ড ট্রেড বা গ্যাট। একই বছরের নভেম্বরে হাভানায় ৫৬টি দেশ এর আওতায় আইটিও-এর রূপরেখা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিল। ১৯৪৮ সালের ১ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিক রূপ পায় গ্যাট। কিন্তু মার্চেই মার্কিন কংগ্রেস আইটিও নাকচ করে দিলেও টিকে থাকে গ্যাট। এর পরে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত একের পর এক আলোচনা চলেছে। ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত সাত রাউন্ড আলোচনার পর উরুগুয়েতে শুরু হয় মন্ত্রী পর্যায়ের মূল আলোচনা। ১৯৮৬ থেকে শুরু, ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত তা চলে। ১৯৯৪ সালে শেষ আলোচনাটি হয় মরক্কোর মারাকাসে। সেখানে চূড়ান্ত আলোচনা শেষে জন্ম নেয় ডব্লিউটিও-এর। আর ১৯৯৫ সালে জেনেভায় কাজ শুরু করে সংস্থাটি।

বাংলাদেশে বাণিজ্য সাংবাদিকতা

বাংলাদেশের বাণিজ্য সাংবাদিকতার ইতিহাস এতটা সমৃদ্ধ বা পুরোনো না। যদিও বাংলাদেশ স্বাধীনতার পেছনে অর্থনীতি একটি বড়ো বিষয় ছিল। দুই পাকিস্তান নিয়ে তত্ত্ব দিয়েছিলেন বাঙালি অর্থনীতিবিদরাই, আর তা প্রচার ও প্রকাশ পেয়েছিল গণমাধ্যমের হাত দিয়েই। তবে স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এখানে বাণিজ্য সাংবাদিকতা হয়েছে একগতিতে। এরপর পরিবর্তন এসেছে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। অর্থনীতি যত এগিয়েছে, বাংলাদেশেও সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য সাংবাদিকতার বিকাশ ঘটেছে।

সত্তরের দশকে বাণিজ্য সাংবাদিকতা ছিল অনেকটাই পাটকেন্দ্রিক। এটা খুবই স্বাভাবিক, কারণ সেসময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি ছিল পাটকেন্দ্রিক। রপ্তানি আয়ের বড়ো উৎসই ছিল পাট। তাছাড়া ১৯৭৫ পর্যন্ত অর্থনীতিতে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ তেমন ছিল না। ১৯৭৫ সালের পর অর্থনীতিতে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে। সরকার রাষ্ট্রীয়করণ থেকে সরে আসতে থাকে। শিল্প-কলকারখানা বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়া শুরু হয়। আশির দশকে এসে ব্যাংক বেসরকারি খাতে দেওয়া শুরু হয়। আশির দশকের শেষের দিকে এসে নেওয়া হয় নানা ধরনের অর্থনৈতিক সংস্কার কার্যক্রম। দৃশ্যপট পালটে যায় নব্বইয়ের পরে। বাজারকেন্দ্রিক অর্থনীতির ওপর গুরুত্ব দেয় সরকার। বাণিজ্য সাংবাদিকতারও গুরুত্ব বাড়ে এ সময় থেকে।

বাণিজ্য সাংবাদিকতা: কী লাগবে, কী লাগবে না

যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যানলি জনসন ও জুলিয়ান হ্যারিস কমপ্লিট রিপোর্টার নামে একটি বই লিখেছিলেন। সেখানে সাংবাদিকদের গুণাবলি নিয়ে বলেছিলেন, 'সাংবাদিক ঘটনাকে দেখেন খুব কাছ থেকে, প্রায়ই ঘটনার ভেতর থেকে। বাস্তবের আঁচে যাতে চোখ ঝলসে যায়, চামড়ায় ফোসকা না পড়ে, এর জন্য কোম্পানি কিন্তু কালো চশমা বা দমকলের পোশাক দেয় না। আঘাত যে রকমই হোক, তাকে সহ্য করার ক্ষমতা একজন সংবাদ প্রতিবেদকের প্রাথমিক গুণ।'

একটি অর্থনৈতিক ঘটনাকে সংবাদ হিসাবে খুঁজে বের করা, এর ক্ষতিকর বা লাভজনক দিকগুলোকে বোঝার চেষ্টা করা, সেই ঘটনাকে নিজস্ব বিচিত্র অভিজ্ঞতা দিয়ে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা, এর তাত্ত্বিক ও মানবিক চরিত্র বোঝার চেষ্টা করা, মানুষের সঙ্গে মিশতে পারা–এ বিষয়গুলো অবশ্যই থাকতে হবে।

তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে কী থাকবে না?–'বাণিজ্য সাংবাদিকতা তার কাছে কামনা করে, তিনি পেশার মর্যাদা ঊর্ধ্বে তুলে ধরবেন, নিজের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য পেশার ওপর নির্ভর করবেন না।'

গত ২৫-৩০ বছরে বাণিজ্য সাংবাদিকতায় নাটকীয় পরিবর্তন এসেছে। আসলে তিনটি ঘটনা বাণিজ্য সাংবাদিকতাকে পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এর একটি হলো–ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান। এতে কে বড়ো বা ভালো, সেই আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়। বরং এরপর থেকে পুঁজি ব্যবস্থাপনার আলোচনা শুরু হয়ে যায়। সামনে চলে আসে পুঁজি ব্যবহারে দক্ষতার বিষয়টি।

দ্বিতীয়ত, এরপর বিশ্বজুড়ে আর্থিক সম্পদ বা ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটের যে বিস্তার ঘটতে থাকে, শুরু হয় নানা ধরনের আর্থিক সংস্কার। অনেক নিয়মনীতি উদার করা হয়। বিশ্বায়নের প্রভাবে এ খাতে বিপুল পরিমাণ প্রবৃদ্ধিও দেখা দেয়। সুতরাং মানুষ অনেক বেশি জানতে চাওয়া শুরু করে যে, একটি কোম্পানি কীভাবে চলে, অর্থ কোথায় যায়, অর্থ কীভাবে কাজ করে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা কী প্রভৃতি। তৃতীয়ত, এতকিছুর মধ্যেও দেখা যেতে শুরু করল অর্থনীতি সব সময় একভাবে চলছে না। নানা ধরনের সংকট, বাধা, মন্দা, উত্থান-পতন এসব দেখা দিল। আর এসব ঘটনা সমাজে; রাজনীতিতে, দেশে-দেশে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরি করল। মানুষের মধ্যে এসব বিষয়ে নানা ধরনের সংবাদের চাহিদা তৈরি করল। যেমন: ১৯৮৭ সালের শেয়ারবাজার ধস, ইউরোপে নব্বইয়ের দশকে দেখা দিল বিনিময় হারে সংকট, ১৯৯৭ সালে দেখা দিল পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক সংকট, ২০০০ সালের ডটকম বাবল এবং ২০০৮ সালে শুরু হওয়া বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা।

এর মধ্যে ২০০৮ সালের মন্দার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। অভিযোগ হচ্ছে– এরকম একটা মন্দা আসছে, তা তেমন কারওরই পূর্বাভাস ছিল না। শেষ ৭৫ বছরের মধ্যে এটাই ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো অর্থনৈতিক সংকট। সাংবাদিকরাও আগে থেকে এ নিয়ে কিছু লিখতে পারেননি। বাণিজ্য সাংবাদিকরা সেসময় অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বুঝতে ব্যর্থ ছিলেন।

আবার এক সংকটের মধ্যে পুরো বিশ্ব। এমনিতেই ২০১৮-১৯ সময় থেকেই একধরনের অর্থনৈতিক সংকটের আশঙ্কা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংকটটা এসেছে করোনার হাত ধরে। এ সময়টাকে অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের স্বর্ণসময় বলে ধরতে হবে। বর্তমান সংকটে বিজনেস জার্নালিস্টদের জন্য সব উপাদানই আছে, যা তারা চান। সরকারের বিপুল পরিমাণ ব্যয়, বিগ করপোরেশন, কোম্পানির টিকে থাকা, চাকরি, ঘটনার বিশ্লেষণ, সরকারকে দায়বদ্ধ রাখা এবং সবার ওপরে আছে মানুষ।

এক একটি বড়ো সংকট আসে, আর বাণিজ্য সাংবাদিকতার ধরন পালটে যায়, এর গুরুত্ব বাড়ে, বাণিজ্য সংবাদের চাহিদা বাড়ে, মানুষের নির্ভরতাও বাড়ে। এই সুযোগ কতটা নিতে পারবেন বাংলাদেশের বাণিজ্য সাংবাদিকরা?

বাণিজ্য সাংবাদিকদের জন্য ১০টি টিপস

১. জারগন বা বিশিষ্টার্থক শব্দ ব্যবহার থেকে দূরে থাকা বা পরিহার করা। পরিভাষা বা টেকনিক্যাল টার্মের অর্থ বলা এবং এর সঙ্গে সম্পর্কটা জানানো।

২. সংখ্যা সর্বদাই নিরপেক্ষ, সংখ্যা নিয়ে অনুভূতিশূন্য না হওয়া। সংখ্যাকে লেখার বিষয়বস্তুর মধ্যে নিয়ে আসা। সংখ্যার পেছনের মুখগুলো তুলে আনতে হবে। সংবাদে যে পরিসংখ্যান ব্যবহার করছি তা কেন? রিপোর্টের সঙ্গে এর কী সম্পর্ক, তা পাঠকের ওপর ছেড়ে দিলে চলবে না। রিপোর্টারকেই তা বলে দিতে হবে। সামান্য অঙ্ক করে পরিসংখ্যানটির ব্যাখ্যা ও গুরুত্ব বলতে হবে। একটা সংখ্যা নিজে নিজে তার গল্পটি বলতে পারবে না। কিন্তু তুলনা করলেই গল্পটা পালটে যাবে। কেননা সংখ্যা অনেক সময় কোনো গুরুত্ব ব্যবহার করে না। তবে একে নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ করা যায়।
আসলে বাণিজ্য সাংবাদিকদের সামনে থাকে কেবল কিছু নম্বর বা সংখ্যা। যারা সংখ্যা নিয়ে কাজ করতে পারবে না, নম্বর বুঝবে না, সংখ্যাকে নিয়ে কাজ করতে পারবে না, সংখ্যাকে সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করতে পারবে না, তাদের জন্য বাণিজ্য সাংবাদিকতা নয়।

৩. প্রশ্ন করুন বারবার, নিজের কাছেই। নিজে কি পুরো বিষয়টি বুঝেছেন। নিশ্চিত হয়ে তবেই লিখতে শুরু করুন।

৪. নিজের অভিমত নিজের কাছেই রাখুন, পাঠকদের ওপর চাপিয়ে দেবেন না।

৫. ভাষার ওপর দখল আছে তো? লেখাটা হতে হবে সব ধরনের পাঠক উপযোগী। গল্প বলাটা জানতে হবে।

৬. মানুষকে তুলে আনুন। মানুষ ছাড়া বাণিজ্য সাংবাদিকতা চলবে না। মানুষকে সম্পর্কযুক্ত করুন।

৭. সন্দেহ করুন, বিশ্লেষণী ক্ষমতা বাড়ান। জেমস ম্যাক নায়ার নামে যুক্তরাষ্ট্রের দ্য মায়ামি হেরাল্ড-এর এক নামকরা বাণিজ্য সাংবাদিক বলেছিলেন, কোনো কোম্পানি যখন জানায় যে তারা তাদের কার্যক্রম যৌক্তিক করতে চায় (র‍্যাশনালাইজেশন), তখন আমার প্রশ্ন হয়–কতজন ছাঁটাই করবেন? আবার যখন কোনো কোম্পানি বিনিয়োগ ব্যাংকারকে নিয়োগ দিয়ে বলে তারা শেয়ারধারীদের মূল্যমান জানতে চান, তখন আমি বুঝতে পারি, আসলে বিক্রি হয়ে যাবে কোম্পানি।

৮. ফোনের ওপর ভরসা না করে জায়গায় চলে যান। সোর্সের কাছে তিনবার যান। যে কোনো রিপোর্ট একাধিকবার পড়ুন। আর প্রেসরিলিজের শেষ লাইনটা সবার আগে পড়ুন।

৯. পড়ো, পড়ো এবং পড়ো। পড়া ছাড়া কোনো ক্ষেত্রেই ভালো সাংবাদিক হওয়া যাবে না।

১০. বাণিজ্য সাংবাদিকতা সাংবাদিকতারই অংশ–এটা ভুললে চলবে না। সাংবাদিকতাটাই করুন।

লেখক: হেড অব অনলাইন, প্রথম আলো

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

প্রবন্ধ

সাংবাদিকতার নয়া ক্ষেত্র ‘ব্যাবসা ও মানবাধিকার রিপোর্টিং’

মাহামুদুল হক

সারা বিশ্বেই অর্থ ও ব্যাবসাসংক্রান্ত রিপোর্টিং হরহামেশাই হয়। বাংলাদেশে অর্থ ও ব্যাবসাসংক্রান্ত পত্রিকায় আলাদা পাতাও বের হচ্ছে। এমনকি, অর্থ ও ব্যাবসাসংক্রান্ত বিশেষায়িত পত্রিকার সংখ্যাও কম নয়। টেলিভিশন চ্যানেলগুলো সংবাদ বুলেটিনে আলাদাভাবে অর্থ ও বাণিজ্যসংক্রান্ত সংবাদ প্রচার করছে। তবে বেশির ভাগ রিপোর্টই বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি। ব্যাবসার মূল কনজিউমার গোষ্ঠী বা সাধারণ জনগণ, যাদের ওপর ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, তাদের নিয়ে বা তাদের মানবাধিকার নিয়ে বা পরিবেশ-প্রতিবেশের ওপর ওইসব বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের প্রভাব নিয়ে খুব বেশি রিপোর্ট হয় না। আর যারা উৎপাদনের মূল শক্তি অর্থাৎ শ্রমিক, তাদের নিয়ে রিপোর্ট বা শ্রমিকের অধিকার নিয়ে রিপোর্ট আন্তর্জাতিক শ্রম দিবস ছাড়া খুব বেশি চোখে পড়ে না। কোনো বড়ো বিনিয়োগ হলেই ধরে নেওয়া হয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে। কিন্তু বিনিয়োগ চুক্তি কীভাবে হলো, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক কেমন হবে, বিনিয়োগের ফলে পরিবেশ-প্রতিবেশের ওপর কী প্রভাব পড়বে, মানবাধিকার লঙ্ঘিত হবে কি না বা বিনিয়োগ হওয়ার পর ব্যাবসায়িক কর্মকাণ্ডের প্রভাব কেমন পড়ছে–এসব ক্ষেত্রে রিপোর্ট তেমন হয় না বললেই চলে। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু রিপোর্ট হয়, যেগুলো ব্যাবসা ও মানবাধিকার রিপোর্টিংয়ের মধ্যে পড়ে; কিন্তু লক্ষ্যস্থির করে রিপোর্ট হয় না। হওয়ার কথাও না। কেননা ‘ব্যাবসা ও মানবাধিকার রিপোর্টিং’ ধারণাটি সাংবাদিকতার একাডেমিক ও প্রায়োগিক পরিমণ্ডলে বা প্রশিক্ষণে বাংলাদেশে তো নয়ই, বহির্বিশ্বেও তেমন শুরু হয়নি। জাতিসংঘের একটি সংস্থার ব্যাবসা ও মানবাধিকারবিষয়ক বাংলাদেশের জাতীয় পরামর্শকসহ এশিয়ার কয়েকটি অধিকারবিষয়ক সংস্থার সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আমার এই ধারণা আসে যে ‘ব্যাবসা ও মানবাধিকার রিপোর্টিং’ সাংবাদিকতার নতুন বিশেষায়িত ক্ষেত্র হতে পারে। শুধু নতুন ক্ষেত্র নয়, সাংবাদিকতার ব্যাপক ও বহুমাত্রিক বিষয় হতে পারে ‘ব্যাবসা ও মানবাধিকার রিপোর্টিং’। যদিও বিষয়টি ব্যাবসাসংক্রান্ত রিপোর্টিংয়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে; কিন্তু এসংক্রান্ত রিপোর্টিংয়ের মূল প্রায়োগিকতা দেখা যায় ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ ও কর্মকাণ্ডের ফলে। ব্যাবসায়িক কর্মকাণ্ডের আচরণে অনেক সময় মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়; কিন্তু তা ব্যাবসাসংক্রান্ত রিপোর্টিংয়ে স্থান পায় না। তাই ব্যাবসা ও মানবাধিকার রিপোর্টিং আলাদা ধারা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দাবি রাখে।

এজন্য আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যাবসা ও মানবাধিকার রিপোর্টিংয়ের ধারণায়ন দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

ব্যাবসা ও মানবাধিকার ধারণায়ন

'ব্যাবসা ও মানবাধিকার' প্রপঞ্চ দুটি সম্মিলিতভাবে একটি নতুন ধারণা, যা বর্তমানে অধিকারবিষয়ক পঠনপাঠনের আওতাভুক্ত। ব্যাবসায়িক কর্মকাণ্ড থেকে উদ্ভূত মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ (Protect), মানবাধিকার সমুন্নতকরণ ও মেনে চলা বা পালন (Respect) এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত ঘটনার প্রতিকার করাই (Remedy) ব্যাবসা ও মানবাধিকার ধারণার মূলমন্ত্র। এসংক্রান্ত ধারণা ধারণকারী আন্তর্জাতিক নীতি রয়েছে, যা 'UN Guiding Principles on Business and Human Rights' নামে পরিচিত। জাতিসংঘ ২০০৫ সালে মানবাধিকার, ট্রান্সন্যাশনাল করপোরেশন এবং অন্যান্য ব্যাবসায়িক উদ্যোগবিষয়ক সেক্রেটারি-জেনারেলের বিশেষ প্রতিনিধি নিযুক্ত করে অধ্যাপক জন রাগিকে (John Ruggie)। ছয় বছর পর ২০১১ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল সর্বসম্মতিক্রমে 'UN Guiding Principles on Business and Human Rights' অনুমোদন করে। নীতিটি তিনটি স্তম্ভের (Pillar) ওপর প্রণয়নকৃত।

ক. **প্রতিরোধ (Protect):** রাষ্ট্রের দায়িত্ব উপযুক্ত আইন, বিধি ও বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানসহ সব তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক সংঘটিত মানবাধিকারবিরোধী অন্যায় আচরণ প্রতিরোধ করা বা সুরক্ষা দেওয়া।

খ. **পালন (Respect):** ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের আইন ও নীতি মেনে চলা বা পালন করা। কর্মক্ষেত্রে মানবাধিকারের চর্চা করা অর্থাৎ ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে সব পরিশ্রমের ন্যায্য পাওনা পরিশোধ, অপরের অধিকার সংরক্ষণ ও ব্যবসায়ী কর্মকাণ্ডের প্রভাবে সৃষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘন জাতীয় অন্যায় আচরণের প্রকাশ যাতে না ঘটে, সেজন্য আইন ও নীতির বাস্তবায়ন করা। এই দায়িত্ব ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের।

গ. **প্রতিকার (Remedy):** কর্মস্থলে কার্যকর প্রতিকারের অধিকার পাওয়া। এমনকি ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হলেও ব্যাবসা পরিচালনার ফলে কর্মস্থলে সৃষ্ট মানবাধিকার পরিপন্থি আচরণের প্রভাব দেখা দিলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই প্রতিকার চাওয়ার ও পাওয়ার যথাযথ অধিকার দিতে হবে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অধীনে রাষ্ট্রগুলো তাদের অঞ্চল এবং/অথবা ব্যাবসায়িক উদ্যোগসহ তৃতীয় পক্ষের দ্বারা মানবাধিকার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দিতে বাধ্য। এমনকি রাষ্ট্র তাদের বাধ্যবাধকতা পূরণ না করলেও পুরো ব্যাবসায়িক উদ্যোগ মানবাধিকারকে সম্মান করবে বলে আশা করা হয়। এর অর্থ–অন্যের ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘন করা এড়াতে হবে। মানবাধিকারের প্রতিকূল প্রভাবগুলোকে মোকাবিলা করতে হবে। অপব্যবহারের ঘটনা ঘটলে ভুক্তভোগীদের অবশ্যই বিচার বিভাগীয় এবং নন-জুডিশিয়াল (প্রথাগত, প্রাতিষ্ঠানিক, সালিশ প্রভৃতি) অভিযোগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্যকর প্রতিকারের প্রবেশাধিকার দিতে হবে।

মানবাধিকারের ধারণা যতটা সহজ, ততটাই ব্যাপক ও শক্তিশালী। কেননা মানুষের মর্যাদার সঙ্গে বাঁচার অধিকার রয়েছে। জাতীয়তা, জাতি, ধর্ম-বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা–যাই হোক না কেন, জন্মগতভাবে ও সহজাতভাবে প্রত্যেক মানুষের জন্য মানবাধিকার উপভোগ্য। প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার আছে বৈষম্যহীনভাবে মানবাধিকার উপভোগ করার। এসব অধিকার পরস্পর সম্পর্কিত, নির্ভরশীল এবং অবিভাজ্য।

প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইন, সাধারণ নীতিমালা, আন্তর্জাতিক আইনের অন্যান্য উৎস যেমন, আন্তর্জাতিক চুক্তিতে মানবাধিকার স্বীকৃত হয় বা নিশ্চিত হয়। মানবাধিকার এবং ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষা করতে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন রাষ্ট্রগুলোর জন্য বাধ্যবাধকতা তৈরি করে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র (Universal Declaration of Human Rights) ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮ প্যারিসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের একটি সনদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নৃশংসতার পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধ করার জন্য এবং প্রত্যেক মানুষের মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্যই এই সনদ, যা আধুনিক মানবাধিকারসংক্রান্ত সব আইনের ভিত্তি। ১৯৯৩ সালে ভিয়েনায় মানবাধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ১৭১ অংশগ্রহণকারী দেশ এই সনদ বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। সর্বজনীন মানবাধিকার আরও কিছু আন্তর্জাতিক আইনের সূত্রপাত করেছে যেমন: International Covenant on Civil and Political Rights এবং the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. এই দুটি চুক্তি ও মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রকে সম্মিলিতভাবে 'International Bill of Human Rights' নামে পরিচিত।

শ্রমিকদের মানবাধিকারের ক্ষেত্রে বিশেষ আন্তর্জাতিক আইন হচ্ছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সনদ '1998 Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work', যার মাধ্যমে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র কর্মক্ষেত্রে চার ধরনের মৌলিক নীতি ও অধিকার বাস্তবায়ন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: ক. সমাবেশের স্বাধীনতা এবং সমষ্টিগত দরকষাকষির অধিকার; খ. বাধ্যতামূলক শ্রম নির্মূল; গ. শিশুশ্রম বিলোপ এবং ঘ. কর্মসংস্থান ও পেশাগত অবস্থায় বৈষম্য দূরীকরণ। এগুলো আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) আটটি মূল কনভেনশনের আওতায় পড়ে। এসবই ব্যাবসা ও মানবাধিকারসংক্রান্ত মূলনীতির আন্তর্জাতিক আইন হিসাবে স্বীকৃত রেফারেন্স।

১. ব্যাবসা ও মানবাধিকারের আন্তঃসম্পর্ক

এখন প্রশ্ন হচ্ছে–আন্তর্জাতিক আইনগুলো ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য মানতে বাধ্য কি না। আন্তর্জাতিক আইনগুলো ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের সরাসরি মানতে বাধ্যবাধকতা নেই। কেননা দেশীয় আইনে এসব আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার বিষয় রয়েছে (UN, 2012)। সুতরাং ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানকে সরাসরি মানতে হচ্ছে দেশের আইন।

যাই হোক, ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান বা ব্যাবসায়িক উদ্যোগের ক্রিয়াকলাপ, অন্যান্য অ-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা উদ্যোগের ক্রিয়াকলাপের মতোই যা মানবাধিকারকে ইতিবাচক বা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মী, গ্রাহক, সরবরাহকারীর মানবাধিকারকে প্রভাবিত করতে পারে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, জাতীয় আইনের বিধান এবং চুক্তিতে মানবাধিকারের আবশ্যকীয়তা থাকা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তির ফসল। সরবরাহ চেইন, জনগণ বা সম্প্রদায় ব্যাবসায়িক কর্মকাণ্ডের চারপাশে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, অভিজ্ঞতা বলে যে উদ্যোগগুলো মানবাধিকার লঙ্ঘন করতে পারে, যেখানে তারা এই ঝুঁকি কীভাবে হ্রাস করা যায়, সেদিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছে না।

আন্তঃদেশীয় ব্যাবসায়িক লেনদেন, ব্যাবসার পরিমাণ, ব্যাবসার পরিসর বৃদ্ধি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী আচরণ বেড়ে যাওয়ায় উত্তেজনা নিরসনের উপায়ের অংশ হিসাবে 'ব্যাবসা ও

মানবাধিকারসংক্রান্ত জাতিসংঘ নির্দেশিত নীতি' (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) প্রণয়ন করা হয়েছে। 'বিশ্বব্যাপী তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ আহরণ কোম্পানিগুলোর কার্যক্রম ১৯৯০ সালে স্পর্শকাতর অঞ্চলে সম্প্রসারণ করার পাশাপাশি পোশাক ও পাদুকাশিল্পে নিম্নমানের কর্মপরিবেশের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়ায় ব্যবসায়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঝুঁকির বিষয়টি প্রকট হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। কোম্পানিগুলোর আন্তঃদেশীয় সম্পর্কের নিয়মাবলি ও বিধিমালার অভাব; আন্তর্জাতিক শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা এবং বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর ব্যাবসায়িক আচরণবিষয়ক প্রবিধান না থাকা বা বিদ্যমান বিধিমালা শক্তিশালীকরণের কার্যক্রম নিষ্ক্রিয়তার কারণগুলোর জন্য সৃষ্ট এ চরম উত্তেজনা প্রশমন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল (Koster, nd)।'

২. ব্যাবসা ও মানবাধিকার রিপোর্টিং সংজ্ঞায়ন

'ব্যাবসা ও মানবাধিকার রিপোর্টিং' এক ধরনের বিশেষায়িত রিপোর্টিং প্রক্রিয়া। ব্যাবসা ও বাণিজ্যে এবং এ সংক্রান্ত উদ্যোগ বা কর্মকাণ্ডের ফলে উদ্ভূত মানবাধিকারসংক্রান্ত ঘটনায় সাংবাদিকতার লেন্স প্রয়োগ করে রিপোর্টিং করার প্রক্রিয়া হচ্ছে 'ব্যাবসা ও মানবাধিকার রিপোর্টিং'। অর্থাৎ, ব্যাবসায়িক কর্মকাণ্ড থেকে উদ্ভূত মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত ঘটনার ওপর গণমাধ্যমের জন্য সংবাদ প্রস্তুতপ্রণালিই হচ্ছে 'ব্যাবসা ও মানবাধিকার রিপোর্টিং'।

৪. ব্যাবসা ও মানবাধিকার রিপোর্টিংয়ের বিষয়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্যক্তির অধিকার ১৯৪৮ সালের জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা দ্বারা স্বীকৃত হয়। দীর্ঘ বিরতিকালে এই অবস্থা থেকে এখন পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে যে কোনো সরকারের চেয়ে বিনিয়োগ এবং চ্যালেঞ্জ সবকিছুই বিশ্বের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের দিকেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮০ ও নব্বইয়ের দশকে বহুজাতিক কোম্পানির পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বেসরকারীকরণ হতে থাকে। এটা পরিমাপ করা হয়ে থাকে যে বিশ্বের সরকারি-বেসরকারি ধনী প্রতিষ্ঠানগুলোর দুই-তৃতীয়াংশই বহুজাতিক কোম্পানি। তেল কোম্পানিগুলো এশিয়ার অনেক দেশের চেয়ে সম্পদশালী। ওয়ালমার্ট ও ম্যাকডোনাল বিশ্বের পাঁচটি কোম্পানির মধ্যে দুটি। অ্যাপলের উপার্জন অনেক বড়ো দেশের চেয়েও বেশি। বিশ্বায়নের যুগে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর মানবাধিকারের ক্ষেত্রে অনেক আশঙ্কা প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাও সংবাদ শিরোনাম হচ্ছে। বহুজাতিক ও স্থানীয় ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের ফলে জল-জমি-জলাভূমি দখল হয়ে যাচ্ছে। পরিবেশ বিপর্যয় ঘটছে। মানুষের জীবন-জীবিকার পরিবর্তন ঘটছে। ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী তার জমি হারাচ্ছে। প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শন বিলীন হয়ে যাচ্ছে। মানুষের চলাফেরা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এসবই ব্যাবসা ও মানবাধিকার রিপোর্টিংয়ের উপজীব্য বিষয়। এমনকি বিশ্বের অনলাইনের বিক্রেতারাও ব্যাবসা ও মানবাধিকার রিপোর্টিংয়ের বিষয় যদি ওইসব ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান আয়কর প্রদান না করে। কেননা আয়কর মানবাধিকার নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। 'It is a wide-ranging subject, including gender inequality and violence, indigenous land rights, and increasingly complex supply chains. It takes in microplastic, recycling, and climate change, as well as tax evasion, corruption, and the growing influence of the tech giants on the world's digital economy. Construction, fashion, transport, food? Vaccine distribution? All these topics have a business and human rights angle (UNDP, 2021).'

এছাড়া কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার নিয়ে ব্যাবসা ও মানবাধিকার রিপোর্টিংয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। বেশির ভাগই নেতিবাচক রিপোর্টিং যেমন শ্রমিক নির্যাতন, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা, মজুরিবৈষম্য, কম মজুরি প্রদান, কর্মঘণ্টাসহ বাংলাদেশ শ্রম আইনসহ সংশ্লিষ্ট আইনের কোন কোন বিষয় লঙ্ঘিত হচ্ছে, তা রিপোর্টের বিষয়। আবার শোভন কর্মক্ষেত্র জনগোষ্ঠীর ওপর কী ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে বা কীভাবে ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কর্মকৌশল মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার সুরাহা করছে, তা ব্যাবসা ও মানবাধিকার রিপোর্টিংয়ের অন্যতম উপাদান। কর্মক্ষেত্রে শিশুশ্রম, জবরদস্তিমূলক শ্রম, যৌন হয়রানি ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থা প্রভৃতিসহ অসংখ্য বিষয় ব্যাবসা ও মানবাধিকারের অনুষঙ্গ। ব্যাবসা ও মানবাধিকারসংক্রান্ত জাতিসংঘের নির্দেশিত নীতির অধীনস্থ সব বিষয় ব্যাবসা ও মানবাধিকার রিপোর্টিংয়ের বিষয়।

৫. ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে মানবাধিকার পরিমাপ করার পদ্ধতি

সাংবাদিকতায় রিপোর্টিং করার জন্য গবেষণার মতো পদ্ধতি ব্যবহার তেমন করা হয় না। কিন্তু অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় পদ্ধতিগত অনুসন্ধান করা হয়। ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে কি না, তা একটা স্কোরকার্ড দিয়ে পরিমাপ করলে সিদ্ধান্তে আসা সহজ হয়। সব সময় নম্বর বসিয়ে পরিমাপ করতে হবে তা নয়। তবে নিম্নোক্ত স্কোরকার্ড থাকলে একটা চেকলিস্টের মতো কাজ করে, যা ভালো রিপোর্টিংয়ের জন্য অপরিহার্য। আমি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যাবসা ও মানবাধিকার নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বাংলাদেশের ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের মানবাধিকার পরিমাপ করতে গিয়ে এই স্কোরকার্ড প্রণয়ন করি। কিছুটা পরিমার্জন ও সংশোধন করে সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহের হাতিয়ার হিসাবে স্কোরকার্ডটি নতুন করে প্রণয়ন করা হলো।

সারণি-১: ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যাবসা ও মানবাধিকার পরিস্থিতি পরিমাপক স্কোরকার্ড

মৌলিক তথ্য	
ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী/ সংগঠন/ উপজাতির নাম	
সমীক্ষার তারিখ	
জনগোষ্ঠী এবং বিনিয়োগের মৌলিক তথ্য	
জনগোষ্ঠী /সংগঠন/উপজাতির ক্ষতিগ্রস্ত সদস্য সংখ্যা	
ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী/সংগঠন/উপজাতির ভূমির আয়তন	
বিনিয়োগের ধরন	
বিনিয়োগের পর্যায় (প্রকল্প অনুসন্ধান, প্রাক-নির্মাণ, নির্মাণ অথবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন)	
বিনিয়োগের স্থান	
বিনিয়োগকারী/কোম্পানির নাম	
বিনিয়োগ/ প্রকল্প কার্যক্রম শুরুর তারিখ	

চলমান

ব্যবসায় মানবাধিকার স্তম্ভ (Pillar)	সূচক/বিষয়	প্রায়োগিক সংজ্ঞা/ব্যাখ্যা	তথ্যের উৎস ও পদ্ধতি	নম্বর
Protect প্রতিরোধ/ সুরক্ষা	১. জনগোষ্ঠীর ভূমি ব্যবহারের অধিকার (প্রবেশাধিকার, উচ্ছেদ ও সম্পদ বিনষ্ট) যেন হ্রাস না পায়	ভূমি ব্যবহারের অধিকার নিশ্চিত কি না দেখতে হবে। ভূমিতে প্রবেশাধিকার বাধাগ্রস্ত হয়েছে কি না, উচ্ছেদ হয়েছে কি না এবং ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কি না, তা অনুসন্ধান করতে হবে।	বিনিয়োগ নীতি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎকার পর্যবেক্ষণ	০ থেকে ৫
	২. জনগোষ্ঠীর ভূমির ওপর নিয়ন্ত্রণ/সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার (ব্যবস্থাপনা ও বর্জন) যেন হ্রাস না পায়	ভূমির ওপর জনগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণের নিজস্ব ব্যবস্থাপনা (প্রচলিত রীতি) ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে কি না, তা অনুসন্ধান করতে হবে।		০ থেকে ৫
	৩. অধিকারভোগী ও জনগোষ্ঠী উচ্ছেদের হুমকি যেন না পায়	অধিকারভোগীসহ জনগোষ্ঠীর কোনো সদস্য উচ্ছেদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ (হত্যা, নির্যাতন-আক্রমণ, ধর্ষণ, অপহরণ, মানসিক ও আবেগগত আঘাত, ব্ল্যাকমেইলিং প্রভৃতি) হুমকি পেয়েছে বা হুমকি মনে করছে কি না তা জানতে হবে।	-মামলার কাগজ -জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎকার -পর্যবেক্ষণ	০ থেকে ৫
	৪. প্রস্তাবিত ও চলমান কার্যক্রম-আয়োজন এবং কর্মকৌশল যেমন যৌথ ব্যাবসা, ব্যবস্থাপনা চুক্তি এবং বিপণন চুক্তি যেন বৈধ ও স্বচ্ছ হয়। অর্থনৈতিক সুবিধা ও ঝুঁকির বিয়য়গুলো যেন বিনিয়োগকারী এবং সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে আদান-প্রদান করা হয়।	কোম্পানির প্রস্তাবিত ও চলমান কার্যক্রম এবং কর্মকৌশল পরিচালনার জন্য অন্য কোনো কোম্পানির সঙ্গে যৌথ বিনিয়োগ, ব্যবস্থাপনা, বিপণন প্রভৃতির জন্য সমঝোতা স্মারক এবং চুক্তিপত্র বৈধ ও অবাধ হয়। ব্যবস্থাপনা পরিষদ, নীতি, আচরণবিধি প্রভৃতি বিষয়গুলো সবার জন্য অবাধ থাকবে। বিনিয়োগের উপকারিতা ও ঝুঁকির বিষয়গুলো (পরিবেশ প্রভাব সমীক্ষা-EIA, জনগোষ্ঠীর পূর্বসম্মতি, উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলা কর্মকৌশল) যেন এসব কাগজপত্রে উল্লেখ থাকে এবং তা যেন বিনিয়োগকারী ও সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে আদান-প্রদান করা হয়।	চুক্তিপত্র জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎকার পর্যবেক্ষণ	০ থেকে ৫
	৫. জনগোষ্ঠীর জীবিকায়নের জন্য বরাদ্দকৃত জমি, খোলা মাঠ, বাসস্থান এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিনিয়োগ দ্বারা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।	জনগোষ্ঠীর জীবিকায়নের জন্য বরাদ্দকৃত জমি, উন্মুক্ত মাঠ যেমন: খেলার মাঠ, বাড়ি-ঘর এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিনিয়োগ দ্বারা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।	চুক্তিপত্র জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎকার পর্যবেক্ষণ	০ থেকে ৫
	৬. চুক্তি ও দলিল-দস্তাবেজসহ বিনিয়োগসংশ্লিষ্ট পূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য তথ্য যেন স্বচ্ছ ও সহজপ্রাপ্য হয় এবং তা যেন নারী ও প্রান্তজনসহ ওই জনগোষ্ঠীর নিকট বোধগম্য হয়।	বিনিয়োগের সনদ, সংঘবিধি (articles of association), সংঘ-স্মারক (memorandum of association), সমঝোতা স্মারক (MoU), চুক্তিপত্রসহ, ব্যবস্থাপনা নীতি ও কর্মপরিকল্পনাসহ সব কাগজপত্র স্বচ্ছ এবং ওই জনগোষ্ঠীর সবার কাছে সহজপ্রাপ্য কি না, তা অনুসন্ধান করতে হবে।	–সনদ, সংঘবিধি, সংঘ-স্মারক, সমঝোতা স্মারক, চুক্তিপত্রসহ, ব্যবস্থাপনা নীতি ও কর্মপরিকল্পনাসহ সব কাগজপত্র –জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎকার –পর্যবেক্ষণ	০ থেকে ৫

চলমান

ব্যবসায় মানবাধিকার স্তম্ভ (Pillar)	সূচক/বিষয়	প্রায়োগিক সংজ্ঞা/ব্যাখ্যা	তথ্যের উৎস ও পদ্ধতি	নম্বর
	৭. দায়িত্বশীল বিনিয়োগের জন্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান জাতীয় আইন এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আইন যেন মেনে চলে।	কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান দেশের বিদ্যমান আইন এবং আন্তর্জাতিক আইন যা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত, সেগুলো মেনে চলছে কি না তা অনুসন্ধান করতে হবে।	বিনিয়োগ নীতি ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা-কর্মচারীর সাক্ষাৎকার পর্যবেক্ষণ	০ থেকে ৫
	৮. বিনিয়োগে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা যেন টেকসই হয়।	বিনিয়োগের ফলে পুকুর-জলাশয়সহ পানিসম্পদ, খনিজসম্পদ, গাছপালা-বনভূমি-পরিবেশ, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কি না বা এসবের স্থায়িত্বের/সংরক্ষণের ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ রয়েছে কি না, তা অনুসন্ধান করা।	বিনিয়োগ নীতি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎকার পর্যবেক্ষণ-ইটিপি, ইআইএ	০ থেকে ৫
	৯. কোম্পানি যেন অপ্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছরের কম) কাউকে শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ না দেয়া/কাজ না করায়	বিদ্যমান অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর, যা কিছুই থাকুক না কেন, শিশু আইন ২০১৩ অনুযায়ী অনূর্ধ্ব ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল ব্যক্তি শিশু হিসাবে গণ্য হবে।	কোর্ট জনগোষ্ঠীর সদস্য ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর সাক্ষাৎকার পর্যবেক্ষণ-নিয়োগপত্র	০ থেকে ৫
	১০. কোম্পানি যেন তার কর্মীদের পেশাগত স্বাস্থ্য এবং ভৌত অবকাঠামো ওই জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির কারণ না হয়	কোম্পানি তার কার্যক্রম এমনভাবে পরিচালিত করবে যেন কর্মক্ষেত্র শ্রমিকদের জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (মৃত্যুর) ঝুঁকির কারণ না হয়। আবার ওই কার্যক্রম বা কোম্পনির ভৌত অবকাঠামো যাতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি না হয়। যেমন–কারখানার বর্জ্য ওই এলাকার জনগণের জন্য স্বাস্থ্যঝুঁকি।	পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতি জনগোষ্ঠীর সদস্য ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর সাক্ষাৎকার পর্যবেক্ষণ-ইটিপি, ইআইএ	০ থেকে ৫
সম্মান/ পালন Respect	১১. অধিকারভোগীরা এবং জনগোষ্ঠী নিশ্চিত থাকে যে তারা পরামর্শ ও আলোচনা প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত	অধিকারভোগী জনগোষ্ঠী নিশ্চিত যে কোম্পানির সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের বিষয় তাদের আগেই জানানো হয়েছে এবং তারা সংশ্লিষ্ট আলোচনা প্রাক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।	জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎকার পর্যবেক্ষণ	০ থেকে ৫
	১২. অধিকারভোগী এবং জনগোষ্ঠীর এলাকায় বিনিয়োগের পূর্বে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হয়েছে	কোম্পানির কোনো কার্যক্রম শুরুর আগে ওই এলাকার জনগণকে তাদের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে পর্যাপ্ত সময় দিয়েছে এটা তারা যেন নিশ্চিত থাকে।	–স্থানীয় সরকার, –জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎকার	০ থেকে ৫
	১৩. কোম্পানি জোরপূর্বক এবং প্রতারণামূলক কোনো কাজ করেনি	কোম্পানি কাউকে জোরপূর্বক কোনো কাজ করতে বাধ্য করেছে কি না বা কারও সঙ্গে প্রতারণা করেছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে হবে।	–মামলার কাগজ –জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎকার –পর্যবেক্ষণ	০ থেকে ৫
	১৪. পবিত্র ও ধর্মীয় উপাসনালয় ও স্থাপনা, সাংস্কৃতিক বা শিক্ষণীয়/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি কোম্পানি যেন সম্মান দেখায় এবং সেসব প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনা 'অপবিত্র' না করে	মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা, শ্মশান, গোরস্থান, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ পবিত্র ও ধর্মীয় উপাসনালয় ও স্থাপনার মর্যাদাহানি যেন না হয় তা অনুসন্ধান করতে হবে।	–জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎকার –পর্যবেক্ষণ	০ থেকে ৫
	১৫. কোম্পানি প্রচলিত, প্রথাগত ও স্থানীয় জ্ঞান, পদ্ধতি এবং অভ্যাস/চর্চার অস্তিত্ব যেন স্বীকার করে এবং সম্মান দেখায়।	প্রচলিত, প্রথাগত ও স্থানীয় জ্ঞান, পদ্ধতি এবং অভ্যাস/চর্চা এলাকাভেদে ভিন্ন। এসব জ্ঞান, পদ্ধতি এবং অভ্যাস/চর্চার প্রতি কোম্পানি শ্রদ্ধাশীল কি না তা জানতে হবে।	–জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎকার –পর্যবেক্ষণ	০ থেকে ৫

চলমান

ব্যবসায় মানবাধিকার স্তম্ভ (Pillar)	সূচক/বিষয়	প্রায়োগিক সংজ্ঞা/ব্যাখ্যা	তথ্যের উৎস ও পদ্ধতি	নম্বর
	১৬. খাদ্যে অভ্যাসগত স্বাধীনতা, পুষ্টি অথবা জনগোষ্ঠীর জীবিকায়নের প্রতি বিনিয়োগ যেন হুমকি না হয় বিশেষ করে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী যেমন: নারী, কৃষক, জেলে, বনজীবী ও ভাসমান জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী যাদের ভূমি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	জনগোষ্ঠীর খাদ্য, পুষ্টি, অথবা জীবিকায়নের জন্য কোম্পানির কার্যক্রম হুমকি হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখতে হবে।	–জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎকার –পর্যবেক্ষণ	০ থেকে ৫
	১৭. কোম্পানি জনগোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি যেন বিভক্ত না হয় বা হুমকির মুখে না পড়ে।	জনগোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতিকে বিভক্ত বা হুমকির মুখে ফেলার জন্য সাধারণত চাকরি ও পরিষেবা বা পণ্য ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধা একপক্ষকে দিয়ে অন্যপক্ষের প্রতি বৈষম্য করা হয়। কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের প্রতি কোম্পানি এ ধরনের অপমানজনক আচরণ করছে কি না তা খতিয়ে দেখতে হবে।	–জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎকার –পর্যবেক্ষণ	০ থেকে ৫
	১৮. কোম্পানি/বিনিয়োগকারী কর্তৃক কোনো জনগোষ্ঠীর নেতা অথবা সদস্যকে শারীরিক ও মানসিকভাবে আঘাত অথবা হয়রানি বা দুর্বৃত্তায়ন যেন না করা হয়।	খুন, ধর্ষণ, শারীরিক আঘাত, নির্যাতন ও মানসিকভাবে আঘাত অথবা অন্য কোনোভাবে হয়রানি বা দুর্বৃত্তায়ন বিনিয়োগকারী করেছে কি না তা অনুসন্ধান করতে হবে।	–কোর্ট, পুলিশ তথ্য –জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎকার –পর্যবেক্ষণ	০ থেকে ৫
প্রতিকার Remedy	১৯. বিনিয়োগকারী কোম্পানির যেন সহজপ্রাপ্য, প্রবেশযোগ্যতা এবং জনবান্ধব অভিযোগ দায়ের করার ব্যবস্থা থাকে।	কোম্পানির বা এর কর্মকতা-কর্মচারীর কোনো কার্যক্রমের প্রভাবে জনগোষ্ঠীর ক্ষতিগ্রস্ত সদস্য সহজ প্রক্রিয়ায় অভিযোগ জানাতে পারে কি না এবং প্রতিকার পায় কি না. তা যাচাই করতে হবে।	বিনিয়োগ নীতি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎকার -পর্যবেক্ষণ	০ থেকে ৫
	২০. বিনিয়োগের ফলে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর নিরাপদ স্থানান্তর, ন্যায্য ক্ষতিপূরণ, পুনরুদ্ধার এবং অথবা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	বিনিয়োগের ফলে কখনো কখনো জনগোষ্ঠীর সদস্যদের নিরাপদ স্থানে পুনর্বাসন করতে হয়। এক্ষেত্রে নিরাপদ স্থানান্তর, ন্যায্য ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি কোম্পানি কর্তৃক নিশ্চিত করেছে কি না তা দেখতে হবে।	বিনিয়োগ নীতি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎকার -পর্যবেক্ষণ	০ থেকে ৫
সর্বমোট				

* পর্যবেক্ষণের সময় ছবি বা চিত্র বা অন্য কোনো প্রমাণপত্র রাখতে হবে। ০ থেকে ৫ পর্যন্ত যে কোনো নম্বর দেওয়া যাবে।

সারণি-২: স্কোরকার্ড থেকে স্কোরিং করার পদ্ধতি

স্কোর	স্কোরিং ফলাফল
<৮০	অগ্রহণযোগ্য
৮১-৮৫	সন্তোষজনক
৮৬- ৯০	ভালো
৯১-৯৫	আরও ভালো
৯৬-১০০	খুবই ভালো

ব্যাবসা ও মানবাধিকার রিপোর্টিং এক বিশেষ ধরনের রিপোর্টিং হলেও বেশির ভাগ রিপোর্টার এ রিপোর্ট করতে পারেন। কেননা ব্যাবসা ও মানবাধিকার জীবনের সব ক্ষেত্রে বিদ্যমান। তবে সাংবাদিক একধরনের মানবাধিকার সুরক্ষাদানকারী

ওপরের সারণি-১ এর সর্বমোট নম্বর যদি ৮০-এর নিচে হয়, তাহলে কোম্পানির মানবাধিকার পরিস্থিতি 'অগ্রহণযোগ্য'। ৮১-৮৫-এর মধ্যে নম্বর থাকলে তা সন্তোষজনক। তবে ৮৬-৯০ ভালো, ৯১-৯৫ আরও ভালো এবং ৯৬-১০০ খুবই ভলো পর্যায় বলে মনে করা যায়। স্কোরকার্ডটি রিপোর্টারের তথ্যের পরিপূর্ণতা ও সঠিকতা নিশ্চিতকরণের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। সূচকগুলোর প্রতিটিই রিপোর্টিংয়ের আলাদা বিষয় হতে পারে আবার একসঙ্গেও হতে পারে।

৬. ব্যাবসা ও মানবাধিকার রিপোর্টিংয়ের রিপোর্টার

ব্যাবসা ও মানবাধিকার রিপোর্টিং এক বিশেষ ধরনের রিপোর্টিং হলেও বেশির ভাগ রিপোর্টার এ রিপোর্ট করতে পারেন। কেননা ব্যাবসা ও মানবাধিকার জীবনের সব ক্ষেত্রে বিদ্যমান। তবে সাংবাদিক একধরনের মানবাধিকার সুরক্ষাদানকারী। শুধুই ব্যাবসা ও মানবাধিকার রিপোর্টিংকেই বিট হিসাবে নিতে পারেন একজন রিপোর্টার।

ফ্যাশন সংবাদদাতারা সংবাদগল্প খুঁজে পেতে পারেন ওই সংশ্লিষ্ট কারখানায় শ্রমিকদের অধিকার ও মানবাধিকারের বিষয়গুলো। ক্রীড়া প্রতিবেদকরা দেখতে চাইতে পারেন ক্রীড়াসামগ্রী প্রস্তুতকারক বা একটি স্পন্সর স্থানীয় দলের কর্মপরিবেশ বা ফিফা বিশ্বকাপের জন্য নতুন স্টেডিয়াম তৈরিতে কতজন শ্রমিক আহত বা নিহত হয়েছেন।

ব্যাবসা এবং আর্থিক রিপোর্টার প্রথাগতভাবে কোম্পানির লাভ-ক্ষতি বা বিনিয়োগ নিয়ে কাজ করে। মানবাধিকার লঙ্ঘন শেয়ার মূল্যকে প্রভাবিত করতে পারে।

৭. ব্যাবসা ও মানবাধিকার রিপোর্টিংয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ

ব্যাবসায়িক নেতা, বিনিয়োগকারী বা সরকারি কর্মকর্তা ব্যাবসা মানবাধিকারসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে নাও পারেন। এছাড়াও মাঠে কাজ করতে গিয়ে রিপোর্টার অনেক ধরনের সমস্যায় পড়তে পারেন বা অনেক চ্যালেঞ্জ থাকতে পারে। যেসব কর্মক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, সেসব কর্মস্থলে আপনাকে প্রবেশ করতে নাও দিতে পারে বা বিভিন্নভাবে রিপোর্টার বাধাগ্রস্ত হতে পারেন। এমনকি, যেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে, সেখানে প্রবেশ করার পরও শ্রমিক-কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলতে সক্ষম নাও হতে পারেন। কারণ তারা চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার আশঙ্কা করতে পারেন। বাংলাদেশে কাউকে তথ্য প্রদানে একধরনের ভীতি কাজ করে।

৮. উপসংহার

ব্যাবসা ও মানবাধিকার সংক্রান্ত রিপোর্টিংয়ের ধারণায়ন ও পদ্ধতিগত প্রক্রিয়ার বিবরণ এখনো পঠনপাঠনের আওতায় আসেনি। এ নিয়ে একাডেমিক পরিসরে পঠনপাঠন খুবই জরুরি। সংবাদিকদের জন্য ব্যাপক পরিসরে প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। কারণ এ ধরনের রিপোর্টিং একধরনের অ্যাডভোকেসি জার্নালিজম, রাইটস অ্যাকটিভজুম। কেননা সাংবাদিকরা হচ্ছেন রাইটস ডিফেন্ডার্স।

৯. তথ্যসূত্র

* Koster, Edwin (nd). PILLARS IN PRACTICE: Advancing the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights in the Bangladesh Garment Sector, The DANISH Institute for Human Rights and Social Accountability International.
* UN (2012). The Corporate Responsibility to Protect Human Rights: An Interpretive Guide, The United Nations Human Rights Office of The High Commissioner.
* UNDP (2021). Reporting Business and Human Rights: A Handbook for Journalists, Communicators, and Campaigners.

লেখক: শিক্ষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার পাঁচফোড়ন

মামুন অর রশিদ

সাংবাদিকতা হলো সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে খবর ও মন্তব্য প্রকাশ করা। 'Journalism' একটি ইংরেজি শব্দ। শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হলো সাংবাদিকতা। 'Journalism' শব্দটির অর্থ ভালোভাবে বুঝতে একে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হলো 'Journal' আর অপরটি হলো 'ism'। 'Journal' বলতে বোঝায় 'দিনপঞ্জি'। অথবা কোনো কিছু প্রকাশ করা। আর 'ism' মানে হলো চর্চা বা অভ্যাস। এককথায় বলা যায়–'দিনপঞ্জি চর্চা বা অনুশীলন'। অনেকেই একে সাততাড়াতাড়ির সাহিত্যপত্র বলে মন্তব্য করেন। আবার অনেকে একে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার খণ্ডাংশ বলেও উল্লেখ করেন। আর অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা হচ্ছে সাংবাদিকতার এমন একটি শাখা, যা ব্যাবসাবাণিজ্য, অর্থনৈতিক ও আর্থিক কার্যক্রমের খোঁজখবর প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য দেয়। যেখানেই ব্যবসায় বা অর্থনৈতিক কার্যক্রম, সেখানেই সংবাদ। ঘটনা প্রবাহের বিশ্লেষণ করে থাকে যেমন স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় পরিসরে; এমনকি বিশ্বপরিসরে হওয়ারও সুযোগ থাকে। প্রতিটি মানুষকে জীবন-জীবিকার জন্য অর্থকড়ি, ভাড়া গোনা, আয়কার রিটার্ন দাখিল বা মোবাইলে রিচার্জ করা, বিকাশ বা রকেটের মতো মোবাইল ব্যাংকিংয়ের সুবিধা কাজে লাগিয়ে অর্থ পাঠানো–এগুলো সবই অর্থনৈতিক বিষয়। এমনকি, অবকাঠামো উন্নয়ন অর্থাৎ সড়ক, বন্দর, সেতু নির্মাণ, গ্যাসের সংযোগ, বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ–এগুলোও অর্থনীতির কার্যক্রমে জড়িয়ে আছে। তাই অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার পরিধি বেশ বড়ো, এর ক্যানভাস অনেক দূর বিস্তৃত। কেবল আর্থিক বা বাণিজ্যিক বিষয়াদি নয়, এর সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন পেশা ও শ্রম, বাজেট ও উদ্যোগ, ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, আর্থিক লেনদেন, ব্যাংক, বিমা, শেয়ার মার্কেট, পণ্য বাজারজাতকরণ ও বিপণন, বাজারদর, পাইকারি ও খুচরা বিক্রি, করপোরেট অর্থায়ন; অর্থাৎ বড়ো শিল্প-কারখানা থেকে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প কিংবা কারখানার শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের মতো নানাবিধ বিষয় এর সঙ্গে সম্পর্কিত। দেশের অর্থনীতি তথা উন্নয়ন কীভাবে আসছে, কীভাবে আসবে আরও গতি, কী আছে সরকারের পরিকল্পনার ঝুলিতে, দেশের কোন কানাচে বসে কী করছে বেসরকারি খাত, সেই খবরের পেছনে ছুটছেন একদল অর্থনৈতিক সংবাদকর্মী, তাদের মাধ্যমেই জানা যাচ্ছে সেসব গল্প, যা হয়তো অনুপ্রেরণাদায়ক হিসাবেও কাজ করছে দেশের অর্থনীতির সম্প্রসারণে। যেমনটা আগেও হয়েছে।

বিশ্বে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা: ১৮৮২ সালে চার্লস ডাউ, এডওয়ার্ড জোনস এবং চার্লস বার্গস্ট্রেসের এক ধরনের ওয়ার সার্ভিস চালু করেন, যার সাহায্যে ওয়ালস্ট্রিটের বিনিয়োগ হাউসগুলো সংবাদ পেতে

শুরু করে। ১০০ বছরের বেশি সময় পর শেয়ারবাজারে সাধারণ মানুষের বিনিয়োগ বাড়তে থাকায় গণমাধ্যমে ব্যবসায় সাংবাদিকতা প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। ইউরোপে পণ্যের মূল্যসংক্রান্ত খবর প্রকাশ শুরু হয় অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি। যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম অর্থনৈতিক পত্রিকা বাজারে আসে ১৭৯৩ সালে। ১৮৪৯ সালে জুলিয়াস রয়টার্স ইউরোপে বিজনেস সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করেন। যুক্তরাষ্ট্রে ওয়ালস্ট্রিট জার্নালের আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৮৮৯ সালে। তবে বিশ শতকের শুরুর দশক পর্যন্ত সাংবাদিকতা চর্চায় এবং অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার বিষয়টি কমই মনোযোগ পেয়েছে। বাংলাদেশও ব্যতিক্রম নয়। বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকতায় মূল আগ্রহের বিষয় ছিল তখন রাজনীতি, সাহিত্য ও পাবলিক অ্যাফেয়ার্স। বেসরকারি উদ্যোগের খবর সংবাদমাধ্যমে স্থান পেত না বললেই চলে। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো পুঁজিবাদী দেশের সংবাদমাধ্যমে শ্রমিক সংগঠনের কোনো খবর থাকত না। আর থাকলেও তাদের অবস্থান থাকত প্রান্তিক পর্যায়ে শ্রমিক স্বার্থ-দাবির খবর সংবাদমাধ্যমে এমনভাবে উপস্থাপন করা হতো যে, শ্রমিক সংগঠন ও তাদের নেতাদের মনোভঙ্গি ছিল শত্রুভাবাপন্ন। দুটি মহাযুদ্ধের পর এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি, অর্থনৈতিক মন্দা আর বড়ো বড়ো শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। এসবের কারণে বিশ্বব্যাপী এমন ধারণা তৈরি হয় যে, বিজনেস ইজ এভরিবডিজ বিজনেস; যেমন তা মালিকের, তেমনই তা শ্রমিকের, ম্যানেজার ও কর্মচারীর, পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি থেকে করপোরেট প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার–বিজনেস সবার জন্যই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় কী করবেন? কী করবেন না: ১. প্রাপ্ত সব তথ্যই যাচাই-বাছাই করুন। ২. তাড়াতাড়ি প্রতিবেদন জমা দিতে গিয়ে বিকৃত ও অসম্পূর্ণ তথ্য-উপাত্ত দিয়ে প্রতিবেদন লেখা চলবে না। ৩. কোনো ব্যক্তিকে ভুলভাবে উদ্ধৃত করা যাবে না। ৪. সূত্র সুনিশ্চিত করে উল্লেখ করুন এবং হালনাগাদ তথ্য ব্যবহার করুন। ৫. তথ্য পেতে অনৈতিক পথ অনুসরণ বা প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া যাবে না। ৬. অনুমাননির্ভর হবেন না বা ধারণার বশবর্তী হয়ে কিছু বলবেন না। ৭. তথ্য বিকৃত করা চলবে না। অপছন্দের তথ্য ব্যবহার থেকে বিরত হবেন না। ৮. তথ্যের উৎসের স্বীকৃতি দিতে হবে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। এমনকি প্রতিবেদন প্রকাশনার তথ্য নিলেও উল্লেখ করা চাই। ৯. শব্দচয়নের ক্ষেত্রে সতর্ক না থাকলে বিভ্রান্তি তৈরির সুযোগ তৈরি হয়। ১০. বাজেট, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, মুদ্রানীতি, রাজস্ব আদায়, এমন অনেক টপিক আছে যেসব টপিকের ওপর নতুন সংবাদকর্মীদের অনেকেরই পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকে না, সেক্ষেত্রে অনেক সময় সংবাদের মধ্যে এমন কিছু ভুল তথ্য চলে আসে, যা পরিহার করতে হবে।

পরিসংখ্যানে যেন গরমিল না থাকে: অর্থনৈতিক সংবাদে সঠিক পরিসংখ্যান ব্যবহারের বিকল্প নেই। এমন ক্ষেত্রে হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করতে হয়। আবার অনেক সময় দেখা যায়, সুবিধাজনক তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করেন রিপোর্টারা। বাজেট বক্তব্যে দেখা যায়, তুলনা করার সুবিধা বিবেচনায় এনে একেক বছরের তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করা হচ্ছে। আর এই দুই সময়ের ফারাক বিবেচনায় নিয়ে রিপোর্টটি তৈরি হয় পরস্পরবিরোধী অবস্থান থেকে। হালনাগাদ তথ্য গোপন করার বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে, যা পাঠক বা দর্শককে অনেক গোলকধাঁধায় ফেলে দেয়।

অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা ও নৈতিকতা: সংগৃহীত তথ্য হতে হবে নির্ভুল, সংগ্রহ করা হবে সৎ উপায়ে এবং উপস্থাপনে থাকবে পক্ষপাতহীনতা সততা। সাংবাদিকদের পেশাগত আচরণ হতে হবে অনতিক্রম্য এবং ব্যক্তিগত আচরণ থাকবে সমালোচনার ঊর্ধ্বে। অনেক সময় সাংবাদিকদের নানা ধরনের উপহার ও উপঢৌকন দেওয়া হয়, এমনকি বিদেশ সফরেরও প্রস্তাব আসতে পারে–এসব বিষয় সযত্নে এড়িয়ে চলা প্রয়োজন। কোনো ধরনের উপহার বা সুবিধা নিলে স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় নৈতিকতা প্রসঙ্গে ওয়েবসাইটে এমন অভিমত তুলে ধরেছে ইন্টারন্যাশনাল জার্নালিস্ট নেটওয়ার্ক–প্রত্যেক সাংবাদিক সত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকে এবং মানুষের কাছে সত্য তুলে ধরে। সাংবাদিকতার ইতিহাসে দেখা যায়, অসৎ প্রতিবেদন কারও চরম সর্বনাশ করেছে, সুনাম নষ্ট করেছে। সাংবাদিক যেন স্বচ্ছ থাকেন, সত্য তুলে ধরেন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে কিছু না করেন–এটাই কাম্য। নৈতিকতা অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় যুক্তদের সাংবাদিকতার অন্যান্য শাখার মতোই আচরণবিধি মেনে চলতে হয়। কিন্তু নৈতিকতা ও আচরণবিধি এক নয়। নৈতিকতা আইন দ্বারা সূত্রায়িত করা যায় না। নৈতিকতা হচ্ছে ন্যায়পরায়ণতা, সততা ও শুদ্ধতা; যার তাগিদ আসে কারও ভেতর থেকে। একজন অর্থনৈতিক সাংবাদিক বাংলাদেশ ব্যাংক কিংবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন শীর্ষ কর্মকর্তার বেশ আস্থাভাজন। তার কাছ থেকে নিয়মিত অর্থনীতির খবরাখবর মেলে। এর কোনো কোনোটা স্কুপ হয় এবং তার সুনাম বৃদ্ধি করে। এদের কারও গুরুতর অনিয়মের খবর পাওয়া গেল, এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক কী করবেন? তিনি কি বিষয়টি চাপা দিয়ে রাখার চেষ্টা করবেন? তিনি কি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানাবেন? আরেকভাবেও বিষয়টি দেখা যেতে পারে। একজন রিপোর্টার স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত একটি কোম্পানির ভেতরের খবর নিয়মিত জানতে পারেন। কাজের সূত্রে তিনি এমন কিছু তথ্য জানলেন, যা থেকে ধারণা করা যায় যে আগামী দিনে কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে যেতে পারে। এজন্য তিনি কি নিজে ওই কোম্পানির কিছু শেয়ার কিনে রাখবেন। এটিই হলো নৈতিকতার প্রশ্ন।

উপসংহার: নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন (১৯৮৯) বলেছেন, কল্যাণ অর্থনীতিতে আরও সম্প্রসারিত করা দরকার। যাতে অন্তত নৈতিকতা এবং আধুনিক নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। আসলে নৈতিকতা বজায় রেখেই সাংবাদিকতা করা বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এত প্রসারিত হয়েছে যে, অর্থনীতির খবর প্রতিদিনই কোনো না কোনো সংবাদমাধ্যমের প্রধান শিরোনাম হচ্ছে। প্রতিটি সংবাদমাধ্যমের বড়ো একটি অংশজুড়ে থাকছে অর্থনীতির খবর। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে অর্থনীতি নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। আর তাই ব্যাবসাবাণিজ্য নিয়ে কাজ করা একক পত্রিকা বা অনলাইন পোর্টাল গড়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে, ঠিক যে সময় অনেক পুরোনো জাতীয় পত্রিকা বা অনলাইন মিডিয়া হোঁচট খাচ্ছে। এছাড়া চ্যানেলগুলোর সংবাদে ব্যাবসাবাণিজ্য নিয়ে আলাদা অংশ থাকছে। নিউজ চ্যানেলগুলোয় শুধু অর্থ-বাণিজ্য নিয়ে আলাদা সংবাদই প্রচার হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠান, টকশো প্রচারিত হচ্ছে অর্থ-বাণিজ্য নিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় সাংবাদিকতার পড়ালেখায় অর্থনীতি ও ব্যাবসাবাণিজ্য সাংবাদিকতাকে গুরুত্ব দিয়ে পড়ানো হয়। এমনকি প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশও (পিআইবি) এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে।

তথ্যসূত্র

* ব্যবসায় সাংবাদিকতা: অজয় দাশগুপ্ত ও রোবায়েত ফেরদৌস, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা।
* বিষয়: সাংবাদিকতা; পার্থ চট্টোপাধ্যায়–লিপিকা, কলকাতা, ভারত।
* রিনভী, শারমিন (২০২০)। *সাংবাদিকতার পড়ালেখায় অর্থনীতির বিস্তর আলোচনা নেই*, চ্যানেল আই অনলাইন https://www.channelionline.com
* খান, সাজ্জাদ আলম, অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় নৈতিকতা।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা ডিসিপ্লিন
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রবন্ধ

ব্যবসায় সাংবাদিকতায় নৈতিকতা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

মামুন আ. কাইউম

সাংবাদিকতায় নৈতিকতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও স্বাধীন পেশা বিবেচনায় প্রায়ই এটির ঘাটতি লক্ষ করা হয়। ডাক্তার, বিচারক বা ইঞ্জিনিয়ারের মতো পেশায় ক্ষতি হলে সেটির প্রভাব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা পরিবারের ওপর পড়ে থাকে। তবে সাংবাদিকতা পেশায় ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত একটি ভুল পুরো জাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। বর্তমান বিশ্বে বিটনির্ভর সাংবাদিকতা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। একদল সাংবাদিক নিজেদের বিটে প্রতিষ্ঠিত ও দক্ষ হয়ে উঠছেন। সাংবাদিকতার নীতিমালার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিটেও নীতি-নৈতিকতার বিষয় আলোচনার দাবি রাখে। ব্যবসায় সাংবাদিকতার ধারণা বাংলাদেশে বেশিদিনের না হলেও দিনদিন এর ধারণা জনপ্রিয় হচ্ছে এবং বিটে অনেক সাংবাদিকই কাজ করছেন।

পেশাগত কারণে একজন সাংবাদিকের সমাজের ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই সম্পর্ক ব্যবহার করে নিজের ভাগ্যবদলের সুযোগও আসতে পারে। একজন সাংবাদিকের কাছে ব্যাবসা বা শেয়ারবাজার অথবা বাজেটের আগে-পরে জিনিসপত্রের দাম বাড়া-কমার তথ্য আসে। পরিচিতদের সেসব তথ্য দিয়ে বা নিজে বিনিয়োগের সুযোগ নিলে পাঠকের আস্থা হারাবেন নাকি নিজের ভাগ্য গড়বেন, সেটি বড়ো প্রশ্ন হতে পারে? আবার ধরা যাক, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা খুব ভালো সোর্স হিসাবে কাজ করেন। সেই সূত্রের দেওয়া তথ্যে অনেক স্কুপ বা স্পেশাল স্টোরি করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তার বিরুদ্ধে বড়ো ধরনের দুর্নীতি বা স্বজনপ্রীতি অথবা অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেলে সাংবাদিক কি সেটি নিয়ে রিপোর্ট করবেন নাকি চেপে যাবেন–এমনও প্রশ্ন সাংবাদিকের মনে উঠতে পারে। প্রতিটি সংবাদের পেছনে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে যেমন সাংবাদিককে ছুটতে হয়, তেমনই প্রতিটি সংবাদে বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখা এবং সব পক্ষের বক্তব্য উপস্থাপনের বিকল্প নেই। বিজনেস উইকের মতো প্রতিষ্ঠান মনে করে, তাদের প্রকাশিত সবকিছু হবে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক। সেটি না করতে পারলে আস্থার সংকটের কারণে পাঠক-দর্শক-শ্রোতা হারিয়ে যাবে। সেটি হারিয়ে গেলে ভবিষ্যতে কালের গহ্বরে সেই গণমাধ্যমকে হারিয়ে যেতে হবে।

ভোক্তার আস্থা সংরক্ষণ ও বাড়ানোর জন্য সাংবাদিক এবং গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বমুখী সততা ও নিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। পেশাগত আচরণের পাশাপাশি সাংবাদিকের ব্যক্তিগত

আচরণকেও সমালোচনার উর্ধ্বে রাখতে হয়। কারণ সমাজে সাংবাদিকতা পেশাটি এখনো একটি অন্যতম সম্মানিত পেশা হিসাবে বিবেচিত হয়। আবার বিজনেস উইক পত্রিকাটির সম্পাদকীয় নীতিমালায় বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য ব্যাবসায়িক কার্যক্রমকে পৃথক রেখেছে। অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রে সংবাদের সঙ্গে বিজ্ঞাপনের সম্পর্ক রাখা হয় না। ফলে মাঝেমধ্যে আমাদের দেশের কিছু পত্রিকায় যেভাবে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, ব্যাংক বা মোবাইল অপারেটরদের বিরুদ্ধে সংবাদ না করার ক্ষেত্রে অঘোষিত চাপ রয়েছে। বিজনেস উইক পত্রিকাটি কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীকে সমর্থন দেয় না বরং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করে।

বিজনেস উইকের আরও সুনাম রয়েছে যে, নিজেদের মতামতের সঙ্গে বিরোধী হলেও পত্রিকাটি তা প্রকাশ করে। পত্রিকাটির প্রকাশিত প্রতিবেদন সম্পর্কে অভিযোগ এলে তৎক্ষণাৎ গুরুত্ব দিয়ে অনুসন্ধান করে সংবাদ যথার্থ হলে অভিযোগকারী যতই প্রভাবশালী হোক না কেন, অবস্থান থেকে একচুলও সরে না। আবার প্রকাশিত তথ্য ভুল প্রমাণিত হলে দ্রুত সংশোধনী ছাপার পাশাপাশি অন্যান্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এমনকি বিজনেস উইকের প্রতিবেদকদের কাছে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বা 'অব দ্য রেকর্ড' সূত্রকে পারতপক্ষে বিবেচনায় নেওয়া হয় না।

আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্টের মাধ্যমে সাংবাদিকতার বেশকিছু নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান ইস্যুভিত্তিক নীতিমালাকে সম্পাদকীয় নীতিমালার অংশ হিসাবে বিবেচনা করে আসছে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এমনটি করেছে। বিজনেস উইকের মতো আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রত্যেক কর্মীকে প্রতিবছর তাদের নিজস্ব প্রণীত আচরণবিধিতে স্বাক্ষর করায় এবং মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করে। যে কোনো পেশার মতো সাংবাদিকতা পেশায়ও 'স্বার্থের দ্বন্দ্ব' বা কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট যেন না হয়, সে বিষয়টিও বিবেচনায় নিতে হয়। অর্থাৎ কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছ থেকে বিভিন্ন সুযোগ যেমন দ্বিতীয় চাকরি, প্রচারণার দায়িত্ব নেওয়ার পরিবর্তে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া, বিভিন্ন উপহার গ্রহণ প্রভৃতি করার মাধ্যমে ওই প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির ব্র্যান্ড প্রমোশনের কাজে ব্যবহৃত হওয়াটাকে স্বার্থের দ্বন্দ্ব বলা হয়। অর্থাৎ পেশাগত আচরণের বাইরে অন্য কোনো ধরনের সম্পর্কের বাইরে স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো সম্পর্ককেই স্বার্থের দ্বন্দ্ব হিসাবে বিবেচনায় নেওয়ার সুযোগ থাকে। সহজ ভাষায়, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কোনো আনুকূল্য গ্রহণ করা যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মনে সাংবাদিককে নিজের প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কাজ করার অনুরোধ বা চাপ দিতে পারেন। অথবা আনুকূল্য নিয়ে সাংবাদিকের নিজের মনেও সেলফ সেন্সরশিপ বা ওই প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করার দায়বোধ তৈরি হওয়াটাই স্বার্থের দ্বন্দ্ব। আবার বিশেষজ্ঞ সূত্র হিসাবে সরকার, রাজনৈতিক দল-সমর্থিত অর্থনীতিবিদের পাশাপাশি বিকল্প কোনো ধারণা থাকলে সেটিকেও সমানভাবে উপস্থাপন করাটা একজন সাংবাদিকের অবশ্য করণীয় দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

প্রতিষ্ঠানের দেওয়া উপঢৌকন বিনয়ের সঙ্গে নেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। অন্যদেশের বা ঢাকার বাইরে প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প পরিচালনা পদ্ধতি দেখার জন্য বাইরের দেশে ট্যুরের অফার নেওয়া থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। নাহলে রিপোর্টে ওই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কিছু লেখা থেকে প্রাতিষ্ঠানিক বা সেলফ সেন্সরড হতে বাধ্য হতে হয়। ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর জার্নালিস্টের নীতিমালা অনুসারে, সাংবাদিকরা সৌজন্যতার খাতিরে বড়োজোর ক্যালেন্ডার, কলম বা এক কাপ কফি উপহার হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন। নৈতিক মানদণ্ড শক্তিশালী করতে বিজ্ঞাপন ও বিজনেস সাংবাদিকতার মাঝামাঝি স্পষ্ট দাগ টানার ওপর সেখানে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপনের জন্য সংবাদকে হত্যার বিষয়টি বিশ্বব্যাপী নীতিবহির্ভূত কর্মকাণ্ড হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আবার নতুন ধারার সাংবাদিকতায় কোনো প্রতিষ্ঠানের ইমেজ নেতিবাচকভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে কৌশলে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করাটাও ব্ল্যাকমেইলিংয়ের মতো অনৈতিক। এছাড়া সাংবাদিক সংগঠন ও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠান আয়োজনের নামেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে নগদ অর্থ থেকে শুরু করে অন্যান্য সুবিধা আদায় করাটাও নৈতিকতার বিচারে ঠিক নয়। এ কারণেই দেশের কিছু গণমাধ্যম যেমন, প্রথম আলো পত্রিকাটি এর প্রতিনিধিদের প্রেস ক্লাব বা অন্য কোনো সাংবাদিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হতে নিরুৎসাহিত করে থাকে। একইভাবে বিজ্ঞাপনের কমিশনের বিষয়টিও সাংবাদিকের সঙ্গে যুক্ত হলে সাংবাদিকদের হাত-পা এক প্রকার বাঁধা থাকে। এই কারণেই দেশের কিছু মূলধারার গণমাধ্যম ঢাকার বাইরের সাংবাদিকের বাইরে বিজ্ঞাপন ও বিল সংগ্রহের দায়িত্বে অন্য ব্যক্তিদের নিয়োগ দেয়।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নালিস্ট নেটওয়ার্ক ২০১৮ সালে ব্যবসায় সাংবাদিকতায় কর্মরত সাংবাদিকদের কিছু নীতিমালার আলোচনা এনেছে। সেখানে একজন সাংবাদিকের সাংবাদিকতা পেশার পাশাপাশি বিভিন্ন বিমা কোম্পানির এজেন্ট হওয়াকে স্বার্থের দ্বন্দ্ব বিবেচনায় অনুৎসাহিত করা হয়েছে। কোনো বিতর্কিত মর্টগেজ ব্রোকারের (বন্ধকি দালাল) কাছ থেকে সংবাদপত্রের সম্পর্ক পারতপক্ষে ছেদ করা প্রয়োজন। এমনকি জালিয়াতির অভিযোগে গ্রেফতার হলে সংবাদপত্রে সেটি নিয়ে প্রকাশিত সংবাদ কেমন হতে পারে, তাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্ত ওই ব্যক্তির সঙ্গে সব ধরনের লেনদেনের সম্পর্ক নিয়েও গণমাধ্যমের ভাবা প্রয়োজন। একজন মর্টগেজ ব্রোকার রেডিয়ো বা টিভিতে ম্যাগাজিনের জন্য অর্থ দিয়ে রিয়েল এস্টেট কেনা ও বিক্রির নামে অবৈধ ব্যাবসা করলে অনুষ্ঠান সম্প্রচারে রাজি হওয়ার আগে একধরনের গবেষণার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কেননা সংবাদপত্রের বা গণমাধ্যমের ব্র্যান্ডকে ব্যবহার করে জনসাধারণকে ধোঁকা দিলে সে দায় গণমাধ্যমের ওপরও বর্তায়। কোনো রিয়েল এস্টেট কোম্পানি খুব আকর্ষণীয় তথ্য দিয়ে বিজ্ঞাপন প্রচার করলে এবং সেটায় সাড়া দিয়ে ভোক্তা অবর্ণনীয় ভোগান্তির মধ্যে পড়লে, সেক্ষত্রে নৈতিকতার বিবেচনায় বিজ্ঞাপন গ্রহণে বিভিন্ন ধরনের ছাঁকনি ব্যবহার করা উচিত। শুধু তাই নয়, সংবাদের ছদ্মাবরণে বিজ্ঞাপন দেওয়াটাও ভোক্তা সহজেই এখন বুঝতে পারে। সুতরাং সম্প্রচার মাধ্যমে–'প্রিয় শ্রোতা, আপনারা কিন্তু এ লাইভে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কথা বলতে পারেন বা মেসেজ পাঠাতে পারেন। (একটি মোবাইল অপারেটর) কিন্তু দিচ্ছে সবচেয়ে কম খরচে কথা বলা এবং মেসেজ পাঠানোর সুবর্ণ সুযোগ' টাইপের বিজ্ঞাপনকে ছদ্মাবরণ দিয়ে ভোক্তাকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ গণমাধ্যমের নেই। অন্যদিকে, পত্রিকায় বেসরকারি মেডিক্যাল, ডেন্টাল বা নার্সিংয়ে পড়ার ওপর ফিচারে হঠাৎ করে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানকে ভালোর স্বীকৃতি দেওয়া শিক্ষার্থীকে ওই প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে উদ্বুদ্ধ করবে–বিষয়টি বিবেচনায় নিতে আরও প্রত্যাশিত আচরণ করা প্রয়োজন, যাতে নৈতিকতার বিচারে তা প্রশ্নবিদ্ধ না হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, বেশকিছু প্রতিষ্ঠান তাদের সঙ্গে গণমাধ্যমের সম্পর্ক বাড়িয়ে নেতিবাচক ইস্যুগুলো ঢেকে ব্র্যান্ড প্রমোশন করতে ফেলোশিপ দিচ্ছে। সেখানে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান থেকে নমিনেশন দেওয়ার পাশাপাশি কিছু প্রতিবেদন ছাপানোর নিশ্চয়তা দিতে হয়। এসব প্রতিবেদন বা ফেলোশিপের ক্ষেত্রে

একপাক্ষিক বা পাঠক যেন সহজেই না বুঝতে পারেন যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গুণগান গাওয়া, তা যেন না হয়–সেদিকে সাংবাদিককে খেয়াল রাখতে হয়। এছাড়া নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তির মন্তব্য অথবা সরকারি কর্মকর্তার ব্যক্তিগত অভিমত নিয়ে প্রতিবেদন অনেক সময় বিভ্রান্তির জন্ম দেয়। ভালো ট্রিটমেন্ট পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও এমন প্রতিবেদন এড়িয়ে চলাই ভালো। শেয়ারবাজার, ব্যাংক কেলেঙ্কারি, অর্থ পাচার বা জিডিপি-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে এমনটি ঘটার আশঙ্কা অমূলক নয়।

নিউইয়র্ক টাইমসের ২০০৪ সালের প্রণীত নীতিমালায় বলা হয়েছে, তথ্য দিতে আপত্তি বা গোপন তথ্য প্রদানে অসহযোগিতাকারীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়–এমন প্রতিবেদন করা থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি এমনকি সোর্স যেন নিউইয়র্ক টাইমসের সুনাম ব্যবহার না করতে পারে, সেদিকে খেয়াল রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেসব প্রতিষ্ঠান নিয়ে সাংবাদিক প্রতিবেদন করবেন যেমন: ওষুধ কোম্পানি, প্রকাশনা সংস্থা বা প্রতিরক্ষা সংস্থায় বিনিয়োগ করতে পারবেন না। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিক নীতিমালায় বলা হয়েছে, যেসব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে প্রতিবেদক প্রতিবেদন লিখেন অথবা সম্পাদকীয় হবে, সেসব প্রতিষ্ঠানের কাছে কোম্পানির লোগোযুক্ত সর্বোচ্চ ২৫ ডলারের গিফট গ্রহণ করা যেতে পারে। কোনো সাংবাদিক লাভজনক উদ্দেশ্যে কোনো প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করবেন।

অর্থনৈতিক বা ব্যাবসায়িক সাংবাদিকতায় নীতি-নৈতিকতার সর্বগ্রহণযোগ্য স্ট্যান্ডার্ড না থাকলেও সাংবাদিককে নিজ নিজ অবস্থান, সমাজ, প্রেক্ষিত বিবেচনায় তা মেনে চলতে হয়। বিচ্যুত হলেই সাংবাদিক ও সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যম প্রশ্নের সম্মুখীন হয় এবং ভোক্তা হারাতে শুরু করে। সুতরাং সাংবাদিকদের এবং গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজস্ব নৈতিকতার স্ট্যান্ডার্ড তৈরি ও মেনে চলা বিশেষ প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র

১. ব্যবসায় সাংবাদিকতা: অজয় দাশগুপ্ত ও রোবায়েত ফেরদৌস, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা।
২. বিষয় সাংবাদিকতা: পার্থ চট্টোপাধ্যায়, লিপিকা, কলকাতা, ভারত।
৩. অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় নৈতিকতা, সাজ্জাদ আলম খান, বাংলাদেশ ইকোনমিক অ্যাসোসিয়েশন।
৪. American Business Code of Ethics
৫. Thomson Reuters Code of Ethics
৬. The Guardians Editorial Code 11. The New Ethics of Journalism, principal of 21st century, Kelly McBride & Tom Rosentiel, Sage Publishers.
৭. ICFJ, Journalism ethics- The Global debate
৮. Ethical Journalism, New York Times

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

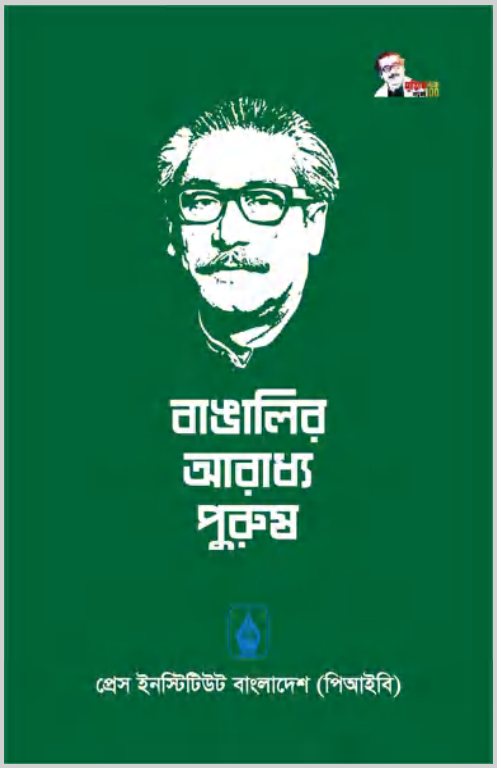

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

অর্থ ও ব্যাবসা-বাণিজ্যবিষয়ক সাংবাদিকতা: শুরু থেকে শেষ

মিনহাজ উদ্দীন

গণযোগাযোগ তাত্ত্বিক, নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনের (New York Herald Tribune) একসময়ের সাংবাদিক স্ট্যানলি ওয়ালকার (Stanley Walker) সংবাদের একটি সর্বজনীন ও গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাতে তিনি বলেছেন, সংবাদ হলো 'Women, wampum and wrong doing.' অর্থাৎ 'নারী, অর্থ (টাকা) ও খারাপ কাজ বা কর্ম'-ই সংবাদ। ডেভিড ড্যারি (David Dary) রচিত 'How To Write News For Broadcast and print Media' (1973) গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩২ পৃষ্ঠায় এই সংজ্ঞাটি স্থান পেয়েছে, যা থেকে পরিষ্কার–Wampum-এর প্রতিশব্দ Money সংবাদের একটি অপরিহার্য উপাদান। অর্থাৎ, টাকা বা অর্থসংক্রান্ত কোনো কিছুই সংবাদ আধেয় বা সংবাদ।

বিশ্বের চালিকাশক্তি বা মেরুদণ্ড হলো অর্থনীতি। আর সংগত কারণেই এই অর্থনীতি বা অর্থবিষয়ক সংবাদ হলো সংবাদমাধ্যমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আধেয়। অর্থবিষয়ক সংবাদ ছাড়া সংবাদমাধ্যম কল্পনাই করা যায় না। প্রতিটি গণমাধ্যমের জন্য এ বিষয়টি একটি অপরিহার্য অংশ হিসাবে থাকে। এর গুরুত্ব এতই যে, বাংলাদেশে শুধু অর্থনীতির খবরাখবর নিয়ে আলাদা পূর্ণাঙ্গ গণমাধ্যম রয়েছে। বাংলাদেশে দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস (১৯৯৩ সালে যাত্রা শুরু), আমাদের অর্থনীতি (২০০৫), শেয়ার বিজ (২০০৮), দৈনিক বণিক বার্তা (২০১১) ও দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড (২০২০) মূলধারার দৈনিক, যা বিশেষভাবে ব্যাবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত গণমাধ্যম। এছাড়া বর্তমানে সম্প্রচারের অপেক্ষায় থাকা সিটি গ্রুপের মালিকানাধীন স্পাইস নামের একটি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলও ব্যাবসা-বাণিজ্যভিত্তিক আধেয় নিয়ে সম্প্রচারে আসবে বলে জানা যাচ্ছে। অনেকেই বলছেন, এই টিভি চ্যানেলের সম্ভাব্য নাম 'বাজার টেলিভিশন'। আর বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ব্যাবসা-বাণিজ্যসংক্রান্ত বিশেষায়িত গণমাধ্যম হলো বিজনেস উইক (১৯২৯ সালে যাত্রা শুরু), দ্য ফিন্যান্সিয়াল টাইমস (১৮৮৮, লন্ডনভিত্তিক), দ্য ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল (১৮৮৯), ডাউ জোনস নিউজওয়ারস (১৮৮২), ব্লুমবার্গ টিভি (১৯৯৪), নিউজ ডে (১৯৪৩) প্রভৃতি।

অর্থনীতি ও অর্থবিষয়ক সাংবাদিকতার আওতা

এ বিষয়ে সাংবাদিকতার বড়ো আধেয় নিত্যদিনের বাজারসদাই। অর্থাৎ, প্রতিদিনের বাজারবিষয়ক আধেয়। বাজারে ভোজ্য তেলের দাম বাড়লে বড়ো আকারে শিরোনাম হয়,

পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পেলে বড়ো বড়ো সংবাদ প্রকাশিত হতে শুরু করে, এছাড়া শীতকালীন সবজির দাম না কমলে ক্রমাগত সংবাদ হতে থাকে। এমনইভাবে মসলা থেকে শুরু করে তেল, লবণ–সবকিছুর দাম নিয়ে ব্যাবসাবাণিজ্য পাতায় সংবাদ প্রকাশিত হয়ে থাকে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, নিত্যদিনের বাজারসদাই শেষ কথা নয়। বিশ্ব অর্থনীতির বিষয়গুলোও এই ধারার সংবাদের অন্তর্ভুক্ত। কী কী বিষয়ে অর্থ ও অর্থনীতিবিষয়ক সংবাদ হতে পারে, এর একটি তালিকা দেওয়া হলো:

* নিত্যপণ্যের দাম
* ব্যাবসাবাণিজ্য
* জ্বালানি তেল ও গ্যাসের দাম
* দেশের মুদ্রাবাজার
* করনীতি বা কর কাঠামো
* শুল্ক
* শিল্পায়ন ও শিল্প-কলকারখানা (ক্ষুদ্র, মাঝারি, ভারী শিল্প)
* সরকারের বাজেট
* মহামারিকালে দেশের অর্থনীতি
* আমদানি-রপ্তানি
* ই-কমার্স
* বিশ্ববাজার বা বিশ্ব অর্থনীতি
* মুদ্রাস্ফীতি বা মূল্যস্ফীতি
* ঋণ
* ব্যাংকিং খাত
* স্টক মার্কেট
* আর্থিক অনিয়ম
* দুর্নীতি
* জালিয়াতি
* বৈদেশিক বাণিজ্য (দেশ বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে)
* বৈদেশিক মুদ্রা আয় (রেমিট্যান্স) প্রভৃতি

এছাড়া আরও অন্যান্য বিষয়ে অর্থ বা অর্থনীতিবিষয়ক সংবাদ হতে পারে। যেগুলোর আবার নানা শাখা বা বিশেষায়িত ক্ষেত্র থাকে।

অর্থনীতি ও অর্থবিষয়ক সাংবাদিকতার শুরুর কথা

সাংবাদিকতার ইতিহাস শতবছরের পুরোনো সমৃদ্ধ ইতিহাস। আর এই সমৃদ্ধ ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত ব্যাবসা-বাণিজ্যসংক্রান্ত (Business journalism) সাংবাদিকতার বিষয়টি। যার ধারাবাহিকতায় আজও সব সংবাদপত্র, সাময়িকী, রেডিয়ো, টিভি, অনলাইনমাধ্যমে ব্যাবসাবাণিজ্য নিয়ে বিশেষ একটি ভাগ বা শাখা রয়েছে। মূলত সাংবাদিকতার মধ্যযুগে ব্যাবসা-বাণিজ্যসংক্রান্ত সাংবাদিকতার প্রসার ঘটে। ইউরোপে ১৭০০ শতকে সাহিত্যিক ড্যানিয়েল ডেফো (বিখ্যাত উপন্যাস রবিনসন ক্রুসোর লেখক) ব্যাবসা-বাণিজ্যসংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশ করতে থাকেন। এরপর ১৮৮২ সালে চার্লস ডাউ (Charles Dow), এডওয়ার্ড জোনস (Edward Jones) এবং চার্লস বার্গট্রিসার (Charles Bergstresser) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ালস্ট্রিট এলাকায় বিভিন্ন ধরনের সংবাদ সরবরাহ করতে থাকেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, মানুষ সভ্যতার শুরু থেকেই ব্যাবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে সংগ্রহ করে আসছিলেন। আর সংবাদপত্র আসার আগে মানুষ জনাকীর্ণ কোনো স্থান, আড্ডাস্থল বা বিভিন্ন জনসমাগম হয় এমন জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করতেন। এরপর ১৮৮৯ সালে দ্য ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল (The Wall Street Journal: WSJ) প্রকাশিত হয়। ব্যাবসা-বাণিজ্যভিত্তিক এই সংবাদপত্রটির প্রতিষ্ঠাতা-প্রকাশক ছিলেন ওই তিন গুণী–চার্লস ডাউ, এডওয়ার্ড জোনস ও চার্লস বার্গট্রিসার। দ্য ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই ব্যাবসা-বাণিজ্যসংক্রান্ত সংবাদে এক ধরনের বিপ্লব আসে। এরপর দীর্ঘদিন বজায় ছিল। এদিকে গত শতকের নব্বইয়ের দশকে আরেকটি নতুন এক বিপ্লব আসে। ওই সময় স্টক মার্কেট ধারণাটি বিকশিত হয়েছিল। একই সঙ্গে তা সারা বিশ্বে জনপ্রিয় ও লাভজনক বিনিয়োগের জায়গা হিসাবে স্থান করে নেয়। স্টক মার্কেট চালুর পর ব্যাবসাবাণিজ্যের সংবাদ আধেয়তে বিশেষ পরিবর্তন আসে। যে পরিবর্তন গণমাধ্যমে প্রতিফলিতও হয়। সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পাশাপাশি রেডিয়ো এবং টিভিতেও স্টক মার্কেট সংক্রান্ত সংবাদ সম্প্রচারিত হতে থাকে। একই সঙ্গে টেলিভিশনের স্ক্রলে (প্রথম শুরু একুশে টিভিতে) শেয়ারবাজারের বিস্তারিত তথ্যও সরাসরি সম্প্রচারিত হতে শুরু হয়। এই পর্যায়ে বৈশ্বিক টিভি চ্যানেল সিএনএন-এর (প্রতিষ্ঠাতা টেড টার্নার, ১৯৮০ সাল) একটি ব্যাবসাভিত্তিক অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যার নাম 'Quest Means Business', যে অনুষ্ঠানের মূল সাংবাদিক হলেন রিচার্ড কোয়েস্ট (Richard Quest)। রিচার্ড কোয়েস্ট অত্যন্ত নাটকীয় ঢঙে সিএনএন-এর দর্শকদের জন্য বিশ্ব শেয়ারবাজারের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ওয়ালস্ট্রিট থেকে স্টক মার্কেটের সবশেষ সাম্প্রতিক তথ্য দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন, যা সারা বিশ্বেই বিশেষ জনপ্রিয়। এখানে আরেকজন বিশ্বখ্যাত ব্যাবসা-বাণিজ্যবিষয়ক সাংবাদিকের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি হলেন বিবিসির অ্যারন হেসলেহার্স্ট (Aaron Heslehurst)। আলোচিত এই সাংবাদিক ২০০২ সাল থেকে বিবিসিতে কাজ করছেন। অত্যন্ত নাটকীয় ঢঙে, সাবলীলভাবে তিনি ব্যাবসা-বাণিজ্যসংক্রান্ত সংবাদ উপস্থাপনা করে থাকেন। মনে রাখা প্রয়োজন, ব্যাবসা-বাণিজ্যসংক্রান্ত বিষয়গুলো খুবই নীরস। এ বিষয়গুলোয় ব্যবসায়ী ছাড়া অন্য কারও আগ্রহ থাকে না বললেই চলে। তাই অ্যারন হেসলেহার্স্ট বা রিচার্ড কোয়েস্টের মতো উপস্থাপকরা এই নীরস বিষয়কে যতটা সম্ভব আকর্ষণীয় করে উপস্থাপনা করে থাকেন।

কেমন হবেন একজন অর্থ ও ব্যাবসা-বাণিজ্যবিষয়ক প্রতিবেদক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো ডেইলি নিউজের (Chicago Daily News) সাবেক বিজনেস এডিটর জর্জ হরমন বলেছেন, 'আমি একসময় অপরাধজগৎ, পুলিশ, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে রিপোর্ট করতাম। কিন্তু অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় আসার পর দেখেছি, এ দিকটি নতুনত্বে ভরা।' (পৃ. ৪৪, অর্থনীতি সংবাদ ও সাংবাদিকতা)। জর্জ হরমনের এই কথার সঙ্গে দ্বিমত করার সুযোগ নেই। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাবসা-বাণিজ্যসংক্রান্ত সংবাদকে নীরস বলে মনে হলেও এই সংক্রান্ত সংবাদ প্রকৃতপক্ষেই নতুনত্বে ভরা। একই সঙ্গে এই সংক্রান্ত সংবাদের প্রভাবও ব্যাপক। কিন্তু কেমন হবেন একজন ব্যাবসা-বাণিজ্যসংক্রান্ত প্রতিবেদক? কী হবে তার বিশেষ গুণাবলি? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় কৌশিক ভট্টাচার্যের 'জার্নালিজমের সহজ পাঠ' (২০০৪) গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক বিষয় নিয়ে লেখার সমস্যা হলো বিষয়গুলো বেশ কঠিন ও সাধারণের বোধগম্যের অতীত। অথচ পাঠককে তা বোঝাতে হবে। সহজ-সাবলীল ভাষায় এই রিপোর্ট লিখতে হবে তত্ত্ব ও তথ্যকে অবিকৃত রেখে। এই ধরনের লেখা যে খুব সহজ নয়, তা প্রতিদিনের খবরের কাগজের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। এই ধরনের খবরের চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছে।' (পৃ. ৮৯, জার্নালিজমের সহজ পাঠ)। কৌশিক ভট্টাচার্যের এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত না হয়ে উপায় নেই। অর্থ ও অর্থনীতিবিষয়ক বিষয়গুলো যে

কঠিন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই তথ্য অবিকৃত রেখে সংবাদ পরিবেশন করা বেশ কঠিন। আর এই কাজ করতে হলে একজন প্রতিবেদককে বিশেষ গুণাবলির অধিকারী হতে হয়। কৌশিক ভট্টাচার্যের পরামর্শ অনুযায়ী, এই বিটের একজন সাংবাদিককে অর্থনীতিতে স্নাতক হওয়া ভালো। অর্থনীতি ও বাণিজ্য সম্পর্কে এই বিটের সাংবাদিককে অবশ্যই দক্ষ হতে হবে। আর বিশেষ করে সহজ ও বোধগম্য করে সংবাদ লেখায় পারদর্শী হতে হবে। কৌশিক ভট্টাচার্য আরও লিখেছেন, 'ভারতে অবশ্য সাংবাদিকতা পেশায় অনেক অর্থনীতির ছাত্রই যুক্ত আছেন। তাই আমাদের দেশে ভালো বিজনেস বা ইকোনমিক করেসপনডেন্টের অভাব নেই। দেশের ও বিশ্বের অর্থনীতির বিশ্লেষণ সহজবোধ্য আকারে পরিবেশন করার মধ্যেই রয়েছে এই প্রতিবেদকের সার্থকতা।' (পৃ. ৯০, জার্নালিজমের সহজ পাঠ)।

কেমন হবেন একজন অর্থনীতিবিষয়ক সংবাদের প্রতিবেদক, এই আলোচনায় The Complete Reporter (1977) বই থেকে একটু আলোচনার দাবি থেকে যায়। রিপোর্টিংয়ে The Complete Reporter (1977) বইটি একটি মৌলিক গ্রন্থ। যাতে জুলিয়ান হ্যারিস (Julian Harriss), কেলি লেইটার (Kelly Leiter) ও স্ট্যানলি জনসন (Stanley Johnson) বিস্তারিতভাবে একজন প্রতিবেদকের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাতে তারা উল্লেখ করেছেন, যে কোনো বিটের একজন আদর্শ প্রতিবেদককে নিচের উল্লিখিত গুণাবলির অধিকারী হতে হবে। এগুলো হলো:

* লেখার ইচ্ছা ও সামর্থ্য (Desire and ability to write)
* অদম্য আগ্রহ (Insatiable Curiosity)
* মানিয়ে নিতে পারে এমন সামাজিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী (Flexiable and sociable personality)
* কঠিন চাপের মুখে কাজ করার সামর্থ্য (Temperament to work under pressure)

The Complete Reporter (1977) গ্রন্থের সাত নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা এই গুণাবলির সঙ্গে বাণিজ্য শাখায় উচ্চতর শিক্ষা থাকলে একজন ব্যক্তি যথাযথ অর্থনীতি ও ব্যাবসা-বাণিজ্যবিষয়ক প্রতিবেদক হিসাবে নিজেকে সহজেই প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

তথ্যসূত্র

* How To Write News For Broadcast and Print Media (1973). David Dary. TAB BOOKS: USA.
* The Complete Reporter (1977), Julian Harriss, Kelly Leiter, Stanley Johnson, New York: MACMILLAN PUBLISHING CO., INC.
* সাংবাদিকতা (১৯৯৭), খ. আলী আর রাজী, মঞ্জুরুল ইসলাম, নাঈমুল ইসলাম খান। ঢাকা: বিসিডিজেসি।
* অর্থনীতি সংবাদ ও সাংবাদিকতা (২০০৪), অজয় দাশগুপ্ত। ঢাকা: বিসিডিজেসি।
* জার্নালিজমের সহজ পাঠ (২০০৪), কৌশিক ভট্টাচার্য। কলকাতা: পারুল।
* https://en.wikipedia.org/wiki/Business_journalism#:~:text=Business%20journalism%20is%20the%20part,that%20take%20place%20in%20societies.&text=This%20area%20of%20journalism%20provides,related%20to%20the%20business%20sector.

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

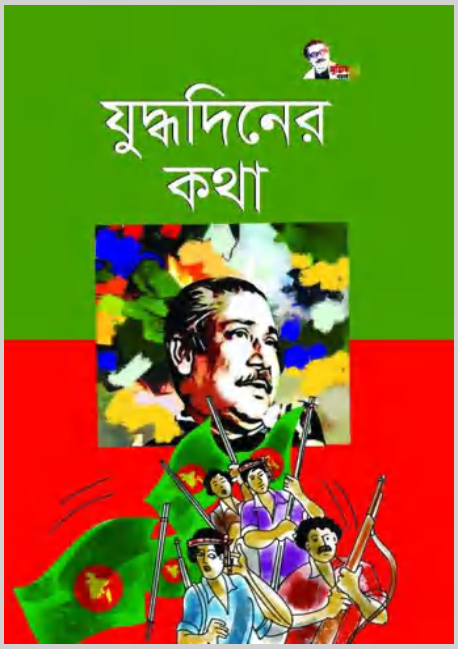

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

প্রবন্ধ

অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় প্রতিবেদন তৈরির কৌশল

আবুজার

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি ও প্রসারের সঙ্গে প্রায় সমান্তরালভাবেই অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা করার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। সারা বিশ্বে এটি একটি প্রতিষ্ঠিত বিষয়। যে দেশের অর্থনীতির আকার বড়ো বা যে দেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড উচ্চস্তরের, সে দেশে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার ব্যাপ্তিও বিশাল (সাদী, ২০১১)। অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা হচ্ছে, সাংবাদিকতার এমন একটি শাখা, যা অর্থনৈতিক, ব্যবসায় ও আর্থিক কার্যক্রমের খোঁজখবর দেয়। ঘটনা প্রবাহের বিশ্লেষণ করে থাকে। সেটা হতে পারে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় পরিসরে। বিশ্বপরিসরে হওয়ারও সুযোগ থাকে (খান, ২০১৯)। যেখানেই অর্থনৈতিক কার্যক্রম, সেখানেই সংবাদ। প্রতিটি মানুষকে জীবন-জীবিকার জন্য অর্থকড়ি লেনদেন করতে হয়–মুদি দোকান থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কেনাকাটা, গ্যাস-পানি-বিদ্যুতের বিল পরিশোধ, বাসে ভাড়া গোনা, আয়কর রিটার্ন দাখিল বা মোবাইল ফোনে রিচার্জ করা; নগদ, বিকাশ বা রকেটের মতো মোবাইল ব্যাংকিংয়ের সুবিধা কাজে লাগিয়ে অর্থ পাঠানো–এগুলো সবই অর্থনৈতিক বিষয়। এমনকি অবকাঠামো উন্নয়ন অর্থাৎ সড়ক, বন্দর, সেতু নির্মাণ, গ্যাসের সংযোগ, বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ, এগুলোও অর্থনীতির কার্যক্রমে জড়িয়ে আছে (আলম, ২০১৪)। অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার পরিধি বেশ বড়ো, এর ক্যানভাস অনেকদূর বিস্তৃত। কেবল আর্থিক বা বাণিজ্যিক বিষয়াদি নয়, এর সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন পেশা ও শ্রম, বাজেট ও উদ্যোগ, ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, আর্থিক লেনদেন, ব্যাংক, বিমা, শেয়ারবাজার, পণ্য বাজারজাতকরণ ও বিপণন, বাজারদর, পাইকারি ও খুচরা বিক্রি, করপোরেট অর্থায়ন; অর্থাৎ বড়ো শিল্প-কারখানা থেকে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প কিংবা কারখানার শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের মতো নানাবিধ বিষয় এর সঙ্গে সম্পর্কিত (রহমান, ২০১৪)।

এত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিশ শতকের শুরুর দশক পর্যন্ত সাংবাদিকতাচর্চায় অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার বিষয়টি কমই মনোযোগ পেয়েছে। বাংলাদেশও ব্যতিক্রম নয়। বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকতায় মূল আগ্রহের বিষয় ছিল তখন রাজনীতি, সাহিত্য ও পাবলিক অ্যাফেয়ার্স (খান, ২০১৯)। বেসরকারি উদ্যোগের খবর সংবাদমাধ্যমে স্থান পেত না বললেই চলে। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো পুঁজিবাদী দেশের সংবাদমাধ্যমে শ্রমিক সংগঠনের কোনো খবর থাকত না। আর থাকলেও তাদের অবস্থান থাকত প্রান্তিক পর্যায়ে; শ্রমিক স্বার্থ-দাবির খবর সংবাদমাধ্যমে

এমনভাবে উপস্থাপন করা হতো যে, শ্রমিক সংগঠন ও তাদের নেতাদের মনোভঙ্গি ছিল শত্রুভাবাপন্ন। দুটি মহাযুদ্ধের পর এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি, অর্থনৈতিক মন্দা আর বড়ো বড়ো শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি হয়; এসবের কারণে বিশ্বব্যাপী এমন ধারণা তৈরি হয় যে, বিজনেস ইজ এভরিবডিজ বিজনেস; যেমন তা মালিকের, তেমনই তা শ্রমিকের, ম্যানেজার ও কর্মচারীর, পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি থেকে করপোরেট প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার–সবার জন্যই বিজনেস প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে (Jacobini, 2008)। বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পরের ১০ বছরেও অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা আগের মতোই সীমাবদ্ধ ছিল। সেই সময়টা ছিল প্রধানত পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভঙ্গুর ছিল এবং এই অবস্থা থেকে উত্তরণের আগে, স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, যা অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা প্রসারে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারত, অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা পরিস্ফুট হতে পারেনি এবং প্রসার লাভ করেনি। তবে দেশে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসতে শুরু করে আশির দশকের প্রথমার্ধ থেকে। সেই সময় দেশের অর্থনীতিকে খুলে দেওয়া হয় অর্থাৎ ওপেন করে দেওয়া হয় নীতিগত পরিবর্তন এনে (হোসেন, ২০২২)।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকের প্রথমার্ধ থেকে নতুন টেলিভিশন চ্যানেল সাংবাদিকতার কর্মক্ষেত্রে বা ডোমেনে আসতে শুরু করে এবং তারাও অর্থনৈতিক সংবাদকে গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করতে থাকে, যা এখনো অব্যাহত আছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দেশজুড়েই চলছে (সাদী, ২০১১)। অর্থনীতির সব খাত ও উপখাতে কর্মকাণ্ড পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার সুযোগ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে প্রচুর অর্থনৈতিক রিপোর্ট বা প্রতিবেদন প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় আসছে। বহু দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা এবং অনলাইন মাধ্যম প্রায় সম্পূর্ণভাবেই অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় নিজেদের নিবেদিত করেছে। টেলিভিশন চ্যানেলগুলো বেশি পরিমাণে অর্থনৈতিক রিপোর্ট প্রচার করে। শুধু অর্থনৈতিক সংবাদের ওপর ভিত্তি করে প্রকাশিত দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক এবং অনলাইন মাধ্যমের সংখ্যা সঠিকভাবে জানা যায় না (হোসেন, ২০২১)। এভাবে দিনদিন অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এসব দিক বিবেচনা করে বর্তমান প্রবন্ধে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা করার কিছু বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা

অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা হলো একটি ভিন্ন ধরনের সাংবাদিকতা, যা শুধু অর্থনৈতিক, আর্থিক ও ব্যাবসাসহ অন্য ঘটনাগুলো সম্পর্কেই অবহিত করে না, বরং অর্থনৈতিক বাস্তবতার ধ্রুবক রূপান্তরের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়–এমন অর্থনৈতিক বিষয়, যেগুলোতে নতুন পরিবর্তনশীলতায় ধারাবাহিক ঘটনাবলির উদ্ভাবন হয় এবং সেগুলোর অবিচ্ছিন্ন সংযোগকেও প্রতিফলিত করে (Kucinski, 1996)। বলা হয়, অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা হলো সাংবাদিকতার একটি শাখা, যা একটি সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনগুলো বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করে। আর অর্থনৈতিক তথ্য ও গল্পগুলো সর্বদা জনগণের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ছিল; কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে শুধু উচ্চস্তরের সরকারি কর্মকর্তা, উপদেষ্টা বা ধনীরা সময়োপযোগী অর্থনৈতিক খবর এবং ডেটা অ্যাক্সেস করতে পেরেছিলেন। এটি সত্যিই যে, ২০ বছরে এই ধারার পরিবর্তন হয়েছে। যেখানে নাগরিকদের সময়মতো অর্থনৈতিক ডেটা/তথ্য এবং অর্থনৈতিক সংবাদের অ্যাক্সেস রয়েছে, যার লক্ষ্য এমনভাবে ডেটা বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করা যাতে সব নাগরিক বুঝতে এবং ব্যবহার করতে পারে (Kazem, 2013)। অর্থনৈতিক তথ্য এবং সংবাদগল্পগুলো লোককে তাদের দেশে বা শহরে কী ঘটছে, তা বুঝতে সাহায্য করে। এই তথ্য লোকদের, তারা কোথায় থাকবে, কাজ করবে এবং তাদের পরিবারকে বড়ো করবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। যে সাংবাদিকরা রাজনীতি এবং সরকার কাভার করে তাদের যেমন সরকারি কর্মকর্তাদের তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করার কথা এবং সত্য খুঁজে বের করে জনগণের কাছে রিপোর্ট করার দায়িত্ব রয়েছে, তেমনই অর্থনৈতিক সাংবাদিকদেরও একই দায়িত্ব রয়েছে। অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা শাখাকে আরও বিটে ভাগ করা যায়–এক. কোম্পানিগুলো কাভার করে এবং অন্যটি বিট, যা সাধারণ অর্থনীতিকে কাভার করে (Welles, 2003)। অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা সাধারণত সাংবাদিকতার একটি বড়ো বিষয়, তবে তথ্য এবং শিক্ষার উপাদানগুলোকে আরও ভালোভাবে সংগঠিত করার জন্য এই বিটের জন্য দুটি মডিউল আছে। একটিকে বলা হয় কাভারিং কোম্পানি এবং আরেকটিকে বলা হয় কাভারিং দ্য ব্রড ইকোনমি (Kazem, 2013)। সামগ্রিকভাবে, অর্থনৈতিক সাংবাদিকতাকে 'অর্থনীতি এবং আর্থিক খাতের সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্য এবং বিষয়গুলোর প্রচার' (Quintao, 1987, p. 25) হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিডিয়া পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা দেশের অর্থনৈতিক ঘটনার ধারাবাহিকতা এবং এসব ঘটনার মধ্যে সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত।

অর্থনৈতিক সংবাদের বিষয়

অর্থনৈতিক সংবাদবিষয়ক গল্প, ক্ষেত্র বা বিটগুলোর একটি সংগঠিত বিভাগ, যা সম্পাদক এবং রিপোর্টারদের গল্প ও উৎসগুলোর ট্র্যাক রাখতে সাহায্য করতে পারে। এখানে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার প্রধান সংবাদ উৎপাদনকারী খাতগুলোর একটি তালিকা রয়েছে। খাতগুলোর মধ্যে রয়েছে: সামষ্টিক অর্থনীতি, ব্যষ্টিক অর্থনীতি, আর্থিক নীতি, রাজস্ব নীতি, অর্থনৈতিক সূচক, জিডিপি–মোট দেশীয় পণ্য, CPI-ভোক্তা মূল্য সূচক, মুদ্রাস্ফীতি, সরকারি ব্যয়, বাজেট, ঋণ, আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থা (বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ), শ্রম ও কর্মসংস্থান, বিদেশি বিনিয়োগ, বাণিজ্য বেসরকারীকরণ, অবকাঠামো নির্মাণ, ট্যাক্স, মুদ্রানীতি, ভর্তুকি এবং বেলআউট রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগ ইত্যাদি (Kazem, 2013)। একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক গল্প সর্বদা মানুষের উপাদান দেখাবে। প্রায়ই শুরু হওয়া অর্থনৈতিক রিপোর্টাররা একটি অর্থনৈতিক গল্পের সংখ্যা এবং প্রযুক্তিগত তথ্যের ওপর এত বেশি ফোকাস করে যে তারা এই পরিবর্তনগুলো কীভাবে দৈনন্দিন মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে তা অন্তর্ভুক্ত করতে ভুলে যায়, যা সংবাদগল্প বাছাই করার সময়ে প্রতিবেদককে এই বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে।

অর্থনৈতিক সংবাদের কাভার

অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা করার ক্ষেত্রে কোনো পূর্বজ্ঞান অনুমান করা হয় না। অর্থনৈতিক বিট যে কোনো সাংবাদিকের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটি প্রধান ঘটনা এবং ঘটনা সম্পর্কে রিপোর্ট করে, যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে যেমন: দ্রব্যমূল্য, সুদের হার, বাণিজ্য, বেকারত্ব, মজুরি, সরকারি ব্যয়, কর প্রভৃতি। এটা ব্যাবসা বিট না; ব্যাবসায়িক সাংবাদিকরা কোম্পানির কার্যকলাপ, আর্থিক ফলাফল প্রভৃতির রিপোর্ট করলেও অর্থনীতির সাংবাদিক অনেক বিস্তৃত দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করে (Welles, 2003)। অর্থনৈতিক প্রতিবেদনে ব্যাবসা, ভোক্তা এবং ব্যাপকভাবে জনসাধারণের ওপর অর্থনৈতিক কার্যকলাপের প্রভাব কাভার করে। অর্থনীতির সাংবাদিকদের যাদের আনুষ্ঠানিক অর্থনীতি প্রশিক্ষণ নেই, তারাও এখানে অর্থনীতির বিট কাভার করার জন্য একটি

দুর্দান্ত কাজ করতে পারে। উন্নত অর্থনীতি এবং পরিসংখ্যানের ঘন কারিগরিতা এড়িয়ে তারা বাস্তব জগতের জন্য তথ্য ব্যাখ্যা করে, সাধারণ শ্রোতাদের জন্য ডেটা তৈরি এবং ব্যাখ্যা করতে পারে (খান, ২০১৯)। আবার তারা একটি দেশের অর্থনীতির গল্প ও অর্থনৈতিক সূচক দ্বারা যা বলা হয় এবং এ সম্পর্কে পরিসংখ্যানবিদরা তথ্য সংগ্রহ করে যা বলেন, সেই বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন।

অর্থনৈতিক গল্পগুলোয় সংখ্যা এবং নির্দিষ্ট ডেটা গুরুত্বপূর্ণ। একজন ভালো প্রতিবেদক সর্বদা কে, কী, কোথায়, কখন, কেন, এবং কীভাবে প্রাথমিক প্রশ্ন দিয়ে শুরু করেন (এটি 5Ws এবং 1H নামেও পরিচিত)। যাই হোক, একজন অর্থনৈতিক প্রতিবেদক এই প্রশ্নগুলোকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান এবং 'কত' ও 'কতটি' জিজ্ঞাসা করেন। সফল অর্থনৈতিক প্রতিবেদকরা কীভাবে প্রশ্ন করতে ভয় পান না অনেক জিনিসের দাম, টাকা কোথা থেকে আসছে এবং কার কাছে যাচ্ছে? একটি নতুন কর নীতির গল্প, উদাহরণস্বরূপ, নতুন করের নীতি কাকে প্রভাবিত করে, কর কতটা বাড়বে বা কমবে, কর রাজস্বে সরকার কতটা লাভ বা হারাবে এবং কীভাবে অতিরিক্ত রাজস্ব ব্যবহার করা হবে, তা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; অন্যথায়, গল্প হয় অসম্পূর্ণ। অন্য একটি উদাহরণ হিসাবে: যদি ভোক্তা মূল্য সূচকের জন্য নতুন ডেটা প্রকাশিত হয়, তবে অর্থনৈতিক সাংবাদিককে অবশ্যই দেখতে হবে যে এই ডেটা গড় ভোক্তা সম্পর্কে কী বলে, কোন পণ্যগুলোর দামের সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন হয়েছে এবং ব্যবসায় বা অন্যান্য খাতের কারণ যা দামের পরিবর্তনকে প্রভাবিত করেছে। আবারও সফল অর্থনৈতিক সাংবাদিকরা জিনিসের দাম কত, তা জিজ্ঞাসা করতে ভয় পান না, আর টাকা কোথা থেকে আসছে এবং কার কাছে যাচ্ছে এই প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করেন (Jacobini, 2008)। এভাবে অর্থনীতির সাংবাদিকরা অর্থনীতির বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে কিছু জানবেন এবং আকর্ষণীয় সংবাদগল্পগুলো রিপোর্ট করবেন।

> অর্থনৈতিক তথ্য ও গল্পগুলো সর্বদা জনগণের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ছিল; কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে শুধু উচ্চস্তরের সরকারি কর্মকর্তা, উপদেষ্টা বা ধনীরা সময়োপযোগী অর্থনৈতিক খবর এবং ডেটা অ্যাক্সেস করতে পেরেছিলেন

অর্থনৈতিক প্রতিবেদন তৈরির কৌশল

সাংবাদিকতার অন্য ক্ষেত্রগুলো থেকে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা কিছুটা আলাদা। এ ধরনের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সতর্কতা অনেক বেশি জরুরি। সাংবাদিকদের ভালো অর্থনৈতিক প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম, সুন্দর এবং সাবলীল উপস্থাপন কৌশল ও প্রচুর চিন্তাভাবনা করতে হয়। অর্থনৈতিক প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে বিবিসির বিজনেস এডিটর রবার্ট পেস্টন ১০টি (দশ) কৌশল প্রদান করেন (Robert Peston. 13 May 2009)। আর এই কৌশলগুলো অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

১. নিজেকে জিজ্ঞাসা করা: অর্থনীতি বিষয়টা লাখ লাখ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। এজন্য একজন প্রতিবেদককে অবশ্যই বুঝতে হবে কেন মুদ্রাস্ফীতির হারে পরিবর্তন বা একটি কোম্পানির দ্বারা করা একটি বড়ো ক্ষতি বা স্টক মার্কেটে একটি বড়ো আন্দোলন আসলেই কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

২. অর্থনৈতিক সংবাদে জারগন বা বিশিষ্টার্থক শব্দ পরিহার করতে হবে: অর্থনৈতিক প্রতিবেদন লেখার সময় সাংবাদিককে মনে রাখতে হবে এর পাঠক শিক্ষিত থেকে শুরু করে অর্ধশিক্ষিত সাধারণ মানুষ। আর এ প্রতিবেদন সীমাবদ্ধ পাঠকশ্রেণির জন্য নয়। তাই প্রতিবেদনে জারগন বা বিশিষ্টার্থক শব্দ ব্যবহার করলে পাঠক প্রতিবেদনটি যেমন বুঝতে পারবে না, পাশাপাশি বিরক্তও হতে পারে। আর মনে রাখতে হবে জারগন ব্যবহার করবেন বিশেষজ্ঞরা, যখন তারা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলবেন।

৩. যা জানেন এবং জানেন না সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা: একজন প্রতিবেদক যখন কোনো অর্থনীতির বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার নিবেন সেক্ষেত্রে প্রথমেই তাকে উপস্থাপন করতে হবে এবং কোন বিষয়ে সাক্ষাৎকার নিবেন সেই বিষয়ে পরিপূর্ণ ধারণা প্রদান করবেন। এতে বিষয়টি সম্পর্কে তার জানা ও সাক্ষাৎকারদাতার মধ্যে একটি সদ্ভাব গড়ে ওঠবে। ফলে বিষয়টির সঠিক তথ্য প্রতিবেদনে তুলে ধরা সম্ভব হবে।

৪. অর্থনীতির বড়ো প্রবণতাগুলো চিহ্নিত করা: সারা বিশ্বে অর্থনীতির জন্য নতুন রূপ দিচ্ছে কিছু দীর্ঘমেয়াদি যেমন, চীনা ও ভারতীয় অর্থনীতির উত্থান। কিছু স্বল্পমেয়াদি যেমন, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ঋণ গ্রহণের বিস্ফোরক বৃদ্ধি। যখন একজন প্রতিবেদকের এই প্রবণতা সম্পর্কে ধারণা থাকবে, তখন তিনি অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ

গল্পগুলো কোথায় খুঁজে পাবেন, তা জানতে পারবেন ও নিজের অর্থনীতির গল্পগুলোর উপস্থাপনায় প্রসঙ্গ এবং ভারসাম্য প্রদান করতে সক্ষম হবেন। যুক্তরাজ্য, চীনা এবং ভারতীয় অর্থনীতির উত্থান আমাদের জন্য কীভাবে প্রাসঙ্গিক হতে পারে, সে সম্পর্কে চিন্তা করে নিজেকে পরীক্ষা করে নিবেন।

৫. ভালো সাক্ষাৎকার গ্রহণ ক্ষমতা: অর্থনীতির বিষয়ে বিশেষ করে বৈশ্বিক অর্থনীতির সঙ্গে জাতীয় অর্থনীতির সমন্বয় করে তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে–এমন ব্যক্তি থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে হবে। আর এক্ষেত্রে নিজেকে সেভাবে বিষয়টি সম্পর্কে প্রস্তুতি নিয়ে ভালো সাক্ষাৎকার গ্রহণের সক্ষম হয়ে উঠতে হবে। যারা অর্থনীতি সম্পর্কে ভালো জানেন, তাদের শনাক্ত করা কঠোর পরিশ্রমের কাজ। আর সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় তাদের আস্থা জয় করার চেষ্টা করা, যাতে তারা তাদের কিছু মূল্যবান জ্ঞান আপনার সঙ্গে শেয়ার করতে পারে।

একটি অর্থনৈতিক প্রতিবেদনে সাংবাদিকদের যথেষ্ট পরিশ্রম করে, বাস্তবতার একটি যুক্তিসংগত অনুমান নিয়ে আসতে হয়। সাংবাদিকদের অর্থনীতির তথ্য একমুখী না করে বরং যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণের প্রাধান্য দিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হয়

৬. কিছু পটভূমি গবেষণা করতে হবে: বিবিসির নিউজ ওয়েবসাইটসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাদের সমতুল্য অর্থনৈতিক ও ব্যাবসায়িক পৃষ্ঠাগুলো পড়া। যাতে বৈশ্বিক ও জাতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যায়।

৭. স্রোতে না ভাসা: গণমাধ্যম কি আবেশ করছে, সে সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে, তবে নিজের কাজটি করতে হবে। সব প্রতিবন্ধকতা পরিহার করে ভিড় থেকে দাঁড়ানোর সাহস রাখতে হবে আর এক্ষেত্রে অন্যান্য গণমাধ্যমের অর্থনৈতিক প্রতিবেদকের করা অর্থনীতির কিছু প্রতিবেদন দেখুন।

৮. কিছু গণিত করা: যখন একজন প্রতিবেদক অর্থনৈতিক প্রতিবেদন করে কিছুটা অভিজ্ঞতা এবং আত্মবিশ্বাস পাবে, তখন অফিশিয়াল অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান বা কোম্পানিগুলোর ঘোষণা থেকে ডেটা নিতে সক্ষম হবে এবং কিছু সহজ সমষ্টি করতে পারবে, যা তার জন্য দরকারি বিষয় মনে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একটি এলাকার অর্থনীতি ক্রমবর্ধমান হতে পারে এবং এটি একটি মহান সাফল্য হিসাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। কিন্তু প্রতিবেদক যদি দেখেন যে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বাড়ছে, তাতে একটি সাধারণ বিভাজন বলে দেবে সাধারণ মানুষ প্রকৃতপক্ষে আরও দরিদ্র হচ্ছে, ধনী নয়, যা সাফল্যের দাবিকে দুর্বল করে দিচ্ছে।

৯. জাতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে জানা: একজন প্রতিবেদক হিসাবে শুরু করার একটি ভালো জায়গা হলো দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে মূল্যায়ন করা। দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ বয়স্ক ও প্রাপ্তবয়স্করা কীভাবে জীবিকানির্বাহ করছে তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে।

১০. অর্থনীতি বিষয়কে গ্রহণ করা: অনেকে বলে অর্থনীতি বিষয়টা বিরক্তিকর। একজন প্রতিবেদকের এমন মানসিকতা পরিহার করতে হবে। যারা অর্থনীতিকে বিরক্তিকর ভাবে, তাদের কোনো ধারণা নেই পৃথিবী কীভাবে চলে, তা বোঝার কোনো আগ্রহও তাদের নেই।

সর্বোপরি বলা যায়, অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা সহজ বলে মনে হতে পারে, কারণ অর্থনীতিবিদরা সাধারণত গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিতে আগ্রহী হন। জিজ্ঞাসার জন্য প্রচুর অর্থনৈতিক তথ্য এবং অধ্যয়ন পাওয়া যায়। কিন্তু অর্থনীতিবিদরা একে অপরের সঙ্গে একমত না হওয়ার এবং এক মুহূর্ত থেকে পরের মুহূর্তে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার প্রবণতার জন্য কুখ্যাত। আবার অর্থনৈতিক ডেটা আর সহায়ক নয়: একই পরিসংখ্যান প্রায়ই দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাখ্যাকে প্রমাণ করতে ব্যবহার করতে হয়। একটি অর্থনীতির সংবাদ প্রতিবেদন করার সময়, যে অসংখ্য অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর একটি নির্দিষ্ট উত্তর নিয়ে আসা কার্যত অসম্ভব। একটি অর্থনৈতিক প্রতিবেদনে সাংবাদিকদের যথেষ্ট পরিশ্রম করে, বাস্তবতার একটি যুক্তিসংগত অনুমান নিয়ে আসতে হয়। সাংবাদিকদের অর্থনীতির তথ্য একমুখী না করে বরং যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণের প্রাধান্য দিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হয়। অর্থনৈতিক প্রতিবেদনের জন্য সাংবাদিকদের অবশ্যই ক্ষেত্রের জটিলতাগুলো বুঝতে এবং সেগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত, বোধগম্য গদ্যে লিখতে সক্ষম হতে হবে। যেহেতু অর্থনীতি মানুষের জীবনকে স্পর্শ করে, তাই প্রতিবেদনে সাংবাদিকদের ওপর নির্ভুলতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য প্রকাশের দাবি রাখে।

তথ্যসূত্র

* অজয় দাশগুপ্ত ও রোবায়েত ফেরদৌস (সম্পাদিত), *'ব্যবসায় সাংবাদিকতা'* শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা।
* আনোয়ার সাদী (২০১১), *'ব্যবসায় সাংবাদিকতা: করার আছে কিছু'* মিডিয়া ওয়াচ।
* সাজ্জাদ আলম খান, *'অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় নৈতিকতা'*
* মনোয়ার হোসেন (২০২২), *'দেশে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার বিস্তার'*
* পিএম ড. শামসুল আলম (২০১৪), *'ব্যবসা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকার বিবর্তন'*
* Maria Lucia Jacobini (2013) 'Economic journalism and the conception of market'
* Kucinski Bernardo (1996) *'Jornalism Economic'* Sao Paulo: Edusp
* Chris Welles (2003) 'Economics and Business Reporting'
* Halima Kazem (2013) *'Business and Economic Reporting Covering the Broad Economy'*

লেখক: প্রভাষক, যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অধ্যয়ন বিভাগ
নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী

দেশে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার বিস্তার

মনোয়ার হোসেন

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি ও প্রসারের সঙ্গে প্রায় সমান্তরালভাবেই অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা করার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। বিশ্বে এটি একটি প্রতিষ্ঠিত বিষয়। যে দেশের অর্থনীতির আকার বড়ো বা যে দেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড উচ্চস্তরের, সে দেশে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার ব্যাপ্তিও বিশাল। শিল্পোন্নত দেশগুলোয় অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা এ কারণেই প্রসার এবং সেই সঙ্গে গভীরতা লাভ করেছে। এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকার অর্থনৈতিক সংবাদ, তা সে যে মাধ্যমেই হোক না কেন, পাঠ ও পর্যালোচনা করলে চিত্রটি পরিষ্কারভাবে ভেসে ওঠে। আবার যে দেশের অর্থনীতি আকারে ছোটো এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিসর ছোটো, সেসব দেশে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতাও স্বল্প পরিসরে সীমাবদ্ধ। সেসব দেশের সংবাদমাধ্যমের দিকে নজর দিলে তা বোঝা যায়।

আমাদের দেশ যখন পাকিস্তানের একটি প্রদেশ ছিল, তখন এখানে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ছিল সীমিত পরিসরের। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বলতে ছিল পাটশিল্প, চাশিল্প ও অন্যান্য ছোটোখাটো শিল্প থেকে উৎপাদন এবং সেগুলো বিপণন। বস্তুত শিল্প বা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসংক্রান্ত সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হতো করাচি বা ইসলামাবাদ থেকে। নীতিবিষয়ক সবকিছুর সিদ্ধান্ত হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। যে কারণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ছিল সীমিত আকারের। একই কারণে এই প্রদেশে অর্থনৈতিক সংবাদ সৃষ্টি হতো খুবই কম। শুধু ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় অবস্থিত শিল্পকেন্দ্র এবং সিলেটের চা উৎপাদনসংক্রান্ত কর্মকাণ্ড থেকে সৃষ্ট সংবাদ কোনোভাবেই অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার বৃদ্ধির জন্য বা তা প্রসারের জন্য যথেষ্ট ছিল না। ফলে তৎকালীন যে কয়েকটি সংবাদপত্র এই প্রদেশ থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হতো, সেগুলোয় অর্থনৈতিক সংবাদ উল্লেখযোগ্য স্থান পেত না। নারায়ণগঞ্জ, দৌলতপুর ও চট্টগ্রামে পাট ও চা-সংক্রান্ত যে দৈনন্দিন ব্যাবসায়িক কর্মকাণ্ড হতো, সেগুলো খুব সীমিত আকারে ছাপা হতো। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ নিয়মিতভাবে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করলেও তা খুবই সীমিতসংখ্যক বিনিয়োগকারীর উৎসাহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সংক্ষেপে এই ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের চিত্র।

কৃষি বর্তমানের মতো তখনও প্রধান কর্মকাণ্ড ছিল অর্থনৈতিক দিক থেকে। তবে তা স্বাভাবিকভাবে যতখানি গুরুত্ব পাওয়ার প্রয়োজন ছিল, ততখানি অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় পায়নি। তবে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য হিসাবে তেল, চিনি, লবণ, পেঁয়াজসংক্রান্ত সংবাদ পত্রিকায়

স্থান পেত। তবে সেসব সংবাদ সাধারণ সংবাদ হিসাবে পত্রস্থ হতো এবং সেগুলো দাখিল করতেন সাধারণ রিপোর্টাররাই। কোনো বিশেষায়িত রিপোর্টার বাজার দরদামের ওপর রিপোর্ট করতেন না। সরাসরিভাবে বলা যেতে পারে, তৎকালীন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সীমানা খুবই ছোটো হওয়ার কারণে শুধু অর্থনৈতিক বিষয়ের ওপর বিশেষ রিপোর্ট হতো না। সুযোগও ছিল না। তবে দু-একটি পত্রিকায় অর্থনীতির ছোটোখাটো বিষয়ের ওপর কোনো কোনো রিপোর্টার রিপোর্ট করতেন পত্রিকা কর্তৃপক্ষ দ্বারা আদিষ্ট হয়ে।

স্বাধীন বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পরের ১০ বছরেও অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা আগের মতোই সীমাবদ্ধ ছিল একই কারণে। সেই সময়টা ছিল প্রধানত পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভঙ্গুর ছিল এবং এই অবস্থা থেকে উত্তরণের পূর্বে, স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, যা অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা প্রসারে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারত, অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা পরিস্ফুট হতে পারেনি এবং প্রসার লাভ করেনি। তবে দেশে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসতে শুরু করে আশির দশকের প্রথমার্ধ থেকে। সেই সময় দেশের অর্থনীতিকে খুলে দেওয়া হয় অর্থাৎ ওপেন করে দেওয়া হয় নীতিগত পরিবর্তন এনে। ফলে ব্যক্তি পুঁজি খাটানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়। আমদানি ও রপ্তানি দুটিই বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিনিয়োগ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উদ্যোক্তরা বিনিয়োগ শুরু করেন। সরকারও ক্রমাগতভাবে সহায়তা দিতে থাকে। নতুন কলকারখানা সৃষ্টি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন শুরু হয়। ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের চিত্র পালটাতে থাকে। সেই সঙ্গে অর্থনীতির প্রতিটি খাত-উপখাতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। একটু ধীরে হলেও ক্রমাগতভাবে অর্থনৈতিক রিপোর্টের পরিসীমা বাড়তে থাকে।

উদ্যমশীল, মেধাসমৃদ্ধ যুবকরা অর্থনৈতিক রিপোর্টার হিসাবে তাদের কর্মকাণ্ড শুরু করেন। দেখতে দেখতে শুধু অর্থনৈতিক বিষয়ের ওপর পত্রিকা প্রকাশ হতে শুরু করে। আগে থেকেই বিদ্যমান পত্রিকাগুলো অর্থনৈতিক বিষয়ের ওপর জোর দিতে শুরু করে। ফলে যেসব পত্রিকায় আগে অর্থনীতিসংক্রান্ত রিপোর্ট তেমন গুরুত্ব পেত না, সেসব পত্রিকায় অর্থনৈতিক রিপোর্ট ভালোভাবে স্থান পেতে থাকে। অর্থনৈতিক রিপোর্ট তৈরিতে প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সেই সঙ্গে অধিকতর সংখ্যায় নতুন নতুন রিপোর্টার তৈরি হয়। এই অবস্থার আরও উন্নত হয় পরবর্তী বছরগুলোয়। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকের প্রথমার্ধ থেকে নতুন টেলিভিশন চ্যানেল সাংবাদিকতার কর্মক্ষেত্রে বা ডোমেনে আসতে শুরু করে এবং তারাও অর্থনৈতিক সংবাদকে গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করতে থাকে, যা এখনো অব্যাহত আছে। এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে, বর্তমানে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় যে ব্যাপ্তি বা প্রসার ঘটেছে, তা হয়েছে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রসারের ফলেই।

বর্তমানে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দেশজুড়েই চলছে। অর্থনীতির সব খাত ও উপখাতে কর্মকাণ্ড পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার সুযোগ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে প্রচুর অর্থনৈতিক রিপোর্ট বা প্রতিবেদন প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় আসছে। বহু দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা এবং অনলাইনমাধ্যম প্রায় সম্পূর্ণভাবেই অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় নিজেদের নিবেদিত করেছে। টেলিভিশন চ্যানেলগুলো বেশি পরিমাণে অর্থনৈতিক রিপোর্ট প্রচার করে। শুধু অর্থনৈতিক সংবাদের ওপর ভিত্তি করে প্রকাশিত দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও অনলাইনমাধ্যমের সংখ্যা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে তাদের সংখ্যা যে প্রচুর, এ বিষয়ে কোনো মহলেই দ্বিমত নেই। জানামতে, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ বা ক্যাপিটাল মার্কেটের কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে কয়েক ডজন অনলাইন নিউজ পোর্টাল চলছে। এ থেকেই ধারণা করা যায়, দেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রসার কতদূর বেড়েছে।

বর্তমানে এসব সংস্থায় যারা অর্থনৈতিক রিপোর্ট করছেন, তাদের প্রায় সবাই উচ্চশিক্ষিত এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। তাদের সবাই উদ্যমী ও মেধাসম্পন্ন। রিপোর্টে তাদের মেধার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন সময়ে রিপোর্ট পর্যালোচনায় দেখা যায়, এসব রিপোর্টারের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব কাজ করছে। তারা অন্যের চেয়ে বেশি ভালো রিপোর্ট দাখিল করতে অত্যন্ত পরিশ্রম করছেন এবং কত সুন্দর ও সাবলীলভাবে রিপোর্ট উপস্থাপন করা যায়, সে বিষয়ে প্রচুর চিন্তাভাবনা করে রিপোর্ট তৈরি করছেন। প্রয়োজনে সিরিজ রিপোর্ট করছেন এবং দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তা নিজ রিপোর্টে সংযোজন করছেন। ফলে তাদের রিপোর্ট তথ্যবহুল ও আকর্ষণীয় হচ্ছে। তারা অবশ্যই কৃতিত্বের দাবিদার।

তথ্য-উপাত্ত, পটভূমি, ব্যাখ্যা এবং ক্ষেত্রবিশেষে ভবিষ্যদ্বাণী বা ফোরকাস্ট সংযুক্ত করার কারণে রিপোর্টগুলোর মান ক্রমশ উন্নত হচ্ছে। এখন পর্যন্ত বলা যায়, আমাদের দেশে বাংলা ভাষায় দাখিলকৃত রিপোর্ট বর্তমানে উপমহাদেশের বাংলাভাষী অঞ্চলে অতি উচ্চমানের। এটা সম্ভব হয়েছে সংশ্লিষ্ট রিপোর্টার বা প্রতিবেদকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অনুসন্ধিৎসু মন ও বিষয়ের ওপর পরিষ্কার ধারণা থাকার ফলে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য তারা দেশে-বিদেশে যেসব ট্রেনিং নিয়েছেন এবং আন্তর্জাতিকমানের সেমিনার বা ঘটনা কভার করেছেন, তা তাদের জন্য খুবই সহায়ক হয়েছে। দেশে এখন বেশকিছু রিপোর্টার বা সংবাদ বিশ্লেষক আছেন, যারা বিশ্ব অর্থনীতি সম্পর্কেও ভালোমানের প্রতিবেদন বা বিশ্লেষণ করার যোগ্যতা অর্জন করেছেন এবং দেশে-বিদেশে পুরস্কার পেয়েছেন।

এছাড়া দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নীতিমালা কী রকম হওয়া উচিত, কোন কোন বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন এবং কোন কোন আইন যুগোপযোগী করা দরকার–সেসব বিষয়ে মতামত দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। স্বল্প কথায়, অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের এবং তাদের প্রদত্ত প্রতিবেদনগুলোর মান উচ্চপর্যায়ে পৌঁছেছে।

দেশে অর্থনীতির আকার এবং কর্মকাণ্ড আগামী দিনে আরও প্রসার লাভ করবে স্বাভাবিক নিয়মেই। ফলে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা প্রসার লাভ করবে। আরও নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে অর্থনীতির বিভিন্ন খাত-উপখাতের ওপর প্রতিবেদন তৈরি করার। এই পরিস্থিতিতে রিপোর্টের মান ঠিক রেখে প্রতিবেদন দাখিল করার প্রতিযোগিতা অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের ভেতরেও বৃদ্ধি পাবে। উৎকর্ষতা অর্জন একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া কোনো স্থানে গিয়ে থেমে যায় না। বর্তমানে আমাদের দেশে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা উৎকর্ষতার যে স্তরে পৌঁছেছে, তা থেকে আত্মতুষ্টি লাভ করে বসে থাকার কারণ নেই।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক

অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা বিবর্তন ও করণীয়

কাওসার রহমান

সংবাদপত্রের জন্মলগ্ন থেকেই অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার সূত্রপাত। সংবাদপত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৫৫৮ সালে প্রথম হাতে লেখা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ওই বছর ইউরোপের ভেনিস সরকার 'নটিজি স্ক্রিপ্ট' বা লিখিত নোটিশ নামে হাতে লিখিত প্রথম মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে। যার দাম ছিল এক গ্যাজেট অর্থাৎ তৎকালীন এক ভেনিসীয় মুদ্রা। পরবর্তী সময়ে এটিই সংবাদপত্র নাম ধারণ করে। এই নিউজলেটারটি তখন ইউরোপজুড়ে প্রচারিত হতো। তিন ধরনের সংবাদ দিয়ে বিশ্বের এই প্রথম সংবাদপত্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এগুলো ছিল–রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক। যদিও এগুলো আধুনিক সংবাদপত্রের মানদণ্ডের সব শর্তপূরণ করে না। কারণ, এগুলো নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আমার লেখার বিষয় হলো বিশ্বের প্রথম সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিষগুলোর মধ্যেও অর্থনৈতিক সংবাদ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মূলত, ১৬০১ সালের কাছাকাছি সময় থেকে সংবাদপত্রের আধুনিকীকরণ শুরু হয়। ষোল শতকের দিকে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সে 'রিলেশন' নামক দীর্ঘ সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ১৬০৫ সালে জার্মানির স্ট্রেসবার্গে যাত্রা শুরু করে প্রথম সাপ্তাহিক 'রিলেশন অ্যালার ফুয়েরনেমেন অ্যান্ড জেনডেনকওয়ার্ডিয়ান হিস্টোরিয়ান' (সব বিশিষ্ট এবং স্মরণীয় সংবাদ সংগ্রহ)। এই সাপ্তাহিকের প্রিয় বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল যুদ্ধ, সামরিক বিষয়, কূটনীতি এবং আদালতের ব্যাবসা ও গল্পগুজব। এরপর ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের সরকার অফিশিয়াল নিউজলেটারগুলো ছাপানো শুরু করে। ১৬২২ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম ইংরাজি ভাষার সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন, 'আ কারেন্ট অব জেনারেল নিউজ' প্রকাশিত হয়েছিল এবং ইংল্যান্ডে বিতরণ করা হয়েছিল। এখানে সংবাদ হিসাবে রাজনৈতিক, সামরিক, কূটনৈতিক খবরের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সংবাদ গুরুত্ব পায়।

সংবাদপত্রের মূল বিবর্তন ঘটে উনিশ শতকে। এই শতকে এসে বড়ো বড়ো দেশে প্রকাশিত হয় সংবাদপত্র। উচ্চগতির প্রেস ও সস্তা কাঠের নিউজপ্রিন্ট কাগজের কারণে এবং প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য দ্রুত জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে সংবাদপত্র। বাড়তে থাকে পাঠকসংখ্যা। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের এসব সংবাদপত্রের স্পন্সর হয়ে ওঠে রাজনৈতিক দলগুলো। শতাব্দীর শেষদিকে এসে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন ছাপা শুরু হয় এবং সংবাদপত্রের মালিকদের আয়ের প্রধান উৎস হয়ে ওঠে এই বিজ্ঞাপন। ফলে সংবাদপত্রে ব্যাবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পায় এবং গুরুত্ব

বাড়তে থাকে অর্থনৈতিক তথা ব্যাবসায়িক সংবাদের। এ সময় পশ্চিমা দেশে নারীর ক্ষমতায়ন শুরু হলে প্রশ্ন ওঠে সংবাদপত্রে নারী সম্পর্কিত সংবাদ নেই কেন? উনিশ শতকের প্রথমদিকে সংবাদপত্রে নারীদের উপেক্ষাই করা হতো। তখন নারীদের জন্য পরিবার ও গৃহস্থালি এবং ফ্যাশন সম্পর্কিত একাধিক কলাম বরাদ্দ দেওয়া হয় এবং বিজ্ঞাপনে ক্রমশ তাদের ব্যবহার প্রসারিত হতে থাকে। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সংবাদপত্রগুলো গুরুত্বের শিখরে পৌঁছে। কারণ যুদ্ধকালীন বিষয়গুলো তখন সংবাদপত্রের পাতায় প্রাধান্য পায়।

ভারতীয় উপমহাদেশে জেমস অগাস্টাস হিকি সম্পাদক হিসাবে প্রথম পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৭৮০ সালে বেঙ্গল গেজেট নামে। ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ মে ক্যালকাট্টা (বর্তমানে কলকাতা) থেকে প্রতি মঙ্গলবার পণ্ডিত যুগল কিশোর শুক্লা কর্তৃক প্রকাশিত হয় ভারতের প্রথম হিন্দি ভাষার সংবাদপত্র উদন্ত মার্টান্ড (দ্য রাইজিং সান)। মাওলালী মুহাম্মদ বাকির ১৮৩৬ সালে প্রথম উর্দু ভাষার সংবাদপত্র উর্দু আখবর প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় রবার্ট নাইট (১৮২৫-১৮৯০) নামক এক ইংরেজ ইংরেজি ভাষায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেন। টাইমস অব ইন্ডিয়া এবং দ্য স্টেটসম্যান নামক–এই দুই পত্রিকা ব্যাপকভাবে ভারতীয় পাঠকের কাছে পৌঁছে যায়। এ দুটি পত্রিকা মূলত ভারতে জাতীয়তাবাদের প্রচার করত। জনগণকে সংবাদমাধ্যমের ক্ষমতার সঙ্গে এবং রাজনৈতিক বিষয় ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল মূলত এই পত্রিকা দুটি। এসব পত্রপত্রিকায় রাজনৈতিক বিষয়ের পাশাপাশি অর্থনৈতিক বিষয়গুলোও গুরুত্বসহকারে স্থান পায়।

সংবাদপত্রের শুরুর পর থেকেই অন্যান্য ইস্যুর সঙ্গে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতাও পাশাপাশি চলতে থাকে। যদিও অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা করার জন্য আজকের মতো আলাদা কোনো বিট বা পৃথক কোনো ব্যক্তি দায়িত্বে ছিলেন না। একই সাংবাদিককে রাজনৈতিক, সামরিক কিংবা কূটনৈতিক সাংবাদিকতার সঙ্গে অর্থনৈতিক সংবাদও সংগ্রহ ও লিখতে হতো। বিশ শতকের শুরুর দশক পর্যন্ত অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা তেমন কোনো মনোযোগ টানেনি। রাজনীতি, সরকার, অপরাধ প্রভৃতি বিষয়ে মানুষের আগ্রহ ব্যবসায় সংবাদ থেকে বেশি ছিল। অর্থনীতির নানা প্রবণতা, ব্যাবসার নানা বিষয় জানিয়ে দেওয়া জন্য মূলত অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার সূচনা হয় বিংশ শতকের মধ্যযুগে। কিছু ব্যবসায় পরিবারের যোগাযোগের স্বার্থেই এই সাংবাদিকতার প্রচলন হয়। ১৮৮২ সালে চার্লস ডাও, এডওয়ার্ড জোনস এবং চার্লস বার্গস্ট্রেসের একধরনের ওয়ার সার্ভিস চালু করেন, যার সাহায্যে ওয়ালস্ট্রিটের বিনিয়োগ হাউসগুলো সংবাদ পেতে শুরু করে। একশ বছরের বেশি সময় পর শেয়ারবাজারে সাধারণ মানুষের বিনিয়োগ বাড়তে থাকায় গণমাধ্যমে অর্থনৈতিক বা ব্যবসায় সাংবাদিকতা প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। ইউরোপে পণ্যের মূল্যসংক্রান্ত খবর প্রকাশ শুরু হয় অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি। যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম ব্যবসায় পত্রিকা বাজারে আসে ১৭৯৩ সালে। ১৮৪৯ সালে জুলিয়াস রয়টার্স ইউরোপে বিজনেস সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করেন। যুক্তরাষ্ট্রে ওয়ালস্ট্রিট জার্নালের আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৮৮৯ সালে।

উন্নত দেশগুলোয় অর্থনীতির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক বা ব্যবসায় সাংবাদিকতার প্রসার ঘটলেও এই উপমহাদেশে তা ব্যাপ্তি ছিল সীমিত। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর বাংলাদেশ তা পাকিস্তানের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। এই প্রদেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ছিল সীমিত। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বলতে ছিল পাটশিল্প, চাশিল্প এবং অন্যান্য বিভিন্ন ছোটোখাটো শিল্প থেকে উৎপাদন ও সেগুলো বিপণন। বস্তুত শিল্প বা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসংক্রান্ত সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হতো করাচি বা ইসলামাবাদ থেকে। নীতিবিষয়ক সবকিছুর সিদ্ধান্ত হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ছিল সীমিত আকারের। এ কারণে এই প্রদেশে অর্থনৈতিক সংবাদ সৃষ্টি হতো খুবই কম। শুধু ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় অবস্থিত শিল্পকেন্দ্র ও সিলেটের চা উৎপাদনসংক্রান্ত কর্মকাণ্ড থেকে সৃষ্ট সংবাদই অর্থনৈতিক সংবাদ হিসাবে প্রচার হতো।

নারায়ণগঞ্জ, দৌলতপুর ও চট্টগ্রামে পাট ও চা-সংক্রান্ত যে দৈনন্দিন ব্যাবসায়িক কর্মকাণ্ড হতো সেগুলো খুব সীমিত আকারে ছাপা হতো। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ নিয়মিতভাবে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করলেও তা খুবই সীমিতসংখ্যক বিনিয়োগকারীর উৎসাহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কৃষি তখন প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে সংবাদপত্রে এর গুরুত্ব ছিল কম। ফলে যতখানি গুরুত্ব পাওয়ার প্রয়োজন ছিল, ততখানি গুরুত্ব অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় পায়নি। তবে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য হিসাবে তেল, চিনি, লবণ, পেঁয়াজসংক্রান্ত সংবাদ পত্রিকায় স্থান পেত। তবে সেসব সংবাদ সাধারণ সংবাদ হিসাবে পত্রিকার পাতায় ছাপা হতো। আর সেসব রিপোর্ট দাখিল করতেন সাধারণবিষয়ক রিপোর্টাররাই। অর্থনৈতিক বা ব্যবসায় সাংবাদিকের মতো কোনো বিশেষায়িত রিপোর্টার বাজার দরদামের ওপর রিপোর্ট করতেন না।

অবশ্য এর অন্যতম কারণও ছিল। তখনও এই অঞ্চলে রাজনীতিই পাঠকের কাছে প্রধান আকর্ষণ ছিল। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সংবাদপত্রগুলো সব সময় রাজনৈতিক রিপোর্টকেই গুরুত্ব দিত। পত্রিকার পাতায় রাজনৈতিক রিপোর্টেরই প্রাধান্য ছিল।

স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির পর এক দশক ধরে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা আগের মতোই সীমাবদ্ধ ছিল। তাছাড়া সেই সময়টা ছিল প্রধানত পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভঙ্গুর ছিল। এই পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতাকে কেন্দ্র করেই সত্তরের দশকে দেশে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার প্রসার ঘটতে পারত। কিন্তু পত্রিকাগুলোর দূরদৃষ্টির অভাবে তা হয়ে ওঠেনি। ফলে প্রসারতা লাভ করেনি অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা। এই দশকেও সংবাদপত্রের পাতায় রাজনৈতিক ও অপরাধবিষয়ক রিপোর্টগুলোই প্রাধান্য পায়।

দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসতে শুরু করে আশির দশকের প্রথমার্ধে। সেই সময় দেশের অর্থনীতির উন্মুক্তকরণ শুরু হয়। পরিবর্তন আসে সরকারের অর্থনৈতিক নীতিতে। ফলে ব্যক্তিপুঁজি খাটানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়। আমদানি এবং রপ্তানি দুটোই বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিনিয়োগ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উদ্যোক্তারা বিনিয়োগ শুরু করেন। সরকারও ক্রমাগতভাবে সহায়তা দিতে থাকে। নতুন কলকারখানা সৃষ্টি, যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন শুরু হয়। ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের চিত্র পালটাতে থাকে। সেই সঙ্গে অর্থনীতির প্রতিটি খাত-উপখাতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

এই সময়ে এসে মূলত পত্রপত্রিকাগুলোয় বিট হিসাবে অর্থনৈতিক বিট আলাদা মর্যাদা লাভ করে। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে অর্থনৈতিক রিপোর্টের পরিসীমা। বিট সৃষ্টি হওয়ার কারণে উদ্যমী যুবকরা অর্থনৈতিক রিপোর্টার হিসাবে সংবাদপত্রে তাদের কর্মকাণ্ড শুরু করেন। এই দশকে মূলত অর্থনৈতিক রিপোর্টারদের কর্মকাণ্ড সামষ্টিক অর্থনীতি এবং শেয়ারবাজারবিষয়ক রিপোর্টের ওপর সীমাবদ্ধ থাকে।

নব্বই দশক থেকে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার বিকাশ শুরু হয়। এই দশক থেকে দেশের অর্থনীতির উদারীকরণ শুরু হয়। রাষ্ট্রীয় খাত সংকুচিত হতে থাকে। ব্যক্তি খাতের ব্যাপ্তি বাড়তে থাকে। শিল্প-

কলকারখানা স্থাপনে সরকারি নিয়ন্ত্রণ উঠে যায়। বিদেশি বিনিয়োগের পথ প্রসারিত হয়। ফলে অর্থনীতির আকার দ্রুত বড়ো হতে থাকে। অর্থনৈতিক সাংবাদিকতাও প্রসার লাভ করে।

এই দশকে এসে বেশ কয়েকটি নতুন পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই দশকের শেষদিকে এসে দেশে প্রথম টেলিভিশন চ্যানেল যাত্রা শুরু করে। পত্রিকাগুলোয় পৃথক অর্থনৈতিক ডেস্ক বা বিভাগ চালু করা হয়। চালু করা হয় অর্থনৈতিক রিপোর্ট প্রকাশের জন্য আলাদা পাতা। এই দশকে শুধু অর্থনৈতিক বিষয়ের ওপরও পত্রিকা প্রকাশ হতে শুরু করে। বিদ্যমান পত্রিকাগুলোও অর্থনৈতিক বিষয়ের ওপর জোর দিতে শুরু করে। ফলে যেসব পত্রিকায় আগে অর্থনীতিসংক্রান্ত রিপোর্ট তেমন গুরুত্ব পেত না, সেসব পত্রিকায় অর্থনৈতিক রিপোর্ট ভালোভাবে স্থান পেতে থাকে। কাজের সুবিধার জন্য প্রতিটি গণমাধ্যমে অর্থনীতির ক্ষেত্রেগুলোর জন্য আলাদা আলাদা বিটের সৃষ্টি করা হয়। ফলে একেকটি পত্রিকায় একাধিক রিপোর্টারের প্রয়োজন হয়। এতে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

বর্তমানে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা চরম শিখরে পৌঁছেছে বলা যায়। কিন্তু এই শিখরে পৌঁছার পরও এই সাংবাদিকতায় অনেক ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রথমত, এখন প্রশিক্ষণের খুব অভাব মনে হচ্ছে। এ কারণে যেসব রিপোর্টার অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা করছেন, তাদের প্রতিবেদনে অনেক দুর্বলতা ফুটে উঠছে। এই দুর্বলতাটা বেশি দেখা যাচ্ছে শূন্য দশকে বা তার পরবর্তী সময়ে যেসব রিপোর্টার সাংবাদিকতায় আসছেন তাদের মধ্যে এই দুর্বলতাটা বেশি প্রকট। এটা মূলত প্রশিক্ষণের অভাবের কারণে হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) নব্বই দশকের প্রথমভাগে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার ওপর মৌলিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেশের রাষ্ট্রীয় এই প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটিতে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা বা ব্যবসায় সাংবাদিকতার ওপর মৌলিক কোনো প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়নি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দু-একটি যে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হচ্ছে তা মূলত কর্মশালা। এসব কর্মশালা থেকে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা শেখার

বর্তমান সময়ে এসে অর্থনৈতিক রিপোর্ট তৈরিতে প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় যে ব্যাপ্তি বা প্রসার ঘটেছে, তা হয়েছে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রসারের ফলেই

শূন্য দশকে এসে দেশের গণমাধ্যমের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। এই দশকে পত্রপত্রিকার সঙ্গে একাধিক টেলিভিশন চ্যানেল, রেডিয়ো এবং অনলাইন পোর্টালের আবির্ভাব হয়। সব গণমাধ্যমেই অর্থনৈতিক সাংবাদিকতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া শুরু করে। এই দশকে মূল অর্থনীতিভিত্তিক রিপোর্টের পাশাপাশি ব্যবসায়ভিত্তিক রিপোর্ট প্রকাশ পেতে থাকে। তবে ব্যবসায় রিপোর্টগুলো মূলত কোম্পানির প্রেসরিলিজভিত্তিক হয়। প্রেসরিলিজভিত্তিক হলেও এ সময়ে এসে করপোরেট রিপোর্টের প্রসার ঘটে।

বর্তমান সময়ে এসে অর্থনৈতিক রিপোর্ট তৈরিতে প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় যে ব্যাপ্তি বা প্রসার ঘটেছে, তা হয়েছে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রসারের ফলেই। তাছাড়া তথ্যপ্রযুক্তির বদৌলতে বিশ্বের সব তথ্য হাতের মুঠোয় চলে আসায় অর্থনৈতিক বা ব্যবসায় সাংবাদিকতায় ব্যাপক বৈচিত্র্য এসেছে। অনুসন্ধানী ও সরেজমিন রিপোর্টের পাশাপাশি বিশ্লেষণমূলক অর্থনৈতিক রিপোর্টও গণমাধ্যমগুলোয় দেখা যাচ্ছে। বিশ্ব অর্থনীতি সম্পর্কেও ভালোমানের প্রতিবেদন বা বিশ্লেষণ করা এখন দেশীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত হচ্ছে।

অর্থনৈতিক বা ব্যবসায় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এখন একাধিক বিট থাকার কারণেও রিপোর্টারদের মধ্যে দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধি কমে যাচ্ছে। এখন প্রায় গণমাধ্যমেই অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ব্যাংক খাত, পরিকল্পনা কমিশন, শেয়ারবাজার, বাণিজ্যিক সংগঠন তথা চেম্বার ও অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতিতে একেকজন রিপোর্টার কাজ করেন। যে রিপোর্টার যে বিটে কাজ করেন, তিনি তার বিটের বাইরে অর্থনীতির অন্য উপখাতের ব্যাপারে খোঁজখবর রাখেন না। ফলে একজন অর্থনৈতিক বা ব্যবসায় রিপোর্টার পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক রিপোর্টার হয়ে উঠতে পারছেন না। তবে যার যার বিটে অনেকেই অবশ্য দুর্দান্ত সব রিপোর্ট করছেন।

অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় নীতি-নৈতিকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এই নীতি-নৈতিকতারও অভাব রয়েছে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায়। তবে নীতি-নৈতিকতা মেনে আমাদের তেমন কিছু থাকে না। আমার প্রত্যাশা–প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) নিয়মিতভাবে অর্থনৈতিক ও ব্যবসায় সাংবাদিকতার ওপর মৌলিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে।

দেশে সাংবাদিকতা করা খুব কঠিন। এদেশের সব গণমাধ্যমের মালিকানার পেছনে রয়েছেন ব্যবসায়ীরা। মূলত তারা তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল ও অনলাইন পোর্টাল চালু করেন। তাদের স্বার্থের দিকে নজর দিয়েই অন্য সাংবাদিকদের মতো অর্থনৈতিক সাংবাদিককেও কাজ করতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের মালিকদের চাপে বেশি নৈতিকতাবিবর্জিত কাজ করতে হয়। আবার মালিকপক্ষের স্বার্থরক্ষার পাশাপাশি আর্থিক অসততা অভিযোগও থাকে অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের প্রতি। একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করার মতো তা হলো, যেসব অর্থনৈতিক সাংবাদিকের বিরুদ্ধে অসততার অভিযোগ ওঠে, তারা বেশিদিন এই পেশায় টিকতে পারেন না। তারা পেশা থেকে ছিটকে যান। আবার অনেকে এই পেশায় আসেন পেশাকে ব্যবহার করে সুবিধা নিয়ে বিদেশ পাড়ি দেওয়ার জন্য। তাই যেহেতু অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের বা রাষ্ট্রের কোনো নীতি-নৈতিকতার গাইডলাইন নেই, তাই যারা এই পেশায় আসবেন এবং কাজ করবেন তাদেরকে যতটা সম্ভব নিজস্ব নীতি-নৈতিকতা মেনে কাজ করা উচিত।

সর্বোপরি, অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের জন্য তার প্রণীত প্রতিবেদনের মান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বেশির ভাগ রিপোর্টেরই মান নিয়ে প্রশ্ন আছে। অনেককেই দেখা যাচ্ছে অতি উচ্চমানের প্রতিবেদন তৈরি করতে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রিপোর্ট 'আপ টু দ্য মার্ক' নয়। এর কারণ যিনি যে বিষয়ে রিপোর্ট লিখেছেন সেই বিষয়ে তার স্বচ্ছ ধারণার অভাব। এজন্য বেশি করে ভালো ভালো রিপোর্ট পড়া উচিত। দেশ-বিদেশের অর্থনৈতিক রিপোর্ট, বিশ্লেষণ–এগুলো কীভাবে লেখা হয়, রিপোর্টের কাঠামো কীভাবে তৈরি করা হয় সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া উচিত। এমনিতেই রিপোর্টারের পড়ার কোনো বিকল্প নেই। আর অর্থনৈতিক রিপোর্টারদের ক্ষেত্রে তা আরও জরুরি।

একজন অর্থনৈতিক রিপোর্টারকে অর্থনীতির সর্বশেষ 'আপডেট' সব সময় তার ভাবনায় রাখতে হবে। কীভাবে একটি ভালো রিপোর্ট তৈরি করা যায়, তা নিয়ে রীতিমতো গবেষণা করতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে, রিপোর্ট যেন পরিসংখ্যানের ভারে ভারাক্রান্ত না হয়। প্রতিটি রিপোর্টের মধ্যে 'হিউম্যান টাচ' থাকা বাঞ্ছনীয়। অনেকে বলতে পারেন, অর্থনৈতিক রিপোর্টে আবার কীভাবে 'হিউম্যান টাচ' থাকবে? অন্যসব রিপোর্টের মতো অর্থনৈতিক রিপোর্টের শেষ সুবিধাভোগী বা অসুবিধাভোগী কিন্তু মানুষ। যেমন: মূল্যস্ফীতি বাড়লে মানুষের দুর্ভোগ হয়, কমলে স্বস্তি আসে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন শেষে চালু হলে মানুষ এর সুফল পায়। বিনিয়োগ বাড়লে মানুষের কর্মসংস্থান হয়। আমদানি-রপ্তানি, পণ্যের দাম হ্রাস-বৃদ্ধি, শেয়ারবাজারের উত্থানপতন–সব অর্থনৈতিক রিপোর্টই শেষপর্যন্ত মানুষকে নাড়া দেয়। তাই মানুষের সুফল-কুফলের দিকটি মাথায় রেখে রিপোর্ট করলে তা প্রাণবন্ত ও অসাধারণ হয়ে ওঠে।

সবশেষে, রিপোর্ট লেখার ক্ষেত্রে দুর্বোধ্যতা পরিহার করা অবশ্যই কর্তব্য। দুর্বোধ্য ভাষার রিপোর্ট সব পাঠক করতে পারেন না। মনে রাখতে হবে, একটি রিপোর্ট যেমন একজন উচ্চশিক্ষিত মানুষ পড়বে, আবার একজন অতি সাধারণ অর্ধশিক্ষিত কিংবা কম লেখাপড়া মানুষও পড়বে। তাই সব মানুষ যাতে প্রতিটি অর্থনৈতিক রিপোর্ট পড়তে পারেন, সেজন্য সহজসরল ভাষায় লেখা উচিত। অর্থনীতির অনেক শব্দ বেশ কঠিন। সেগুলোকে সহজ ভাষায় মানুষের কাছে তুলে ধরা গেলে কঠিন অর্থনৈতিক রিপোর্টও সব শ্রেণির পাঠকের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠবে।

তথ্যসূত্র

* সাংবাদিকতার ইতিহাস, উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ
* অজয় দাশগুপ্ত, রোবায়েত ফেরদৌস সম্পাদিত ব্যবসায় সাংবাদিকতাবিষয়ক গ্রন্থ
* মনোয়ার হোসেন রচিত প্রবন্ধ দেশে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার বিস্তার

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

প্রবন্ধ

অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি এবং অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা

নিরঞ্জন রায়

এখন যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, বিগত কয়েক দশক ধরে সমগ্র বিশ্বে এবং দেশে সবচেয়ে বড়ো খবরের স্থান দখল করে আছে কোন বিষয়, তাহলে সবাই একবাক্যে বলবেন–অর্থনীতি। সেই গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশক থেকে শুরু করে অদ্যাবধি যে বিষয়টি সমগ্র বিশ্বে সবার ওপরে স্থান দখল করে আছে, তা হচ্ছে অর্থনীতি। অর্থনীতি আগেও ছিল। কিন্তু তখন অর্থনীতি ছিল অর্থনীতির জায়গায় অর্থাৎ আর্থিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে। অতীতে শিল্পসাহিত্য, রাজনীতি, ক্রীড়া, শিক্ষা, প্রযুক্তি–সবকিছুই যার যার অবস্থানে সমান গুরুত্ব নিয়ে বিরাজ করেছে। এসব বিষয়ের কর্মকাণ্ডই প্রতিফলিত হয়েছে অর্থনীতিতে। কিন্তু গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশক থেকে পরিস্থিতি পালটে যেতে শুরু করে এবং অর্থনীতি সবকিছুকে ছাড়িয়ে যায়। এখন সবকিছুর মূলে অর্থনীতি। সেই নব্বইয়ের দশকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জাপান সফরে গিয়ে অচেতন হয়ে পড়ে যাওয়ার যে রাজনীতি, এর পেছনেও ছিল অর্থনীতি। কারণ জাপানের অর্থনীতি তখন বেশ শক্ত অবস্থানে বিরাজ করছিল। পক্ষান্তরে আমেরিকার অর্থনীতিতে তখন মন্দা। আমেরিকার অর্থনীতির মন্দাভাব কাটানোর জন্য আমেরিকায় জাপানি বিনিয়োগের যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল এবং সেই অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করাই ছিল সেই সময়ের আমেরিকার প্রেসিডেন্টের জাপান সফরের রাজনীতির উদ্দেশ্য।

বিশ্ব অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি

গত শতাব্দীর শেষের দিকে যখন আমেরিকার অর্থনীতিতে মন্দা কোনোভাবেই কাটছিল না এবং কম্পিউটার প্রযুক্তিসংক্রান্ত কোম্পানিগুলো বেশ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিল, তখন ওয়াই-টু-কে (Y2K)-এর ধোঁয়া তুলে সমগ্র বিশ্ব থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার হাতিয়ে নেওয়া হয়। সুতরাং এই যে প্রযুক্তি নিয়ে বিশ্বব্যাপী আতঙ্ক সৃষ্টি এবং সেখান থেকে আর্থিক ফায়দা নেওয়ার পেছনেও ছিল অর্থনীতি। এই শতকের শুরুর দিকে বিশেষ করে ২০০৩ থেকে ২০০৭ সাল সময়কালে বিশ্বের সবচেয়ে নিয়মনীতির দেশ বলে খ্যাত আমেরিকার মতো দেশে 'সাবপ্রাইম মর্টগেজ বাবল' তৈরির মাধ্যমে আমেরিকার অর্থনীতির অভাবনীয় উন্নতি সমগ্র বিশ্বে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। এমনকি এই উন্নতিতে শামিল হয়ে সমগ্র বিশ্বের অর্থনীতিতেও এক অভাবনীয় উন্নতির হাওয়া লেগেছিল। তখনও বিশ্বের সবকিছু ছাপিয়ে অর্থনীতি সবার ওপরে স্থান করে নিয়েছিল। ২০০৮

সালে এসে যখন আমেরিকার 'সাবপ্রাইম মর্টগেজ বাবল' ফেটে গেল, তখন আমেরিকার অর্থনীতিতে তো মন্দা দেখা দিলই, সেই সঙ্গে সমগ্র বিশ্ব এক দীর্ঘমেয়াদি মন্দার কবলে পড়ে যায়। যেখান থেকে নানাবিধ পদক্ষেপ নেওয়ার পরও অনেক দেশ বেরিয়ে আসতে পারেনি। সরকারি প্রণোদনা দিয়ে এবং সরাসরি সহযোগিতা দিয়ে মন্দা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা হয়েছে যথেষ্টই এবং আমেরিকার অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়িয়েছেও। কিন্তু এই সংকটকালেও অর্থনীতিই ছিল সবার ওপরে। বিশ্বব্যাপী যে প্রযুক্তি ব্যবহারের রমরমা অবস্থা এবং ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যে ব্যাপক প্রসার, এর পেছনেও এই অর্থনীতি। অর্থনীতিকে সাপোর্ট করে না এমন প্রযুক্তি বা বিষয় যত ভালোই হোক না কেন, তা আর সেভাবে এগোতে পারবে না। বিগত এক দশকের অধিক সময় আমেরিকার অর্থনীতির চালিকাশক্তি হয়ে আছে পাঁচটি বৃহৎ প্রযুক্তি কোম্পানি এবং সেগুলো হচ্ছে ফেসবুক, অ্যামাজন, অ্যাপল, নেটফ্লিক্স ও গুগল। আমেরিকার অর্থনীতির ওপর এই প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর প্রভাব এতটাই বেশি যে, এদের অনেক অন্যায় কর্মকাণ্ডও আইনের শাসনের স্বর্গরাজ্য বলে খ্যাত আমেরিকাকেও মেনে নিতে হচ্ছে। ফেসবুকের বিরুদ্ধে অভিযোগের শেষ নেই। আমেরিকার জনগণের ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করতে ব্যর্থ, এমনকি আমেরিকার নির্বাচনে হস্তক্ষেপের মতো গুরুতর অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও ফেসবুকের বিরুদ্ধে শুধু সিনেট কমিটির কাছে শুনানি ছাড়া তেমন কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে পারেনি। এর প্রধান কারণ অর্থনীতি। ফেসবুকের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার কারণে এই কোম্পানির শেয়ার মূল্যের যদি দরপতন হয়, তাহলে আমেরিকার অর্থনীতির যে ক্ষতি হবে, তা দেশটির পক্ষে সামাল দেওয়া সম্ভব হবে কি না সন্দেহ আছে।

অর্থনীতি করোনা মহামারিরও ওপরে

করোনা মহামারি মোকাবিলায় উন্নত বিশ্ব যে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে, এরও মূল কারণ অর্থনীতি। কল্পনা করতেও অবাক লাগে, আমেরিকার মতো দেশে প্রতিদিন লাখ লাখ লোক করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন এবং এখন পর্যন্ত প্রায় নয় লাখ আমেরিকান মারা গেছেন এই করোনায়। যে আমেরিকা তাদের একজন নাগরিককে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে উদ্ধার করার জন্য প্রয়োজন হলে সেখানে যুদ্ধবিমান ও যুদ্ধজাহাজ পাঠাতে কার্পণ্য করে না, সেই আমেরিকায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রায় নয় লাখ মানুষের অসহায় মৃত্যু মেনে নিতে হয়েছে শুধু তাদের অর্থনীতিকে সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়ার কারণে। এমন একসময় ছিল এবং এখনো আছে বলেই আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, সবকিছুর চেয়ে মানুষের গুরুত্ব এবং মানুষের মূল্য বেশি। কিন্তু এবারের করোনা অতিমারি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল অনেক উন্নত দেশেই এখন আর মানুষের অবস্থান বা গুরুত্ব সবকিছুর ওপরে নয় বরং অর্থনীতি সবকিছুর ওপরে। করোনা মোকাবিলায় এখন পর্যন্ত যত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, এর সবকিছুই নেওয়া হয়েছে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা ঠিক রেখে। আমাদের গ্রামে দেখেছি মানুষকে বাঁচানোর জন্য জমিজমা বিক্রি করে নিঃস্ব হয়ে গেছে অনেক পরিবার, এর একটাই কারণ–মানুষের মূল্য সবকিছুর ওপরে। করোনা মোকাবিলায় কিন্তু অনেক দেশই এভাবে সিদ্ধান্ত নেয়নি যে আগে মানুষ বাঁচাই, তাতে অর্থনীতিসহ অন্যান্য বিষয়ে যা হয় হবে। বরং অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, অনেক দেশ এভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আগে অর্থনীতি ঠিক রাখি, তাতে মানুষের যা হয় হবে। এর সুফল অবশ্য আমেরিকাসহ উন্নত দেশের অর্থনীতি ভালোই পেয়েছে। করোনায় বিগত দুবছরে একদিকে আমেরিকায় লাখ লাখ মানুষ মারা গেছে, অন্যদিকে এখানকার শেয়ারবাজার লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পেয়ে রেকর্ডের পর রেকর্ড ভেঙে ঊর্ধ্বগতি অব্যাহত রেখেছে। এমনকি কানাডায় বাড়ির মূল্য দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে গেছে এই করোনাকালে। সবকিছু বাদ দিয়ে শুধু মানুষ বাঁচানোর ব্রত নিয়ে বিশ্বনেতারা একযোগে করোনা মহামারি মোকাবিলায় সর্বশক্তি নিয়োগ করতে পারলে আমার বিশ্বাস–এই মহামারি এত দীর্ঘ হতো না এবং অনেক আগেই শেষ হয়ে যেত। সুতরাং এটা প্রমাণিত যে দীর্ঘ তিন দশকে উন্নত বিশ্বে যা কিছুই ঘটুক না কেন, এর সবকিছু ছাপিয়ে অর্থনীতিই সবার ওপরে স্থান ধরে রেখেছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নতি

বিশ্ব অর্থনীতির মতো ব্যাপক উত্থানপতন আমাদের দেশের অর্থনীতিতে সেভাবে না ঘটলেও, বিগত দুই দশকে দেশের অর্থনীতি এগিয়েছে অভাবনীয়ভাবে। বিশেষ করে বিগত দেড় যুগে ধরে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার একটানা ক্ষমতায় থাকার ফলে অনেক যুগান্তকারী ও সাহসী বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। দেড় যুগ ধরে বাংলাদেশে যে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে, তেমনটা সামসময়িক বিশ্বের আর কোনো দেশে দেখা যায়নি। ফলে বাংলাদেশের এমন অর্থনৈতিক সাফল্য বিশ্ববাসীরও দৃষ্টি কেড়েছে। বাংলাদেশ নিয়ে এখন বিশ্ব গণমাধ্যমে অনেক সম্ভাবনার খবর প্রকাশিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতির আকৃতি প্রায় চার শ বিলিয়ন ডলার। আশা করা যায়, ২০২৫ সাল নাগাদ দেশের অর্থনীতির আকৃতি হবে প্রায় অর্ধ ট্রিলিয়ন ডলার এবং ২০৩০ সালের আগেই ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হবে। দেশের মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৫০০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে অনেক আগেই। দারিদ্র্যসীমার নিচের জনসংখ্যার হার বা হতদরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমে এসেছে ২০ শতাংশেরও নিচে। এক যুগেরও বেশি সময় ধারাবাহিকভাবে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ছয় শতাংশের ওপরে। দেশের অবকাঠামো নির্মাণে যুগান্তকারী অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ, চার ও ছয় লেনের মহাসড়ক নির্মাণ, দ্বৈত রেললাইন নির্মাণ, কর্ণফুলি টানেল, ঢাকা শহরে মেট্রোরেল চালু, ঢাকা শহরের ওপর দিয়ে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, দেশব্যাপী একশ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন, ডিজিটাল বাংলাদেশে অবাধ তথ্যপ্রযুক্তির সুযোগ করে দেওয়া, শতভাগ বাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা, ভবিষ্যতের বিদ্যুতের চাহিদার কথা মাথায় রেখে দেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন, এমনকি সিরাজগঞ্জের মতো ছোট্ট শহরে উন্নত বিশ্বের আদলে উইন্ড মিল গড়ে তোলার মতো যুগান্তকারী অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে বিগত দেড় যুগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে। বৃহৎ পরিসরের অবকাঠামো নির্মাণ করলে তার বহুমাত্রিক প্রভাব অর্থনীতিতে পড়বেই এবং এটাই অর্থনীতির তত্ত্বকথা বা মূলনীতি। এ কারণেই উন্নত বিশ্বে সরকারিভাবে শুধু উন্নতমানের অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে, যার হাত ধরে ব্যাপক বেসরকারি বিনিয়োগ সাধিত হয়েছে। ফলে অর্থনীতি হয়েছে উন্নত। অর্থনীতির একটি সাধারণ কথা সবারই জানা আছে যে, যত উন্নতমানের অবকাঠামো নির্মিত হবে, তত অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের বাংলাদেশ সেই পথেই আছে এবং অগ্রসর হচ্ছে।

বাংলাদেশেও এখন অর্থনীতি সবার ওপরে

বিশ্বে যেমন সবকিছুকে ছাড়িয়ে অর্থনীতি সবার ওপরে স্থান করে নিয়েছে, তেমনই বাংলাদেশের অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে দেশের অর্থনীতি এখন সবকিছু ছাড়িয়ে সবার ওপরে স্থান করে নিয়েছে। গণতন্ত্র, আন্দোলন-সংগ্রাম, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ক্রীড়া– সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছে দেশের অর্থনীতি। প্রত্যন্ত গ্রামের একজন খেতমজুর বা গৃহিণী থেকে শুরু করে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষক বা একজন শিল্পপতি–সবাই এখন অর্থনীতি ছাড়া কিছুই বোঝে না। একসময় আমাদের গ্রামে বিনামূল্যে অনেক গ্রামীণ সেবা পাওয়া যেত। এখন আর কোনো কিছুই বিনামূল্যে বা শখের কারণ হিসাবে পাওয়া যায় না। সবকিছুই এখন মূল্য দিয়ে কিনতে হয়। সুদূর গ্রামের একজন গৃহপরিচারিকাও এখন ঘণ্টা মেপে পারিশ্রমিক নিয়ে কাজ করে থাকেন। এসবই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষণ। উন্নত বিশ্বে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, এখানে কোনোকিছুই বিনামূল্যে পাওয়া যায় না এবং এর দরকারও পড়ে না, কারণ দেশটা অর্থনৈতিকভাবে উন্নত। তাই আমাদের দেশে এখন যে আর কোনোকিছু বিনামূল্যে বা সাশ্রয়ী মূল্যে পাওয়া যায় না এবং আগামী দিনেও পাওয়া যাবে না, এর মূল কারণ দেশের অর্থনীতির অভাবনীয় উন্নতি। এই ধারাবাহিক অর্থনৈতিক উন্নতির সমালোচনা থাকতেই পারে এবং থাকবে–এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নতুন বাস্তবতায় দেশের অর্থনীতি যে সবার ওপরে স্থান করে নিয়ে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে চলছে, এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে দেশের সব শ্রেণির মানুষকে এবং সফলতা তুলে নিতে হবে সময়মতো। সেই সঙ্গে সবার কার্যক্রম এমনভাবে সংগঠিত ও পরিচালিত করতে হবে যাতে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা আরও টেকসই হয় এবং দীর্ঘমেয়াদি রূপ পায়। যারা তেমনটা করতে ব্যর্থ হবেন, তারাই পিছিয়ে পড়বেন এবং দেশ ও অর্থনীতি ঠিকই এগিয়ে যেতে থাকবে। এই যে দেশের বিরোধী দলগুলো জনগণের অনেক ন্যায্য দাবি থাকা সত্ত্বেও তেমন আন্দোলন-সংগ্রাম তো সংগঠিত করতে পারছেই না, উলটো দিনদিন তাদের অবস্থান দুর্বল থেকে দুর্বল হয়ে চলেছে। এর অনেক কারণের মধ্যে অন্যতম একটি বড়ো কারণ হলো তারা দেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে সবার ওপরে স্থান দিয়ে তাদের রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণ করতে পারছে না। এ কারণেই দেশের প্রতিটি খাত এবং আর্থসামাজিক সব অংশকেই এই অর্থনীতির বাস্তবতা মাথায় রেখে তাদের কর্মপন্থাকেও নতুন আঙ্গিকে ঢেলে সাজাতে হবে। একইভাবে দেশের গণমাধ্যমকেও 'সবার ওপরে অর্থনীতি'–এই বাস্তবতা বিবেচনায় রেখে তাদের অর্থনৈতিক সাংবাদিকতাকেও নতুন আঙ্গিকে সাজাতে হবে।

বিশ্বে অর্থনীতির সাংবাদিকতা

বিশ্ব অর্থনীতির যে গতিপ্রকৃতি, এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিশ্বের সংবাদমাধ্যম ভালোই চলতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ করে অর্থনীতির যে সাংবাদিকতা, তা সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকে সামনে রেখেই আবর্তিত হচ্ছে। অর্থনীতির অবস্থানকে সহায়তা করাই বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থনীতির মৌলিক বিষয় এবং আর্থসামাজিক অবস্থার যে মূল ভিত্তি, সেখান থেকে অর্থনীতির সাংবাদিকতা কখনই সরে আসেনি, বরং সেই মূল ভিত্তিকে ঠিক রেখে অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে অর্থনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারকদের অনুপ্রাণিত করেছে এবং অনেকক্ষেত্রে বাধ্য করেছে। যেমন, আগে সরকার অধিকমাত্রায় সম্প্রসারণমূলক মুদ্রানীতি বা আর্থিক নীতি গ্রহণ করলে বা অধিকমাত্রায় রাষ্ট্রীয় ঋণ গ্রহণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হতো এবং এই পদক্ষেপের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে বিভিন্ন বিশ্লেষণ ও মতামত প্রকাশ করা হতো। সাংবাদিকদের এমন ভূমিকার কারণে সরকার ও নীতিনির্ধারক তাদের অনেক পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত থেকেছে। কিন্তু এখন আর সেই অবস্থা নেই। বর্তমানে অর্থনৈতিক

অর্থনীতির অবস্থানকে সহায়তা করাই বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থনীতির মৌলিক বিষয় এবং আর্থসামাজিক অবস্থার যে মূল ভিত্তি, সেখান থেকে অর্থনীতির সাংবাদিকতা কখনই সরে আসেনি, বরং সেই মূল ভিত্তিকে ঠিক রেখে অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে অর্থনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারকদের অনুপ্রাণিত করেছে এবং অনেকক্ষেত্রে বাধ্য করেছে

সাংবাদিকরাও আর সেভাবে অবস্থান নেন না। কারণ, তারা ভালো করেই জানেন যে বর্তমানে অর্থনৈতিক অবস্থা সমাজে এতটাই জেঁকে বসে আছে যে এর বিপরীতে গিয়ে টিকে থাকা যাবে না, তা সে সামাজিকভাবে যত ভালোই হোক না কেন। বরং অর্থনীতির গতিপ্রকৃতির সঙ্গে সহায়ক ভূমিকা রেখে অর্থনীতির এই অবস্থানকে কীভাবে আরও বেশি টেকসই, জনবান্ধব এবং দীর্ঘস্থায়ী করা যায়, সেই ব্যাপারে ভূমিকা বা অবদান রাখাই হয়েছে বর্তমান যুগের অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য। প্রযুক্তির ওপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরশীলতা যে মানবসভ্যতার জন্য কোনো অবস্থাতেই মঙ্গলজনক নয়, সেটা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও উন্নত বিশ্বের সংবাদমাধ্যম বিশেষ করে অর্থনৈতিক সাংবাদিকরা সে ব্যাপারে কোনো কথাই বলছে না। কারণ বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতির যে রমরমা অবস্থা, এর মূলে রয়েছে এই প্রযুক্তির অতি ব্যবহার। তাই এর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করলে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা টিকতে পারবে না। ফলে তারাও এখন এই প্রযুক্তির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারকে শুধু যে মেনে নিয়েছে তাই নয়, সেই সঙ্গে একে উৎসাহিতও করছে। উন্নত দেশে একটি সেলুন দিতে গেলেও নির্ধারিত রেগুলেশন মেনে চলতে হয়। এখানে সবকিছুই চলে কোনো না কোনো রেগুলেশন বা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকে। অথচ প্রযুক্তির ব্যবহার বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম চলছে কোনো রকম রেগুলেশন বা নিয়ন্ত্রণ বা জবাবদিহিতা ছাড়াই। এই নিয়ন্ত্রণহীন প্রযুক্তির লাগামহীন ব্যবহার যে দীর্ঘ মেয়াদে সমাজে ভয়ংকর ক্ষতির কারণ হবে, তা জানা সত্ত্বেও এখনকার অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা শুধু নীরবই থাকছে না, এর পক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন করে সংবাদ ও মতামত প্রকাশ করে চলেছে। আর এটাই বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মানবসভ্যতার জন্য যে ভয়ংকর এক হুমকি হতে পারে, তা মোটামুটি নিশ্চিত করেই বলা যায়। কিন্তু উন্নত বিশ্বের যে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা, সেখানে এর বিরুদ্ধে কথা বলা তো দূরের কথা, উলটো এই প্রযুক্তিকে উৎসাহিত বা প্রমোট করে সংবাদমাধ্যম ভূমিকা রেখে চলেছে। হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউয়ের মতো জার্নালও এই প্রযুক্তির পক্ষে মতামত ও বিশ্লেষণ প্রকাশ করে চলেছে। আমেরিকার বর্তমান অর্থনীতি হাতেগোনা বিশেষ করে পাঁচ-ছয়টি বৃহৎ প্রযুক্তি কোম্পানির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে এবং সেগুলো হচ্ছে ফেসবুক, অ্যামাজন, অ্যাপল, নেটফ্লিক্স, গুগল। গুটিকয়েক কোম্পানির ওপর অতিমাত্রায় নির্ভর করা যে কোনো অর্থনীতির জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ, তা জানা সত্ত্বেও এ সময়ের অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা নীরব, বরং এই ব্যবস্থার পক্ষেই কিছুটা সরব। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যে সমাজে মারাত্মক এক ক্ষতি করে চলেছে, এখানে অবলীলায় চলছে ঘৃণা ছড়ানোর কাজ বা হেট ক্রাইম। এই মাধ্যম বিশেষ করে ফেসবুকের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত তথ্যের অপব্যবহার, এমনকি ফেসবুকের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারেরই রয়েছে অভিযোগ। তারপরও এসবের বিরুদ্ধে বর্তমান সময়ের অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা শুধু নীরব ভূমিকাই গ্রহণ করেছে তাই নয়, এর পক্ষেও সংবাদ বা মতামত প্রকাশ করে একরকম উৎসাহই দিয়ে আসছে। বর্তমান সময়ের অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার ধরনই এমন হয়েছে যে, তাদের ভূমিকা হতে হবে বর্তমান অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার সহায়ক, বিরুদ্ধ বা সংশোধন নয়। কেউ যদি ইকোনমিস্ট, হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউ, ওয়ালস্ট্রিট জার্নালের মতো বিশ্ববিখ্যাত সব পত্রিকা বা জার্নালে আজ থেকে ৩০ বছর আগে প্রকাশিত অর্থনীতির সংবাদ, মতামত বা সমালোচনা এবং বর্তমানে প্রকাশিত অর্থনীতির সংবাদ, মতামত বা সমালোচনার পাশাপাশি পাঠ করেন তাহলে তারা অবাক হয়ে যাবেন যে একই পত্রিকা বা জার্নাল কীভাবে বৈপরীত্য দেখাতে পারে। হ্যাঁ পারে, আর পারে এই কারণে যে, বর্তমান যুগের অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার বৈশিষ্ট্যই তাদের এমনটা করতে শিখিয়েছে। এটাই এখন স্বাভাবিক, এটাই এখন বাস্তবতা।

বাংলাদেশে অর্থনীতির সাংবাদিকতা

বাংলাদেশের অভাবনীয় অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা এবং সেই সঙ্গে গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রসারের কারণে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায়ও এসেছে আমূল পরিবর্তন। আমাদের দেশে এখন অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা এক বিশাল ক্ষেত্র। প্রতিটা পত্রিকায় এখন অর্থনীতির সংবাদ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয়। প্রতিদিন প্রথম পাতায় কোনো না কোনো অর্থনীতির সংবাদ প্রধান শিরোনাম দিয়ে প্রকাশ করার পাশাপাশি পত্রিকার কয়েকটি পৃষ্ঠা বরাদ্দ থাকে দেশের অর্থনীতির সংবাদ এবং বিশ্লেষণের জন্য। শুধু তাই নয়, অর্থনীতির বিভিন্ন খাত যেমন: মুদ্রাবাজার, পুঁজিবাজার, ব্যাবসাবাণিজ্য, শিল্প খাত, আমদানি-রপ্তানি নিয়ে পৃথক পৃথক পৃষ্ঠায় সংবাদ এবং বিশ্লেষণ প্রকাশ করা হয় গুরুত্ব দিয়ে। এর পাশাপাশি অর্থনীতিসংক্রান্ত অনেক কলাম ও মতামতও প্রকাশিত হয় নিয়মিত। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায়ও দেশের অর্থনীতির নানা বিষয় নিয়ে প্রতিদিন, এমনকি কখনো কখনো দিনে একাধিকবার বিশেষ প্রতিবেদন বা অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। গণমাধ্যমের অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা এখন এক বিশাল কর্মক্ষেত্র, যেখানে অসংখ্য মেধাবী, অভিজ্ঞ ও পেশাদার অর্থনৈতিক সাংবাদিক এবং অর্থনীতিবিদ কাজ করেন। এসব কিছুই দেশে প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার সাক্ষ্য বহন করে।

দেশের অর্থনৈতিক সাংবাদিকতাকে আরও সমৃদ্ধ হতে হবে

দেশের গণমাধ্যমে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা বিভাগ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রাখলেও এই বিভাগকে আরও বেশি সমৃদ্ধ হতে হবে। এখানে আরও বেশি পেশাদারির স্বাক্ষর রাখতে হবে। উন্নত বিশ্বে যেভাবে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা এখন কাজ করছে, সেখান থেকে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা অনেকটাই পিছিয়ে আছে। এর অনেক কারণের মধ্যে অবশ্য একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে–এই খাতে অর্থ বা সম্পদের সীমাবদ্ধতা। তাছাড়া আমাদের দেশের অর্থনীতির সংবাদের অনেক সূত্রই হচ্ছে রাজনৈতিক বক্তব্য। অথচ রাজনৈতিক বক্তব্য কখনই অর্থনৈতিক সংবাদের উপাদান হতে পারে না। রাজনৈতিক বক্তব্য কোনো তথ্যপ্রমাণভিত্তিক হয় না এবং এগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সামনে রেখে দেওয়া হয়। এ কারণেই একই বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যখন বক্তব্য দেয়, তখন এর সারমর্ম একেক স্থানে একেক রকম হয়। এসব বক্তব্য রাজনৈতিক সংবাদ হতেই পারে; কিন্তু অর্থনৈতিক সংবাদ কখনই নয়। তবে মুশকিল হয় তখনই, যখন আমাদের দেশে সুশীলসমাজের একাংশের প্রতিনিধি এবং অনেক পেশাদার সংস্থা থেকেও এমন বক্তব্য দেওয়া হয়, যেগুলো রাজনৈতিক বক্তব্যের মতোই তথ্যপ্রমাণভিত্তিক নয়। আর এরকম সুশীলসমাজের প্রতিনিধি বা পেশাদার সংস্থার বক্তব্যকে উপাদান হিসাবে নিয়ে যদি অর্থনৈতিক সংবাদ পরিবেশন করা হয় এবং বিশ্লেষণ বা মতামত প্রকাশ করা হয়, তখনই বিপত্তি ঘটে এবং সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার যে বর্তমান বৈশিষ্ট্য তা ক্ষুণ্ন

হয় এবং এটাই আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় অহরহ ঘটছে। কিন্তু আমাদের দেশের সুশীলসমাজের একাংশের প্রতিনিধিদের এবং কোনো কোনো পেশাদারি সংস্থার এমন অনুমাননির্ভর বা কখনো কখনো মনগড়া মন্তব্যের পাশাপাশি যদি সঠিক অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা তুলে ধরতে হয়, তাহলে এই খাতে যে ধরনের সম্পদ বা বিনিয়োগের প্রয়োজন, তা আমাদের দেশের সংবাদমাধ্যমে নেই। আমাদের দেশের সুশীলসমাজের একাংশের প্রতিনিধি এবং একটি পেশাদার সংস্থা থেকে এমন অভিযোগ প্রায়ই তোলা হয় যে দেশ থেকে এত হাজার কোটি টাকা বা লক্ষ কোটি টাকা পাচার হয়ে গেছে। এই ধরনের বক্তব্য কোনো পেশাদার সংস্থা থেকে দিতে হলে তাদের নির্দিষ্ট করে বলতে হবে দেশের কোথা থেকে অর্থাৎ সরকারি কোষাগার না কালোবাজার থেকে এই অর্থ পাচার হয়েছে। তেমনই বলতে হবে কোন মাধ্যমে অর্থাৎ হুন্ডি না ব্যাংকিং চ্যানেলে এই অর্থ পাচার হয়ে বিদেশে চলে গেছে। তাদের আরও পরিষ্কার করতে হবে যে, ব্যাংকের মাধ্যমে পাচার হলে কোন ব্যাংকের মাধ্যমে এই অর্থ বিদেশে পাঠানো হয়েছে বা হুন্ডির মাধ্যমে গেলে সিঙ্গাপুর না মধ্যপ্রাচ্য চ্যানেল দিয়ে পাচার হয়েছে, তাও স্পষ্ট করে বলতে হবে। শুধু তাই নয়, তাদেরকে এটাও বলতে হবে যে বিশ্বের কোন কোন দেশে এই অর্থ পাচার হয়ে জমা হয়েছে। এর থেকেও বড়ো কথা, বর্তমানে বিশ্বের সব দেশে বিশেষ করে উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কঠোর মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন বলবৎ থাকা অবস্থায় সেখানে এই অবৈধ অর্থ পাচার হলো কীভাবে। এসব কিছু না উল্লেখ করে সুশীলসমাজের একাংশের পক্ষ থেকে বা পেশাদার সংস্থার পক্ষ থেকে ঢালাওভাবে মন্তব্য করলে তা কখনই অর্থনৈতিক সাংবাদ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। এখন সংবাদমাধ্যমের যদি এই অর্থ পাচার সম্পর্কে সঠিক গবেষণা থাকত, তাহলে সেই গবেষণার ওপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে উল্লেখ করতে পারত যে তাদের নিজেদের তথ্য বা গবেষণা মোতাবেক বছরে অবৈধভাবে অর্থ পাচারের পরিমাণ কত। তখন জনগণ বুঝতে পারত সঠিক অর্থনৈতিক অবস্থা। একইভাবে ঢালাওভাবে মন্তব্য করা হয় যে দেশে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হলেও ধনী-গরিবের বৈষম্য অনেক বেড়ে গেছে। এটাই তো স্বাভাবিক। কেননা অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হচ্ছে মুক্তবাজার অর্থনীতিকে অনুসরণ করে। আর মুক্তবাজার অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যই তো তাই। ধনী আরও ধনী হবে, আর গরিব আরও গরিব হবে। সমগ্র বিশ্বে এক শতাংশ সম্পদশালী বনাম নিরানব্বই শতাংশ সম্পদহীন এখন এক প্রতিষ্ঠিত সত্য। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা এ ব্যাপারে কোনো কথাই বলে না। কারণ, বলে লাভ নেই। তারা ভালো করেই জানে যে, মুক্তবাজার অর্থনীতি মানতে হলে এই অব্যবস্থা মানতে হবে। তারা দেখার চেষ্টা করে যে আয়বৈষম্য বৃদ্ধি পেলেও সার্বিকভাবে যে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয় তাতে সাধারণ মানুষেরও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায় এবং সবাই সম্পদশালী না হলেও খেয়ে-পরে ভালো থাকতে পারে। আর এটাই বর্তমান বিশ্বের অর্থনীতির বড়ো সফলতা এবং এই সফলতাকেই বর্তমান যুগের অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা সঠিকভাবে তুলে ধরার মধ্যে তাদের সার্থকতা খুঁজে পায়। আরও একটি বিষয় প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ না করলেই নয়। আমাদের দেশের যুগান্তকারী সব অবকাঠামো নির্মাণের সফলতাকে প্রশ্নবিদ্ধ বা খাটো করার অভিপ্রায়ে সব সময় বলা হয় প্রকল্প সময়মতো শেষ হয়নি, প্রকল্প ব্যয় বেড়ে গেছে প্রভৃতি। দু-একটি বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত বাদ দিলে বিশ্বের কোনো প্রকল্প সময়মতো সম্পন্ন হয় না এবং প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি খুবই নিয়মিত ঘটনা। 'প্রজেক্ট কস্ট ওভার রান' সেই বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকে পড়ে আসছি এবং আজও পড়ছি। এসব বিষয় সঠিক বিশ্লেষণ দিয়ে, অর্থনৈতিক জ্ঞান দিয়ে এবং তথ্যপ্রমাণ দিয়ে উপস্থাপন করাই আজকের দিনের অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা। সেই বিবেচনায় আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা এখনো সেই পর্যায়ে যেতে পারেনি; কিন্তু সেখানে অবশ্যই পৌঁছাতে হবে।

> নানা প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দেশের অগ্রসরমান গণমাধ্যমের অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা যে এগিয়েছে অনেকদূর, তাতে দ্বিমত প্রকাশের কোনো অবকাশ নেই

অর্থনৈতিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা

অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় যারা নিয়োজিত থাকবেন, তাদের অবশ্যই ভালো বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান থাকতে হবে। একজন অর্থনীতিবিদ যে মানের জ্ঞানের অধিকারী, তার সমান বা অধিক জ্ঞানের অধিকারী হতে হয় অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের। তবে এর অর্থ এই নয় যে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় দায়িত্ব পালন করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিষয়ে শিক্ষার্জন করতে হবে। অর্থনীতি বিষয় নিয়ে শিক্ষালাভ করতে পারলে ভালো। তবে না করলেও অর্থনীতি বিষয়ে ভালো জ্ঞান এবং স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। আমি অনেককে দেখেছি অর্থনীতি বিভাগে লেখাপড়া করেছে; কিন্তু শিক্ষাজীবন শেষে অর্থনীতির বিষয় নিয়ে তেমন চর্চা করেনি। ফলে অর্থনীতির অনেক মৌলিক ধারণাও ঠিকমতো মনে রাখতে পারেনি। আবার এমন অনেককে দেখছি, যারা অর্থনীতির ছাত্র না হয়েও শুধু ব্যক্তি উদ্যোগে পড়াশোনা ও চর্চার মাধ্যমে অর্থনীতির অনেক বিষয়ে ভালো জ্ঞান লাভ করেছেন এবং অর্থনীতির সমসাময়িক অনেক বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা রাখতেন। মোট কথা, অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় নিয়োজিত হতে চাইলে তাকে অর্থনীতি বিষয়ে ভালো জ্ঞান এবং স্বচ্ছ ধারণা অবশ্যই লাভ করতে হবে, তা সে প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই হোক আর অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবেই হোক।

অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় আধুনিক অর্থনীতির প্রয়োগ

অর্থনীতির জ্ঞান বলতে আমরা সাধারণত ব্যষ্টিক অর্থনীতি বা মাইক্রো ইকোনমিক্স, সামষ্টিক অর্থনীতি বা ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এবং উন্নয়ন অর্থনীতি বা ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্স সম্পর্কে জ্ঞান থাকার কথাই বুঝে থাকি। অর্থনীতি বুঝতে হলে অর্থনীতির এসব মৌলিক বিষয় সম্পর্কে তো ভালো ধারণা রাখতেই হবে। এর পাশাপাশি আধুনিক অর্থনীতির কনসেপ্ট সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে। আধুনিক মুদ্রানীতি বা মানিটরি পলিসি এবং আর্থিক নীতি বা ফিসক্যাল পলিসি সম্পর্কে শুধু ভালো ধারণা রাখাই যথেষ্ট নয়, সেই সঙ্গে সরকার বা নীতিনির্ধারকদের এই আধুনিক মুদ্রানীতি এবং আর্থিক নীতি গ্রহণে উৎসাহ জোগানও অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। যেমন শতবছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ড ছেড়ে আমেরিকা ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হাতে নিয়েছে। বিশ্বের অনেক উন্নত দেশই দীর্ঘমেয়াদি বন্ড ছেড়ে দেশের উন্নয়ন ব্যয় মেটাতে শুরু করেছে এবং যথেষ্ট সফল হয়েছে। কোনো কোনো উন্নয়নশীল দেশ বিশেষ করে যাদের সার্বভৌম বা সোভারেইন রেটিং ভালো, তারাও দীর্ঘমেয়াদি বন্ড ছেড়ে দেশের উন্নয়ন কাজে বিনিয়োগের অর্থ সংগ্রহ করছে। আমাদের দেশে যেভাবে অবকাঠামো নির্মাণে দীর্ঘমেয়াদি মেগা প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, এর জন্য বিনিয়োগের অর্থ দীর্ঘমেয়াদি বন্ড ছেড়ে সরকার খুব সহজেই সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের গণমাধ্যমের যে অংশ অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় নিয়োজিত, তারা এ ব্যাপারে সরকারকে সেভাবে পথ দেখাতে পারেনি। তেমনই 'কোয়ান্টেটিভ ইজিং' এখন উন্নত বিশ্বে সবচেয়ে আলোচিত এবং গ্রহণযোগ্য মুদ্রানীতির একটি হাতিয়ার, যা ব্যবহার করে উন্নত বিশ্ব তাদের অর্থনীতির উত্থানপতন খুব সফলভাবেই মোকাবিলা করতে পেরেছে। অথচ এমন একটি সফল মুদ্রানীতি আমাদের দেশেও যে চালু করা যেতে পারে এবং এই নীতি ব্যবহার করে যে সরকার দেশের অর্থনীতির অগ্রযাত্রা আরও ত্বরান্বিত করতে পারে, তেমন ধারণা সরকারের সামনে তুলে ধরা বা এ ব্যাপারে এক্সপার্ট ওপেনিয়ন সৃষ্টি করতে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা বিভাগ কোনো ভূমিকাই রাখতে পারেনি। এখন উন্নত বিশ্বে আধুনিক মুদ্রানীতি বা মডার্ন মানিটরি থিওরি (এমএমটি) খুবই আলোচিত মুদ্রানীতি। এমএমটির প্রবক্তারা অনেক উপদেশের মধ্যে একটি উপদেশ দিয়েছেন এই বলে যে, এখন আর সরকারের বর্ধিত ব্যয়নির্বাহের জন্য ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনমতো টাকা ছাপিয়ে নিলেই চলবে। আর এমএমটির এই ধারণা ব্যবহার করেই উন্নত বিশ্বের অনেক দেশ করোনা মহামারির কারণে সংকটময় অর্থনীতি টিকিয়ে রাখতেই যে সক্ষম হয়েছে তাই নয়, অর্থনীতির অগ্রযাত্রাও অব্যাহত রাখতে পেরেছে। এমএমটির এই ধারণা থেকেই নোবেল বিজয়ী এমআইটির অর্থনীতিবিদ অভিজিত বিনায়ক ব্যানার্জি ভারতে এবং আমাদের দেশে বলার চেষ্টা করেছেন যে, করোনাকালীন অর্থনীতি টিকিয়ে রাখতে হলে এসব দেশের সরকারকে টাকা ছাপিয়ে জনগণকে দিয়ে তাদের ক্রয়ক্ষমতা ধরে রাখতে হবে। অথচ তার এই বক্তব্য কেউ আমলেই নেয়নি। এমএমটির একই ধারণা শুধু আধুনিক অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় প্রচলিত থাকায় উন্নত বিশ্বের অনেক দেশ গ্রহণ করতে পেরেছে এবং উপকৃত হয়েছে। অথচ এই একই থিওরি অভিজিত ব্যানার্জি বারবার উল্লেখ করা সত্ত্বেও ভারতে বা আমাদের দেশে কারও দৃষ্টিতে সেভাবে আসেনি শুধু আধুনিক অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার অভাবে। এ কারণেই আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার মান এমনভাবে উন্নত করতে হবে যাতে সেখানে আধুনিক অর্থনীতির প্রয়োগ ঘটানো যায়।

গবেষণাই অর্থনীতির সাংবাদিকতার মূল লক্ষ্য

অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার বড়ো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ব্যাপক গবেষণা। উন্নতমানের গবেষণা ছাড়া মানসম্পন্ন অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। আমাদের দেশে গবেষণার অবস্থা খুবই হতাশাজনক। অর্থনীতির বিষয় নিয়ে সেভাবে গবেষণা আমাদের দেশে হয় না। আর সংবাদমাধ্যমে অর্থনীতির জন্য স্বতন্ত্র গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করার ধারণা নেই বললেই চলে। এখানে গবেষণা বলতে বিভিন্ন সময় পত্রিকা বা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত অর্থনীতিসংক্রান্ত তথ্য বা সংবাদ সংরক্ষণ করে রাখাকেই বোঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু এসব পদক্ষেপে তথ্য সংগ্রহ হলেও কোনো অবস্থাতেই তা গবেষণা বা তথ্যভান্ডার নয়। যেসব গণমাধ্যম প্রকৃত অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করবে, তাদেরকে অবশ্যই একটি নিজস্ব বিশ্বাসযোগ্য অর্থনীতির তথ্যভান্ডার গড়ে তুলতে হবে এবং সেই সঙ্গে একটি মানসম্পন্ন গবেষণাকেন্দ্র পরিচালনা করতে হবে। আর এই গবেষণার ওপর ভিত্তি করে সব ধরনের অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা চালাতে হবে। সরকারের কোনো অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত বা সুশীলসমাজ বা পেশাদার সংস্থার কোনো মন্তব্য বা বিশ্বের কোনো অর্থনৈতিক সংবাদের ওপর প্রতিবেদন, মতামত বা বিশ্লেষণ প্রকাশের সময়ে নিজস্ব গবেষণা কী বলে, তাও তুলে ধরতে পারলে প্রকৃত এবং যুগোপযোগী অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য অর্জন হবে। বিশ্বে যেসব গণমাধ্যম বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা করে থাকে, তাদের সবারই আছে নিজস্ব সমৃদ্ধ তথ্যভান্ডার এবং মানসম্পন্ন গবেষণাকেন্দ্র। ব্লুমবার্গ, ইকোনমিস্ট, ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল, ফরচুন, রয়টার বিশ্বের সবচেয়ে

নামকরা সংবাদমাধ্যম, যাদের প্রত্যেকের আছে শক্তিশালী অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা। এসব সংবাদমাধ্যমের প্রতিটিরই আছে নিজস্ব তথ্যভান্ডার ও গবেষণাকেন্দ্র। এসব সংবাদমাধ্যম তাদের নিজস্ব তথ্যভান্ডার ও গবেষণাকেন্দ্র এতটাই স্বাধীন, সমৃদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য করে তুলতে সক্ষম হয়েছে যে তাদের গবেষণার ফলাফল বা প্রতিবেদন নিয়ে কেউ কখনই প্রশ্ন তো তুলেই না, বরং তাদের গবেষণার ফলাফল বা প্রতিবেদনকে যারপরনাই বিশ্বাস করে। এমনকি এসব সংবাদমাধ্যমের অর্থনীতির তথ্যভান্ডার ও গবেষণাকেন্দ্র থেকে অনেক প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় তথ্য ক্রয় বা সংগ্রহ করে থাকে। আমাদের দেশের সংবাদমাধ্যমে যদি সত্যিকার অর্থে আধুনিক অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা অনুসরণ করতে হয়, তাহলে তাদেরকে নিজস্ব তথ্যভান্ডার ও গবেষণাকেন্দ্র রাখতেই হবে। যেহেতু বিষয়টির সঙ্গে ভালো অঙ্কের বিনিয়োগ এবং অর্থ ব্যয়ের বিষয় জড়িত, তাই অনেক পত্রিকা বা টেলিভিশন চ্যানেল এককভাবে সেটা করতে সক্ষম নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো কোনো গ্রুপ এরকম অর্থনীতির ডেটাবেজ ও গবেষণাকেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে পারে। রিপোর্টার্স ইউনিটি, সংবাদপত্র পরিষদ, অর্থনৈতিক সাংবাদিক ফোরাম বা ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টার্স গ্রুপ চাইলে এরকম উদ্যোগ নিতে পারে। প্রাথমিক ব্যয়নির্বাহের জন্য সরকার থেকে কিছু আর্থিক সহায়তা দেওয়া যেতে পারে। মোট কথা, প্রকৃত অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা অনুসরণ করতে হলে নিজস্ব ডেটাবেজ এবং গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনের কোনো বিকল্প নেই। তাই উদ্যোগটি যত দ্রুত গ্রহণ করা যায়, ততই মঙ্গল।

বিশ্ব অর্থনীতি যে অবস্থানে উপনীত হয়েছে, এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্ব গণমাধ্যমেও অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা ভালোভাবেই তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম হয়েছে এবং অর্থনীতির অগ্রযাত্রায় সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারছে। আমাদের দেশের অর্থনীতিরও অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে। আগামী দিনে অর্থনীতির অগ্রযাত্রা আরও ত্বরান্বিত হবে, টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই উন্নতির সঙ্গে শামিল হতে এবং এই ধারাকে সহায়তা দিতে আমাদের দেশের সংবাদমাধ্যমও যথেষ্ট সফল হয়েছে। নানা প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দেশের অগ্রসরমান গণমাধ্যমের অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা যে এগিয়েছে অনেকদূর, তাতে দ্বিমত প্রকাশের কোনো অবকাশ নেই। অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা আমাদের দেশের বিশাল গণমাধ্যমের এক প্রতিষ্ঠিত ক্ষেত্র। দেশের অর্থনীতির ভালো-মন্দ সব খবর মানুষ মুহূর্তের মধ্যে জানতে পারে এই অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার বদৌলতেই। চলে সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের চুলচেরা বিশ্লেষণ, যা থেকে সরকার, জনগণসহ প্রত্যেক স্টেকহোল্ডার যারপরনাই উপকৃত হয়। সত্যি বলতে কী, আমাদের দেশে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা এক স্বীকৃত বাস্তবতা। প্রয়োজন শুধু একে একটি মানসম্পন্ন অবস্থার ওপর দাঁড় করানো এবং আধুনিক ও উন্নত মানের করে গড়ে তোলা। সংবাদমাধ্যমের নিজস্ব সমৃদ্ধ তথ্যভান্ডার তৈরি এবং গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনসহ কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এই কাজটি খুব সহজেই করা সম্ভব।

লেখক: সিপিএ, সিএমএ, সিএএমএস, ব্যাংকার
কমপ্লায়েন্স স্পেশালিস্ট এবং কলাম লেখক, টরেন্টো, কানাডা

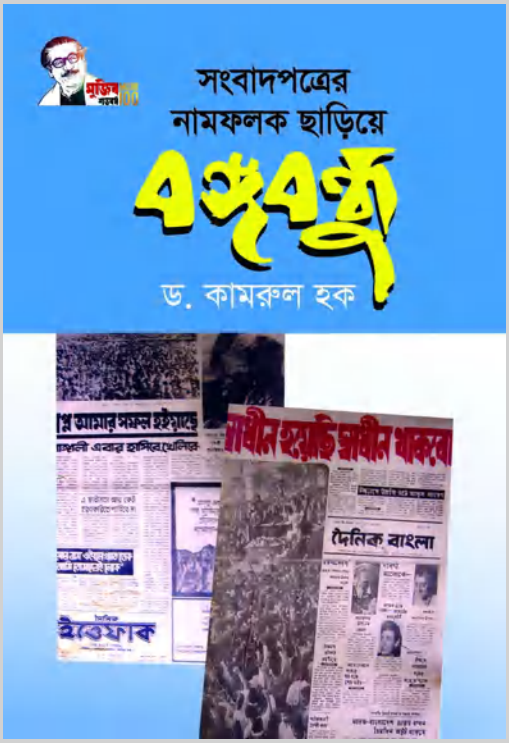

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

স্বাধীনতার ৫০: উন্নয়ন অভিযাত্রায় অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা

জামাল উদ্দীন

স্বাধীনতার ৫০ বছরে অনেক দূর এগিয়েছে বাংলাদেশ। দরিদ্র, বন্যা ও খরাপীড়িত দেশের তালিকা থেকে উঠে এসে বাংলাদেশ আজ মধ্যম আয়ের সারিতে। লক্ষ্য এখন উন্নত দেশের তালিকায় যাওয়া। স্বাধীনতার শুরুতে মাত্র ৭৮৬ কোটি টাকার ব্যয় সক্ষমতার দেশটি আজ ব্যয় করছে ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা, যা ৭৬৭ গুণ বেশি। জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সাফল্য এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যে পথচলার এই সময়ে সংবাদকর্মীদের ভূমিকাও কম নয়। বেসরকারি খাত যেমন প্রবৃদ্ধির সহায়ক, তেমনই সাংবাদিকতা বিশেষত বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা উন্নয়ন অভিযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

স্বাধীনতা-পূর্বকালে বঞ্চনা আর বৈষম্যের ইতিহাস সামলে একাত্তর-পরবর্তী সময়ে অর্থনীতিতে যে নবযাত্রা সূচিত হয়, এর অন্যতম জোগানদানকারী পণ্য ছিল সোনালি আঁশ পাট। পাট ছিল অর্থকরী ফসল। বর্তমানে পণ্যবৈচিত্র্যের ভরপুর রপ্তানি ঝুড়ি, তথাপি এককভাবে গার্মেন্ট এগিয়ে। এসবেরই তথ্য ছিল সংবাদপত্রে নানাভাবে। তবে শুরুতেই এখনকার মতো পাতাজুড়ে অর্থনীতি কিংবা ব্যাবসার খবর প্রকাশ পেত না। বলে রাখি, বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার আদ্যোপান্ত এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। তবে সামান্য ধারণা পাওয়া যাবে পর্যায়ক্রমে কীভাবে এর বিস্তৃতি ঘটেছে। আসলে অর্থনীতি-ব্যাবসাবাণিজ্যের বিস্তারের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সাংবাদিকতারও বিস্তার ঘটেছে। অন্যান্য সংবাদের মতো এক্ষেত্রে নেতিবাচক বা ইতিবাচক সংবাদ দুই-ই প্রকাশ পেয়েছে। তবে নেতিবাচক সংবাদ ঠিক নেতিবাচক অর্থে নয়–সংশোধনের জন্য, নীতিনির্ধারণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো তুলে আনাই ছিল মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি 'রসকষহীন' বিষয়গুলো সাধারণকে জানানোর কাজটিও করেছেন অর্থনৈতিক সাংবাদিকরা। বাংলাদেশের অর্থনীতি যেমন নানা পণ্য, সেবায় বৈচিত্র্যে ভরা, তেমনই অর্থনৈতিক সাংবাদিকতারও উৎকর্ষ হয়েছে। বড়ো হয়েছে ক্ষেত্র। এখন জাতীয় পত্রিকা কিংবা টেলিভিশনগুলোয় অর্থ-বাণিজ্য বিভাগ চালু রয়েছে। মূলত নব্বইয়ের দশকে গণতন্ত্রের নবযাত্রায় বিস্তৃতি ঘটেছে আজকের অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার। অর্থ-বাণিজ্যবিষয়ক দৈনিকও অনেক। রয়েছে অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের স্বতন্ত্র সংগঠন 'ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম'। এই ফোরামের প্রতিষ্ঠাতারাসহ হাতেগোনা কয়েকজনই মূলত অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রভূমি তৈরিতে বড়ো

ভূমিকা রাখেন। তখনকার দিনে বাজেট, পাট, আমদানি-রপ্তানি, রিজার্ভ, সরকারি ব্যাংকসহ কিছু নির্দিষ্ট খাত ছিল অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার মূলকেন্দ্র। ওই সময় অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবেও অনেকে অর্থনীতি বিটে কাজ করেছেন। যাদের অনেককেই আমরা সহকর্মী হিসাবে পেয়েছি। কেউ প্রয়াত হয়েছেন, কেউ এখনো পেশায় সক্রিয় রয়েছেন। সবার নাম মনে না এলেও উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে ছিলেন নূর মোহাম্মদ (সর্বশেষ কর্মস্থল দৈনিক জনকণ্ঠ), সৈয়দ কামাল উদ্দিন (ফারইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ), মোয়াজ্জেম হোসেন (ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস), রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ (নিউজ টুডে), এরশাদ মজুমদার (রিপোর্টার), মনোয়ার হোসেন, জাহিদুজ্জামান ফারুক, শামসুল হক জাহিদ, অজয় দাশ গুপ্ত, শামসুল আলম বেলাল, কাসেম হুমায়ুন, কামরুল ইসলাম চৌধুরী, আবুল বাশার, আবুল কাশেম প্রমুখ। আরও কয়েকজনের ভূমিকাও উল্লেখ করতে হয়। সংবাদের বজলুর রহমান, অবজারভারের ইকোনমিক এডিটর শামসুল হুদা প্রমুখ।

নব্বইয়ের দশকে এসে 'মিডিয়া বুম' ঘটে। এরশাদ পতনের পর গণতান্ত্রিক ধারায় অনেকেই সংবাদপত্রে বিনিয়োগে এগিয়ে আসেন। এ সময় নতুন প্রজন্মও এগিয়ে আসে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায়। মূলত নব্বইয়ের দশকে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা বিস্তৃতিকালের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হচ্ছেন–সানাউল্লাহ লাবলু, ইনাম আহমেদ, সাইফুল আমিন, শওকত হোসেন মাসুম, সাইফ ইসলাম দিলাল, জামাল উদ্দীন, বায়রন বিশ্বাস, শওগাত আলী সাগর, মাসুমুর রহমান খলিলী, সোহেল মনজুর, জিয়াউর রহমান, কাওসার রহমান, টিটু দত্ত গুপ্ত প্রমুখ। নব্বইয়ের দশকের শেষে এসে আরও অনেকেই যোগ দিয়েছেন। তবে যেহেতু লেখাটি গবেষণালব্ধ নয়, তাই আগের ও পরের কারও নাম বাদ পড়লে দুঃখ প্রকাশ করছি। এখানে উল্লেখ করতে হয়, দৈনিক পত্রিকার বাইরেও মাসিক ব্যাংকার, পাক্ষিক শিল্পবাজার ও সাপ্তাহিক অর্থকথা প্রকাশের মাধ্যমে অর্থনীতির পাঠক সৃষ্টির প্রয়াস ছিল।

নব্বইয়ের দশকের অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের সংখ্যা ছিল হাতেগোনা। তেমনই পত্রিকাগুলোরও পাতা বরাদ্দ ছিল কম। বিচ্ছিন্নভাবে সংবাদ ছাপা হতো। পুরোনো কয়েকটি পত্রিকায় সপ্তাহে অর্থনীতির পাতা ছিল। বেশির ভাগ পত্রিকায় এক-তৃতীয়াংশ পাতায় শেয়ারবাজারের লেনদেন তথ্য ছাপা হতো। বিচ্ছিন্নভাবে ফটো ক্যাপশন ছাপত কোনো কোনো কাগজে। মনে আছে, একবার ভোরের কাগজে সম্পাদক মতিউর রহমানের এক মিটিংয়ে হাজির ছিলাম। উপস্থিত সবার কাছে জানতে চাইলেন–পত্রিকায় আর কী করা যায়। নতুন কিছু আইডিয়ার জন্যই ওই মিটিংয়ের আয়োজন ছিল। আমি বললাম, শেয়ারবাজারের ছকটি যে পাতায় ছাপা হয়, সেটি পূর্ণাঙ্গভাবে অর্থ-বাণিজ্যবিষয়ক রিপোর্টের জন্য বরাদ্দ দেওয়া যেতে পারে। তখনও বাংলাদেশে কোনো পত্রিকায় দৈনিক পূর্ণ পৃষ্ঠা অর্থ-বাণিজ্যের জন্য বরাদ্দ ছিল না। মতি ভাই যুক্তি চাইলেন। বললাম, ব্যাবসা বিস্তৃত হচ্ছে। করপোরেটের সংবাদ ছাপলে বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন দুটোই বাড়বে। মতি ভাই নোট নিলেন। এর কিছুদিন পরই ফুল পেজ হলো। লাবলু ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে, সাগর ভাইও ছিলেন। তারপর তো ইতিহাস। প্রথম আলো বের করলেন মতি ভাই, শুরু থেকেই দুই পৃষ্ঠা অর্থবাণিজ্য। এখন বেশির ভাগ পত্রিকা দুই পৃষ্ঠা নিয়মিত আয়োজনের বাইরেও নতুন নতুন অনেক কিছু করছে। এই যে বিস্তৃতি, তা সম্ভব হয়েছে গতিশীল বেসরকারি খাত এবং সরকারের সহায়ক নীতির কারণেই। এই নীতি গ্রহণেও সংবাদপত্র তথা অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তাদের অবদান কোনো অংশে কম নয়।

দৈনিক ইত্তেফাকে 'অর্থনীতির পাতা' ছিল সাপ্তাহিক। 'শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য' নামে করপোরেটের কিছু ক্যাপশন নিউজ ছাপা হতো। পরবর্তী সময়ে আমার দায়িত্বে একটি পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্য পাতা চালু করি। এমনকি সাপ্তাহিক অর্থনীতির পাতার বাইরে 'ইত্তেফাক অর্থনীতি' নামে প্রতি সপ্তাহে চার পৃষ্ঠার একটি বিশেষ সংখ্যাও ইত্তেফাক প্রকাশ করে। যার সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলাম আমি। ওই চার পাতার রংও ছিল ভিন্ন।

অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, উন্নয়ন সাংবাদিকতায় পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন অনেকেই। ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ), ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিসহ অন্যান্য সংগঠন/সংস্থা কর্তৃক তুলনামূলক রিপোর্টিংয়ে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় অনেকেই সাফল্য দেখিয়েছেন। জিতেছেন পুরস্কার। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও হচ্ছে। ফলে মিস রিপোর্টিং এখন হচ্ছে না বললেই চলে। একসময় বাজেট রিপোর্টিংয়ে বাজেটের প্রকৃত আকার মেলানো অনেকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এখন সবই সহজ হয়েছে। আগের মতো অনেক কিছুই গোপন না রেখে বাজেটের অনেক তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে। কিংবা বৈঠক শেষে ব্রিফিং করা হচ্ছে। ফলে তথ্যপ্রাপ্তি কিছুটা সহজও হয়েছে। যদিও এর একটি বড়ো কারণ ইলেকট্রনিক মিডিয়া।

এই যে বিস্তৃতি, তা সম্ভব হয়েছে গতিশীল বেসরকারি খাত এবং সরকারের সহায়ক নীতির কারণেই। এই নীতি গ্রহণেও সংবাদপত্র তথা অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তাদের অবদান কোনো অংশে কম নয়

পরিশেষে বলব, ৫০ বছরের অর্জন কম নয়। জাতি হিসাবে এই অর্জন গর্ব করার মতো। আজ আর আমাদের মঙ্গা নিয়ে লিখতে হচ্ছে না। অবকাঠামো খাতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মিত হয়েছে–সবই প্রবৃদ্ধি অর্জনের মসৃণ পথে ধাবিত করবে দেশকে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের স্লোগান কাউকে পেছনে রেখে নয়–সেই স্বপ্নও বাস্তবায়ন সময়ের ব্যাপার মাত্র। একই সঙ্গে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায়ও নতুন নতুন প্রজন্ম আসবে। নতুনরা পেশায় আরও উৎকর্ষ নিয়ে আসবে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে নতুন মোড় নেবে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা–সেই প্রত্যাশা আমাদের।

লেখক: দৈনিক ইত্তেফাকের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পাদক

এবং অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা

সুশান্ত সিনহা

সাংবাদিকতার পরিধি বাড়ছে, বাড়ছে ক্ষেত্র। খাতওয়ারি বিষয়ভিত্তিক সংবাদ করার সুযোগ তৈরি হয়েছে দেশে। নতুন দিনের নতুন সংবাদের খোরাক জোগাতে পত্রপত্রিকা, অনলাইন, রেডিয়ো, টেলিভিশনের সংখ্যা বাড়ছে দেশে। আর এ কারণেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের উত্তাল সময়ে মূলধারার গণমাধ্যমের অবস্থান এতটুকু কমেনি। বরং বেড়েছে সংবাদের চাহিদা-প্রসার। আর দর্শক-শ্রোতা-পাঠক বৃদ্ধির সঙ্গে বেড়েছে আয়। বিশেষ করে করোনাকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের জুজুর ভয় দেখানো গণমাধ্যমে সংবাদের উপাদান বহুগুণ বেড়েছে। এসবের মধ্যে বিটভিত্তিক অর্থনীতি ও বাণিজ্যবিষয়ক প্রতিবেদনের সংখ্যা ও চাহিদা বেড়েছে। তবে এখনো টেলিভিশনগুলোয় অর্থ-বাণিজ্যের সংবাদ করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। হয়তো মাধ্যমগত সীমাবদ্ধতার কারণে টেলিভিশনে অভিজ্ঞ অর্থনৈতিক প্রতিবেদকের ঘাটতি আছে বেশ। কারণ অনলাইন বা পত্রিকায় যতটা সহজে আর্থিক খাতের সংবাদ করা যায়, সেভাবে টেলিভিশনে ওই সংবাদ করা খানিকটা কঠিন ও সময়সাপেক্ষ ভিজুয়াল মিডিয়ায়।

অর্থনীতির জটিল বিষয়গুলো সহজবোধ্যভাবে সংবাদে তুলে ধরতে হলে আগে প্রতিবেদকের জানাশোনা-পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার বিকল্প নেই। কিন্তু চাইলেও একজন নবীন সাংবাদিকের পক্ষে খুব বেশি পড়াশোনা করার সুযোগ নেই। কারণ, গণমাধ্যমসংক্রান্ত নানা ধরনের বইপুস্তক থাকলেও অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার ওপর বই নেই বললেই চলে। কর্মরত সাংবাদিকদের মতো ১৫টির বেশি পাবলিক-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীরাও বিপাকে আছেন। ফলে শিক্ষার্থী ও সাংবাদিকদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি অর্থনৈতিক সাংবাদিকতাবিষয়ক বইপুস্তকের।

বর্তমানে দেশের রপ্তানিসহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বেড়েছে, সেই সঙ্গে বেড়েছে ব্যাংকিং খাতে অনিয়ম-দুর্নীতি। আগের চেয়ে দুর্নীতির পরিমাণের পাশাপাশি ধরন বদলে গেছে। মোবাইল ব্যাংকিং, বিকাশ-নগদ-রকেটসহ মোবাইল ফিন্যান্সিং বলা যায় বিপ্লব সাধিত হয়েছে আর্থিক খাতে। কেনিয়া থেকে শিখে এসে বাংলাদেশ এখন মোবাইলে টাকাপয়সা লেনদেনে বিশ্বের মধ্যে শীর্ষস্থানে পৌঁছেছে। ফলে এনজিও নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে এসে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে টাকা পৌঁছানো এখন নিমিষেই করা সম্ভব হচ্ছে। স্কুলের বৃত্তিসহ করোনাকালে নগদ প্রণোদনার

টাকারও বিতরণ করা গেছে নির্বিঘ্নে। প্রতিদিন শত শত কোটি টাকার লেনদেন হচ্ছে এই এমএফএস সেবার মাধ্যমে। এসব সেবার মাধ্যমে ঘরে বসে যে কোনো সময় পরিশোধ করা যাচ্ছে বিদ্যুৎ-পানি-গ্যাসসহ বিভিন্ন ধরনের ফি ও বিল। আবার ক্রেডিট ও ডেভিড কার্ডেও বাড়ছে লেনদেন। কেনাকাটায় উচ্চবিত্ত-উচ্চমধ্যবিত্ত এমনকি সাধারণ মধ্যবিত্ত এখন কার্ডে টাকা পরিশোধ করছে। প্রযুক্তির কারণে ঘরে বসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশের কাজ করে দেশে কোটি কোটি ডলার আনছে তরুণ উদ্যোক্তা-ফ্রিল্যান্সাররা। ব্যাংকিং খাতে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়ে যাওয়ায় হুন্ডি খানিকটা কমেছে। কিন্তু এখনো যথেষ্ট পরিমাণে রেমিট্যান্স আসছে হন্ডি বা অবৈধ পথে। বৈদেশিক বাণিজ্যসহ দেশের আর্থিক খাতে বড়ো ধরনের পরিবর্তন এনেছে ডিজিটালাইজেশন বা তথ্যপ্রযুক্তিব্যবস্থা। আবার প্রযুক্তিগত সেবা যেমন বেড়েছে, তেমনই হয়রানি ও অর্থ চুরির কৌশলও বদলে গেছে। এসব ধরতে ব্যাংকের কর্মকর্তাসহ তদারককারীদের গলদঘর্ম হতে দেখা যায় বিভিন্ন সময়। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে রিজার্ভ চুরির ঘটনাও যে কারণে বুঝতে অনেক সময় লেগেছে খোদ বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সরকারসংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর।

ওপরের উদাহরণগুলো উল্লেখ করার কারণ এই নয় যে, পাঠককে, বিশেষ করে সংবাদকর্মীদের তথ্যের ভারে ভারাক্রান্ত করা। একনজরে গেল দুই যুগে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি যেভাবে বেড়েছে, আর্থিক খাতের নতুন নতুন সেবা যুক্ত হয়েছে, সে সম্পর্কে গণমাধ্যমকর্মীদের সম্যক ধারণা থাকা জরুরি। এসব বিষয়ে জানাশোনা ভালো থাকলে প্রতিবেদন ভালোভাবে তৈরি করা যাবে। আবার একটির সঙ্গে আরেকটির আন্তঃসম্পর্কটা বোঝা জরুরি। যেমন ব্যাংকিং খাতের প্রাথমিক নিয়ন্ত্রক বাংলাদেশ ব্যাংক। আবার ব্যাংকগুলো পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হওয়ায় সেখানকার সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। এ কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক যখন ব্যাংকিং নিয়মকানুনে পরিবর্তন করে, তখন এর প্রভাব পুঁজিবাজারে কী পড়বে, সেটা অত্যন্ত বিবেচ্য বিষয়। একইভাবে বিমা কোম্পানির ক্ষেত্রে বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইডিআরএ-এর নেওয়া যে কোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পুঁজিবাজারের কথা ভাবতে হবে। একইভাবে বিএসইসির ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। সংগত কারণেই ব্যাংক-বিমা-পুঁজিবাজার বিটের প্রতিবেদককে দুদিকেই খেয়াল করতে হবে সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে।

কথা হচ্ছে, কেউ যদি দুদিকে খেয়াল না করে, তাহলে কি সংবাদ হবে না বা করা যাবে না? নিশ্চয় যাবে। এতে প্রতিবেদনটি তুলনামূলকভাবে দুর্বল হবে। সিদ্ধান্তের অভিঘাতের বিষয়গুলো খেয়াল করে প্রতিবেদন করলে তা নিঃসন্দেহে গুণে-মানে উন্নত হবে। একই ঘটনার সংবাদ করে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকার সুযোগ তৈরি করে। এতে সংবাদের ট্রিটমেন্ট বা কাভারেজও ভালো পায়। এর মাধ্যমে সাংবাদিকের ঘটনা পর্যালোচনা করে সংবাদ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। প্রশ্ন করার দক্ষতা-যোগ্যতাও বৃদ্ধি পায়। আর যে যত প্রাশ্নিক বা প্রশ্ন করে মীমাংসা করতে পারবে, সে তত ভালো সংবাদ উপকরণ বের করতে পারবে।

অনিয়মের দায়ে ২০১৫ সালের ১৬ নভেম্বরে বাতিল করা হয় পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি স্ট্যান্ডার্ড ইনসিওরেন্সের লাইসেন্স। এ বিষয়ে ১৭ নভেম্বরে একটি জাতীয় দৈনিকের সংবাদে বলা হয়: 'দুই দফা স্থগিতের পর স্ট্যান্ডার্ড ইনসিওরেন্স কোম্পানির বিমা ব্যবসায়ের লাইসেন্স এবার চূড়ান্তভাবে বাতিল করে দিয়েছে বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ)। দেশের আর্থিক খাতে লাইসেন্স বাতিলের ঘটনা এটাই প্রথম। আইডিআরএ লাইসেন্স বাতিলের সিদ্ধান্ত জানিয়ে গত রোববার কোম্পানিটিকে চিঠি দিয়েছে, যা ওইদিন থেকেই কার্যকর।'

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আবারও আলোচনায় আসে স্ট্যান্ডার্ড ইনসিওরেন্সের লাইসেন্স বাতিলের বিষয়টি। দুই নিয়ন্ত্রক সংস্থার মধ্যে সমন্বয়হীনতার বিষয়টি পরিণত হয় টক অব দ্য কান্ট্রিতে। ২০১৬ সালের ১৭ অক্টোবরের প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়: 'ব্যাংক-বিমা-পুঁজিবাজারসহ সমন্বয় সভায় বাংলাদেশ সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনকে (বিএসইসি) না জানিয়ে তালিকাভুক্ত স্ট্যান্ডার্ড ইনসিওরেন্সের লাইসেন্স বাতিল করায় বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) এর প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছে সংস্থাটি। একই সঙ্গে দেশের আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর বিভিন্ন সিদ্ধান্তে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছে বিএসইসি।

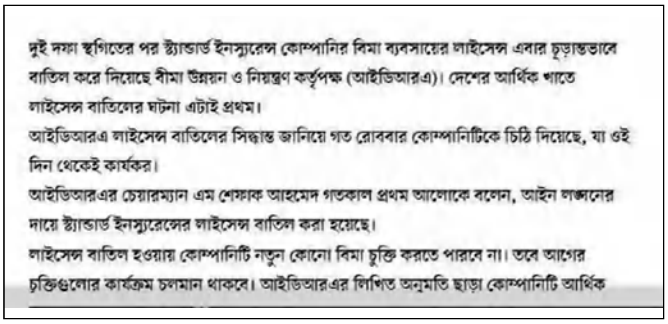
দুই দফা স্থগিতের পর স্ট্যান্ডার্ড ইনস্যুরেন্স কোম্পানির বিমা ব্যবসায়ের লাইসেন্স এবার চূড়ান্তভাবে বাতিল করে দিয়েছে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ)। দেশের আর্থিক খাতে লাইসেন্স বাতিলের ঘটনা এটাই প্রথম।
আইডিআরএ লাইসেন্স বাতিলের সিদ্ধান্ত জানিয়ে গত রোববার কোম্পানিটিকে চিঠি দিয়েছে, যা ওই দিন থেকেই কার্যকর।
আইডিআরএর চেয়ারম্যান এম শেফাক আহমেদ গতকাল প্রথম আলোকে বলেন, আইন লঙ্ঘনের দায়ে স্ট্যান্ডার্ড ইনস্যুরেন্সের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে।
লাইসেন্স বাতিল হওয়ায় কোম্পানিটি নতুন কোনো বিমা চুক্তি করতে পারবে না। তবে আগের চুক্তিগুলোর কার্যক্রম চলমান থাকবে। আইডিআরএর লিখিত অনুমতি ছাড়া কোম্পানিটি আর্থিক

সোমবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর সমন্বয় সভায় এমন আহ্বান জানায় বিএসইসি। এ সময় তাদের সঙ্গে একমত পোষণ করেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির।'

সভা সূত্রে জানা যায়, বিএসইসির কমিশনার হেলালউদ্দীন নিজামী বিমা নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইডিআরএ-এর প্রতি অভিযোগ করে বলেন, পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত স্ট্যান্ডার্ড ইনসিওরেন্সের লাইসেন্স কমিশনকে না জানিয়ে বাতিল করা হয়েছে। অথচ কোম্পানিটির ৩৭ দশমিক ৪৮ শতাংশ শেয়ার সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে রয়েছে। হঠাৎ লাইসেন্স বাতিলের সিদ্ধান্তে পুঁজিবাজারে কোম্পানিটিকে ঘিরে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এ সংকট এড়াতে তালিকাভুক্ত কোনো বিমা কোম্পানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে কমিশনকে জানানোর বা আলোচনার আহ্বান জানান তিনি।'

প্রাথমিক নিয়ন্ত্রক সংস্থার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অবশ্যই আছে। কিন্তু তাদের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে অন্য আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক সংস্থা সম্পৃক্ত এবং পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত কোম্পানিটিতে লাখো বিনিয়োগকারী জড়িত, সেই বিষয়টি ভুলে যাওয়াটা ভুল নয়, রীতিমতো দোষের। স্ট্যান্ডার্ড ইনসিওরেন্সের মোট শেয়ারের প্রায় ৩৮ ভাগ, অর্থাৎ প্রায় ১ কোটি ৬০ লাখ শেয়ার সাধারণ বিনিয়োগকারীরা কিনেছেন

পুঁজিবাজারে। তাই হুট করে সকালে উঠে যদি সেই কোম্পানির লাইসেন্স বাতিল হয়, তাহলে কোম্পানিটির শেয়ারের ক্রেতা থাকবে না। ফলাফল–বড়ো ধরনের দরপতন ঘটবে, এটাই স্বাভাবিক। কোম্পানির উদ্যোক্তা-পরিচালকরা দুর্নীতি-অনিয়ম করলে তা শাস্তি তো সাধারণ বিনিয়োগকারীরা পেতে পারে না। কিন্তু আইডিআরএ-এর একক সিদ্ধান্তে দায় না থাকলেও বিপাকে পড়তে হয়েছিল লাখো সাধারণ বিনিয়োগকারীকে। যে প্রশ্ন প্রায় এক বছর পর উঠল নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর সমন্বয় সভায়, তা সাংবাদিকরা আগেই তুলতে পারতেন। উচিত ছিল যখন এই লাইসেন্স বাতিলের সংবাদটি করছে, তখনই আইডিআরএ-এর চেয়ারম্যানসহ কর্তাব্যক্তিদের এ বিষয়ে জানতে চাওয়া। এতে লাইসেন্স বাতিলের সংবাদটি আরও শক্তিশালী হতো।

'নিউজটা ভালো হতো আরও ভালো হলে' কিংবা 'সাংবাদিকদের চোখ-কান খোলা রেখে চলতে হবে' বা 'ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কাজে লাগাতে হবে' বা 'নৈতিক হতে হবে' প্রভৃতি বিমূর্ত কথাবার্তা প্রায়ই শোনা-বলতে দেখা যায় প্রশিক্ষণ বা ওয়ার্কশপে বক্তাদের মুখে। এতে প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপে আসা সংবাদকর্মীর পক্ষে অনেক সময় অনেকেই বিমূর্ত বক্তব্যে নিজেকে যুক্ত করতে পারে না। ফলে বক্তার উদ্দেশ্য সঠিক হলেও উদাহরণভিত্তিক আলোচনা-সমালোচনা না থাকায় ওই সাংবাদিক তার নিজের কাজে তা প্রয়োগ করতে পারেন না। এতে যতটা সম্ভব ত্রুটিমুক্ত করে সংবাদ করার বিষয়টিতে তেমন প্রভাব ফেলতে পারে না। তাই স্ট্যান্ডার্ড ইনসিওরেন্সের লাইসেন্স বাতিলের সংবাদটি উদাহরণ হিসাবে আনা হয়েছে, নিছক সমালোচনার জন্য নয়। সাংবাদিক ভুল করেছেন, তাও নয়। বরং এটা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যাতে আর্থিক খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো একটির সঙ্গে অন্যটি সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তাব্যক্তিরা অনেক সময় অন্য নিয়ন্ত্রক/প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমলে নিতে চান না। আর এ কারণেই সমন্বয়হীনতা দেখা দেয়, যার প্রভাবে অনেক সময় ক্ষতি হয় দশের ও দেশের। এ কারণেই গণমাধ্যমকর্মীর পক্ষে এসব বিষয় যথাযথভাবে তুলে ধরার সুযোগ আছে।

হাল আমলে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা ও দূরত্ব কতটা বেড়েছে, তাও দেখা গেছে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের মধ্যে। পুঁজিবাজারে ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগসীমা-সংক্রান্ত বিষয়ে বৈঠক করে দুই নিয়ন্ত্রক সংস্থা। স্বাভাবিকভাবে গণমাধ্যমকর্মীরা বৈঠক শেষে সভার ফলাফল জানতে চান এবং এ বিষয়ে কথা বলেন বিএসইসি প্রতিনিধি। এ বিষয়ে বিএসইসির সদস্যের বরাত দিয়ে সংবাদ হওয়ায় ক্ষোভ জানায় বাংলাদেশ ব্যাংক। অনেকটা আশ্চর্যজনকভাবে 'গণমাধ্যমে প্রেস বিজ্ঞপ্তি' দিয়ে সেদিনের বৈঠকের অবস্থান পরিষ্কার করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। একটি নিয়ন্ত্রক সংস্থা আরেকটি নিয়ন্ত্রক সংস্থার বিষয়ে এভাবে সাধারণত বক্তব্য তুলে ধরতে দেখা যায় না। ফলে বিষয়টি নিয়ে পালটাপালটি অবস্থানের মতো দাঁড়িয়ে গেছে, যা মোটেও কাম্য নয়। এতে দিনশেষে ভালো করতে গিয়ে দুই সংস্থার রশি টানাটানিতে ক্ষতিগ্রস্ত হন সাধারণ বিনিয়োগকারীরা।

এখানেও আমাদের গণমাধ্যমকর্মীদের সংবাদ পরিবেশনে 'ব্যবহারে' সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষ করে সংবাদের ভেতরের চেয়ে সংবাদের শিরোনাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে। আগেই বলেছি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই উত্তাল সময়ে অনেকেই হিট বাড়াতে ক্লিক বাইট বা ভাইরাল করার মতো শিরোনামটা করে। অনেকটা ফেসবুক-ইউটিউবারের মতো আকর্ষণীয় শিরোনাম করার উদাহরণ দেখা যায় হরহামেশাই। হ্যাঁ, প্রশ্ন উঠতে পারে, শিরোনামটা তো প্রতিবেদক দেন না, দেয় অফিস। এ কথা বলে নিজের দায়িত্ব এড়ানোর সুযোগ সাংবাদিকতায় নেই। আগে শুধু পত্রিকা ও হাতেগোনা টেলিভিশন থাকায় হয়তো অনেক কিছু না দেখলেও চলত। কিন্তু বর্তমানে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী গণমাধ্যমের সংখ্যা অনেক। গণমাধ্যমের সংখ্যা বৃদ্ধিতে কাজের সুযোগ যেমন বেড়েছে, তেমনই আপনার ভুল বা দুর্বলতার কারণে দুর্ভোগে পড়ার আশঙ্কা থাকে। ফিরে আসি প্রতিবেদনের শিরোনাম দেওয়ার বিষয়ে। প্রতিবেদক দেবেন না এটা যেমন সত্য, তেমনই প্রতিবেদন পড়ে চটকদার শিরোনাম দিতে গিয়ে সংবাদ নিয়ে প্রশ্ন উঠুক, এটাও কাঙ্ক্ষিত নয় প্রতিবেদকের। দিনশেষে প্রতিবেদন ভালো হলে এর সাফল্য যেমন প্রতিবেদকের, তেমনই শিরোনাম বা অন্য কোনো ঘাটতি থাকলে এর দায়ও প্রতিবেদকেরই। ভালো কাজের কৃতিত্ব থাকবে যেমন, তেমনই ত্রুটির দায় বর্তায় সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের ওপরই। আর পাঠক-দর্শক-শ্রোতারা জানতে বা বুঝতে চাইবে না যে শিরোনাম অন্য কেউ দিয়েছে।

সম্প্রতি 'ডেল্টা লাইফ ইনসিওরেন্সে ৩ হাজার ৬৮৭ কোটি টাকার অনিয়ম-দুর্নীতিসহ আর্থিক ক্ষতি হয়েছে' বলে সংবাদটি চাউর হয়েছে গণমাধ্যমে। বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রক সংস্থা (আইডিআরএ) কর্তৃক অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো চিঠির সূত্র ধরে এই সংবাদ করে অনেক গণমাধ্যম। যেখানে বলা হয়েছে, স্থগিতকৃত ডেল্টা লাইফের পরিচালনা পর্ষদের আমলে এই বিশাল অঙ্কের অনিয়ম হয়েছে, যা উঠে এসেছে অডিটের অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদনে। অনিয়মের টাকার বিশাল অঙ্কের কারণে স্বাভাবিকভাবেই টেলিভিশন-অনলাইন ও পত্রিকায় গুরুত্ব পায় সংবাদটি এবং সেটাই যথার্থ হয়েছে। কিন্তু এত টাকার অনিয়মের যে কথা বলা হয়েছে, তা আদৌও কতটা সত্য ও বাস্তবসম্মত, সেই প্রশ্ন তোলাটাও সাংবাদিকদের জন্য কর্তব্য। আগেই বলেছি, আর্থিক খাতের সংবাদ যতটা গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক ততটাই গভীর মনোযোগ থাকা জরুরি।

ডেল্টা লাইফ ইন্সুরেন্সের বিরুদ্ধে ৩৬৮৭ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বীমা কোম্পানি ডেল্টা লাইফ ইন্সুরেন্স পিএলসি ৩ হাজার ৬৮৭ কোটি টাকার ক্ষতিসাধন করেছে বলে প্রাথমিক তথ্য পাওয়ার কথা অর্থ মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (ইডা)।

Delta Life
Insurance Company

হ্যাঁ, স্ট্যান্ডার্ড ইনসিওরেন্সের লাইসেন্স বাতিলের মতো এখানেও পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ডেল্টা লাইফের অনিয়মসংক্রান্ত নিয়ন্ত্রক সংস্থার চিঠি সংবাদের জন্য মূল তথ্যসূত্র। এক্ষেত্রে চিঠির বরাত দিয়ে সংবাদ করলে কোনো দোষের নয়, কারণ একটি নিয়ন্ত্রক সংস্থা লিখিতভাবে জানিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়ে। কিন্তু এখানেও সাংবাদিকের একটু বাড়তি মনোযোগ জরুরি। বিমা খাত নিয়ে কাজ করার সুবাদে সেই চিঠি পাওয়ার পর আলোচিত অডিট প্রতিবেদন খুঁজতে থাকি। কয়েকদিন দেরি হলেও পেয়ে যাই নিরীক্ষা বা অডিট প্রতিবেদন, যা দেখে চক্ষু চড়কগাছ। ৩ হাজার ৬৮৭ কোটি টাকার আর্থিক অনিয়ম-ক্ষতির প্রথমটিতেই ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা যে খাতে অনিয়ম বলা

> টেলিভিশনগুলোয় আগের চেয়ে গুরুত্ব বেড়েছে অর্থ-বাণিজ্য সংবাদের। তারপরও রাজনীতি প্রাধান্যের টেলিভিশন সংবাদ বুলেটিনের রানডাউনে অর্থনৈতিক সংবাদ ততটা মূল্যায়িত হয় না বেশির ভাগ চ্যানেলে

হয়েছে, তা প্রশ্নবিদ্ধ। কারণ বিমা দাবি পরিশোধ না করে কোম্পানির লভ্যাংশ বাড়িয়ে দেখানো আড়াই হাজার কোটি টাকার মাত্র ১০ শতাংশ পরিচালকরা মুনাফা নিতে পারে। বাকি ৯০ ভাগ টাকাই বিমা গ্রাহকদের। ফলে ২০১২ থেকে ২০২০ পর্যন্ত আড়াই হাজার কোটি টাকা পরিচালকদের নিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। আবার ডেল্টা লাইফের মোট লাইফ ফান্ড ৪ হাজার কোটি টাকার মতো। সেখান থেকে ৩ হাজার ৬৮৭ কোটি টাকা লোপাট বা ক্ষতি হলে কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার কথা। আবার বিশাল অঙ্কের টাকা যদি ক্ষতি হতো, তাহলে পুঁজিবাজারে কোম্পানিটির ১ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ থাকার কথা নয়। একইভাবে সরকারি সিকিউরিটিজ বন্ডে বাধ্যতামূলক লাইফ ফান্ডের ৩০ শতাংশ বিনিয়োগ থাকার কথা নয়। খাতওয়ারি এসব তুলে ধরা মানে এই নয়, ডেল্টা লাইফের পরিচালকদের পক্ষে কথা বলা বা তাদের কোনো অনিয়ম-দুর্নীতি নেই। নিশ্চয় তাদের দুর্নীতি-অনিয়ম আছে। তবে তা কোনোভাবেই এত বিশাল পরিমাণে হওয়ার সুযোগ নেই, সেই অসংগতির হিসাব তুলে ধরাই উদ্দেশ্য। ডেল্টা লাইফে দুর্নীতি-অনিয়মের হিসাবে অসংগতির শিরোনামে আমার সংবাদটিতে শিরোনাম করা হয়েছিল 'ডেল্টায় ৩ হাজার ৬৮৭ কোটি টাকার অনিয়ম চিহ্নিত: পরিচালকরা বলছেন সঠিক নয় এ হিসাব'। আমার এই প্রতিবেদন দেখে মনে হবে অন্যান্য গণমাধ্যমে প্রচারিত সংবাদই আবারও করেছি। এখানে যে প্রতিবেদকের নিজস্ব অনুসন্ধান ছিল 'দুর্নীতির হিসাবের গরমিল' নিয়ে, তা শিরোনাম দেখে বোঝার উপায় ছিল না। শিরোনাম দেখে সবাই মনে করে, আগেই গণমাধ্যমে চাউর হওয়া সংবাদ নতুন করে করেছে। চমৎকার অনুসন্ধান থাকার পরও শিরোনামের দুর্বলতার কারণে তা দর্শক-শ্রোতাদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। পরবর্তী সময়ে সংশোধন করতে প্রতিবেদককেই উদ্যোগ নিতে হয়েছে। বার্তাকক্ষের লোকজন হয়তো ব্যস্ততার কারণে খেয়াল করতে পারেননি। তাই শিরোনামের দায় না থাকলেও প্রতিবেদককে সচেতন থাকতে হবে সব সময়।

টেলিভিশনগুলোয় আগের চেয়ে গুরুত্ব বেড়েছে অর্থ-বাণিজ্য সংবাদের। তারপরও রাজনীতি প্রাধান্যের টেলিভিশন সংবাদ বুলেটিনের রানডাউনে অর্থনৈতিক সংবাদ ততটা মূল্যায়িত হয় না বেশির ভাগ চ্যানেলে। এমনকি যথেষ্ট পরিমাণ সংবাদ উপকরণ থাকার পরও তাতে যথাযথ জায়গা পায় না অথচ অনেক কম গুরুত্বের সংবাদ অন্যান্য অনেক সংবাদ বেশ ট্রিটমেন্ট পায় বুলেটিনে। প্রশ্ন হচ্ছে, ব্যস্ততার যুগে মানুষকে ৪০/৪৫ মিনিটের সংবাদে আটকে রাখা খুব কঠিন। তাই বুলেটিনে নিচের দিকে থাকায় অর্থনৈতিক প্রতিবেদনটি নজরে আসে না। এর একটা কারণ হয়তো হতে পারে ব্যাবসাবাণিজ্য সংবাদে আগ্রহ কম বার্তাকক্ষের বার্তা সম্পাদকদের। এরপরও এ বিটে প্রতিদিন নতুন নতুন ধরনের জালিয়াতি-ভোগান্তিসহ ব্যাংক-বিমা-পুঁজিবাজারসহ উন্নয়ন অর্থনীতি নিয়ে সংবাদ করছেন প্রতিবেদকরা। গুরুত্বহীনতার কথা বলার আরও একটি কারণ হলো, এখন দেশের সব চ্যানেলে ন্যূনতম একজন কৃষি নিয়ে কাজ করার প্রতিবেদক নেই। যেমন নেই দেশের অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা রেমিট্যান্স প্রেরণকারী প্রবাসীদের নিয়ে কাজ করার প্রতিবেদক। এতকিছুর পরও ৬৭ ভাগ লোক কৃষিতে নিয়োজিত আছে। আবার প্রবাসীরা রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন বলেই

IDRA detects Delta Life board's involvement in embezzling Tk 3,687cr

United News of Bangladesh . Dhaka | Published: 21:48, Dec 04,2021 | Updated: 22:10, Dec 04,2021

The Insurance Development and Regulatory Authority in an investigation has found the involvement of the board of directors of Delta Life Insurance Company Limited (DLICL) in embezzling Tk 3,687 crore and other irregularities.

A letter signed by IDRA director (deputy secretary) Md Shah Alam was sent to the secretary of Financial Institution Division on December 1 in this regard.

বাংলাদেশের অর্থনীতি বিশেষ করে বহিঃবাণিজ্যে কোনো বিড়ম্বনায় পড়তে হয়নি। আবার গ্রামীণ অর্থনীতি কতটা শক্তিশালী হয়েছে, তাও বোঝা যায় গেল বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দায় বাংলাদেশের তেমন ক্ষতি না হওয়া দেখে। গেল দুই যুগে মফস্সল শহরগুলোয় বাণিজ্যিক লেনদেন কয়েক শ গুণ বেড়েছে। আর এ কারণেই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসহ শক্তিশালী গ্রামীণ অর্থনীতির মজবুত ভিত্তি রক্ষাকবচ হিসাবে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতি-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে। তারপরও গ্রামীণ অর্থনীতি নিয়ে তেমন কোনো সংবাদ দেখা যায় না টেলিভিশনগুলোয়। এমনকি সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের অনিয়ম-দুর্নীতির বড়ো বড়ো সংবাদ বের হয় পরিকল্পনা কমিশন থেকে। কিন্তু পত্রিকা ও অনলাইনে এ নিয়ে অসংখ্য ভালো সংবাদ প্রকাশ হলেও এ বিটে টেলিভিশন প্রতিবেদকের অভাব রয়েছে। এক্ষেত্রে অফিসের পাশাপাশি প্রতিবেদকদের আগ্রহেরও ঘাটতি আছে যথেষ্ট রকম।

লেখক: বিশেষ প্রতিনিধি, যমুনা টেলিভিশন

প্রবন্ধ

ডিজিটাল গণমাধ্যমের অর্থনীতি চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

পপি দেবী থাপা

প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বদলে যাওয়া গণমাধ্যম নিয়ে আলাপ-আলোচনার অন্ত নেই। ইন্টারনেটনির্ভর নিউ মিডিয়া নিয়ে আলোচনা এখন সর্বত্র। বলা যায়, পালটে গেছে গণমাধ্যমের চালচিত্র। সংবাদ পরিবেশন ও পাঠ–দুটোই অনেক বেশি ইন্টারনেটভিত্তিক। এটি যেমন সংবাদ সংগ্রহ, প্রতিবেদন তৈরি, পরিবেশন প্রভৃতিকে প্রভাবিত করেছে, তেমনই কুঠারাঘাত করেছে সংবাদপত্র শিল্পের পুরোনো ব্যাবসায়িক ধ্যানধারণার মূলে। অন্যদিকে ডিজিটাল গণমাধ্যমগুলোর পারস্পরিক প্রতিযোগিতা তাদের বাধ্য করছে নতুন ব্যাবসায়িক মডেল উদ্ভাবনে।

অস্বীকার করার উপায় নেই–ইন্টারনেট উদ্ভাবনের পর গণমাধ্যম একটি নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ এবং নিত্যনতুন উদ্ভাবনে ডিজিটাল মিডিয়ার অগ্রগতির পথ হয়েছে সহজ। দেরিতে হলেও পুরোনো দিনের গণমাধ্যমও বাধ্য হয়েছে অনলাইন প্ল্যাটফরমে আসতে। নতুন বাস্তবতায় পুরোনো দিনের গণমাধ্যমগুলোকেও বাধ্য হয়ে তাদের ব্যাবসায়িক মডেল পরিবর্তন করতে হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আয়ের ওপর। এই পরিবর্তন হয়েছে পাঠকের চাহিদাকে ধারণ করতে গিয়ে। পাঠক চান, কম্পিউটার স্ক্রিনে মাউসের ক্লিকে কিংবা স্মার্টফোনে আঙুলের ছোঁয়ায় স্বল্পতম সময়ে সংবাদ জানতে। এই গণমাধ্যমকে আমরা বলছি অনলাইন গণমাধ্যম, যেখানে সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে মুদ্রণমাধ্যমের মতো স্থানের সীমাবদ্ধতা নেই। ডিজিটাল মাধ্যমে সংবাদ পরিবেশন কেবল গণমাধ্যমের পুরোনো ব্যাবসায়িক ধরনে পরিবর্তন আনেনি, সংবাদ পরিবেশন থেকে শুরু করে টিকে থাকার স্বার্থে নতুন নতুন আর্থিক উৎসের সন্ধানও তাকে করতে হচ্ছে।

ডিজিটাল জার্নালিজমের সংজ্ঞা নিয়েও মতভেদ আছে, অনেক সংজ্ঞা থাকলেও বিশেষজ্ঞরা কেউই একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় একমত নন, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সেটি হয়তো সম্ভবও নয়। বিভেদের মূল উৎস সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চলনগুলোর কারণে। তাই আমরা দেখি, দুই দশক পেরিয়ে এলেও 'ডিজিটাল জার্নালিজম', 'অনলাইন জার্নালিজম', 'ইলেকট্রনিক জার্নালিজম', 'মাল্টিমিডিয়া জার্নালিজম'–এমন অনেক সম্বোধনেই একে সম্বোধন করা হচ্ছে। তবে বিশ্বজুড়ে 'ডিজিটাল জার্নালিজম' শব্দটি বহুল প্রচলিত (র‍্যামন ২০১৯)।

ডিজিটাল জার্নালিজমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একোস্টা একে মুদ্রিত সংবাদপত্র থেকে খুব বেশি আলাদা করেননি। তার মতে, এটি কেবল নতুন মোড়কে-মাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ। সেখান থেকে এগিয়ে আল-সামাইলে একে বলেন, এটি আসলে 'প্রকাশিত অনলাইন সংবাদপত্র', যেটি হতে পারে প্রকাশিত সংবাদপত্রের বিষয়বস্তুকে ডিজিটাল মাধ্যমে পরিবেশন করা। অথবা অনলাইনে তার গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলোর সংক্ষিপ্তরূপে পরিবেশন। এমনও হতে পারে, মুদ্রণমাধ্যমে ঠাঁই না পেলেও কিছু সংবাদ আলাদা করে অনলাইনে ঠাঁই করে নেওয়া। কেভিন কোয়ামটো একে পুরোনো প্রচলিত সাংবাদিকতার ধারণার সঙ্গে সংগতি রেখেই নতুন মোড়কে সংবাদ পরিবেশন হিসাবে দেখছেন। সময়ের সঙ্গে এই সংজ্ঞা পরিবর্তিত হচ্ছে। সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে ইন্টারনেটনির্ভরতার পাশাপাশি এখানে পরিবেশিত সংবাদের সঙ্গে ছবি এবং ভিডিয়ো সমান গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদ পরিবেশনের উদ্দিষ্ট শ্রেণিও এখানে ইন্টারনেটনির্ভর। মোড়ক যাই হোক না কেন, উদ্দেশ্য সেই একই, অর্থাৎ জনগণের জন্য তথ্য পরিবেশন। উদ্দেশ্য এক হলেও ডিজিটাল গণমাধ্যম শতবছর ধরে গড়ে ওঠা মুদ্রণমাধ্যমের যে ব্যাবসায়িক মডেল, তাতে আঘাত হেনেছে প্রবলভাবে। বাধ্য হয়েই তারাও পা রাখছেন ডিজিটাল মাধ্যমে।

ডিজিটাল গণমাধ্যমের সুবিধা হলো এটি কোনো ভৌগোলিক সীমা দ্বারা আবদ্ধ নয়। এর পাঠক পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে প্রয়োজনীয় সংবাদটি এক ক্লিকেই বেছে নিতে পারেন। এখানে কনটেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ে ব্যয় যা-ই হোক না কেন, আয়ের সুযোগ অনেক বেশি। আর একটি সুবিধা হচ্ছে দীর্ঘ সময় পরও পাঠক তার প্রয়োজনীয় সংবাদটি খুঁজে নিতে পারেন। মুনাফার দিক থেকেও ডিজিটাল গণমাধ্যম এখন অনেক বেশি সম্ভাবনাময়।

এটা সত্যি–ইলেকট্রনিক জার্নালিজম প্রচলিত মুদ্রণমাধ্যমের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে ব্যয় কমিয়ে আনলেও একটি মানসম্মত ওয়েবসাইট তৈরিতে বিনিয়োগের পরিমাণ এখনো উল্লেখযোগ্য। একটি ওয়েবসাইট লঞ্চিং পর্যন্ত যে ব্যয়, তাকে বলা হয় প্রাথমিক বিনিয়োগ। একটি ই-নিউজপেপারের প্রাথমিক বিনিয়োগের মধ্যে আছে সম্ভাব্যতা যাচাই ও ওয়েবসাইট ডিজাইনের জন্য প্রাথমিক বাজেট প্রণয়ন ব্যয়। বাজার যাচাইকরণে আর্থিক বিনিয়োগ। সংযোগসহ ওয়েবসাইট ভাড়া, প্রক্রিয়াকরণ ব্যয়, প্রচারমূলক ব্যয়সহ লঞ্চিংয়ে জড়িতদের পারিশ্রমিক নির্বাহ। এক্ষেত্রে ডিজিটাল সংবাদপত্রের ওয়েবসাইট প্রতিষ্ঠার পেছনে ওয়েবসাইট ডিজাইনিংয়ে ব্যয় সংকোচনের পক্ষে নন বিশেষজ্ঞরা। কিছু কিছু প্রযুক্তির সুবিধা ব্যয়বহুল হলেও সেগুলো এড়িয়ে শেষ পর্যন্ত লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

মুদ্রিত সংবাদমাধ্যমগুলোর আর্থিক ক্ষেত্রে একটি বড়ো নির্ভরতার জায়গা ছিল বিজ্ঞাপন বাবদ আয়। ডিজিটাল জার্নালিজম প্রথমদিকে সেভাবে বিজ্ঞাপন আকৃষ্ট করতে না পারায় তাদের জন্য বিকল্প আয়ের সন্ধান বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে এবং সংবাদমাধ্যমের ব্যাবসায়িক মডেলে একটি ব্যাপক পরিবর্তন আসে।

গণ-অর্থায়ন

গণ-অর্থায়ন বিষয়টি এ ধরনের উদ্যোগে নির্ভরতার অন্যতম ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরোনো দিনেও এই নির্ভরতা ছিল। পার্থক্য কেবল পাঠক এখন সাংবাদিকতার জন্য আরও আধুনিক পদ্ধতিতে মূল্য পরিশোধ করছে। আজকের দিনে অনেক অনলাইন প্রকাশনাই এ ধরনের অর্থায়ন অথবা দানে পরিচালিত হচ্ছে। অলাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে এটি অর্থ সংগ্রহের অন্যতম পথ। যদিও সফলতার গল্প এখনো সীমিত (Bitnner, Digital journalism and the new business model, 2019)।

দাতা অর্থায়ন

এ ধরনের অর্থায়ন সাধারণত তিন ধরনের পথে হতে পারে: (ক) বৃহৎ দাতাদের সমর্থন, (খ) সরকারি অর্থায়ন এবং (গ) করপোরেট দায়বদ্ধতা থেকে।

ক. সাধারণত সামাজিক মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে ভালো সাংবাদিকতাকে উৎসাহিত করতে অনেক পরোপকারী ব্যক্তিই বড়ো ধরনের অনুদান দিয়ে থাকেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ই-বে প্রতিষ্ঠাতা পিয়ের ওমিদ্যারের কথা। তার দাতব্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি গুজব বা ফেক নিউজ মোকাবিলায় এবং প্রকৃত অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সমর্থনে ১০০ মিলিয়ন ডলার প্রদানের ঘোষণা করেছেন।

খ. অনেক দেশের সরকারই জাতীয় ও ব্যক্তিমালিকানাধীন গণমাধ্যমগুলোর জন্য অর্থ সরবরাহ করে থাকে। উদাহরণ হিসাবে ফ্রান্স অথবা নরওয়ের কথা বলা যায়, যেখানে বিভিন্ন মিডিয়া কোম্পানিতে তাদের মঙ্গলার্থে অর্থ বিনিয়োগ করা হয়। অস্ট্রিয়াতেও অনুরূপ কিছু ব্যবস্থা চালু আছে। তবে এ ধরনের অর্থায়নের পেছনে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ প্রবণতার কথাও বলা হচ্ছে।

গ. করপোরেট দায়বদ্ধতা থেকেও এ ধরনের উদ্যোগে অর্থায়ন সম্ভব। অর্থাৎ সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসাবে অনেক বড়ো কোম্পানি এ ধরনের উদ্যোগে বিনিয়োগ জোগান দিতে পারে। কিন্তু এখানে বড়ো চ্যালেঞ্জ হলো কোম্পানিগুলোর নিজস্ব স্বার্থের সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি হলে সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা (Bitnner, Digital journalism and the new business model, 2019)।

গ্রাহক অর্থায়ন

ডিজিটাল গণমাধ্যমের বহুল বিস্তারের এই যুগে একটি বহুল আলোচিত উক্তি হচ্ছে, 'Someone has to pay for journalism, or Journalism will have to pay for it', বিশেষ করে ফ্রি নিউজ কনটেন্টের ক্ষেত্রে। মুদ্রিত সংবাদপত্রের আর্থিক ভিত্তি অনেকটাই দাঁড়িয়েছে তার গ্রাহকদের ওপর এবং এখন পর্যন্ত এই মডেলটি অনেকাংশে সফল। অনেক প্রতিষ্ঠানই গ্রাহকের মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ পেয়ে থাকলেও বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠান যেমন, নিউইয়র্ক টাইমসের মতো প্রতিষ্ঠান কেবল গ্রাহক অর্থায়ানের ভিত্তিতে সাফল্যের সঙ্গে চলতে পারছে না। এই গ্রাহক অর্থায়ন অনেকটাই উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। তারা অর্থ প্রদানে কতটুকু ইচ্ছুক, সেটিও একটি বিষয় (Mandla chinula, 2017)।

ক্ষুদ্র অর্থায়ন

মাইক্রো পেমেন্টস বা ক্ষুদ্র অর্থায়ন মডেলটি হলো পাঠক তার পছন্দের একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রবেশের জন্য খুব অল্প পরিমাণ অর্থ প্রদান করবে। এই মডেলের ওপর ভিত্তি করে একটি ডাচ স্টার্ট-আপ নিউইয়র্ক টাইমস কোম্পানির সমর্থনে অ্যালেক্স স্প্রিংগার এ ধরনের একটি মডেল পরিচালনা করছেন। এখানে গ্রাহক তার পছন্দের বিষয়ের জন্য ১০ থেকে ৯০ সেন্ট পর্যন্ত প্রদান করছেন। এখানে কোনো বিজ্ঞাপন নেই, নেই পে-ওয়াল। ব্যবহারকারী কেবল তার পছন্দের বিষয়ের জন্য অর্থ প্রদান করবেন। এমনকি কারও যদি পঠিত বিষয়টি পছন্দ না হয় তবে তিনি তাঁর অর্থ ফেরত চাইতে পারেন (Bitnner, Digital journalism and the new business model, 2019)।

সরাসরি প্রতিবেদন উপস্থাপন

ফেসবুক লাইভ, পেরিসকোপের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধন্যবাদ দিতেই হয়। সাংবাদিকরা এখন তাদের গল্পটা সরাসরি এ ধরনের

প্ল্যাটফরমে উপস্থাপনের সুযোগ পাচ্ছেন। এই মাধ্যমে উপস্থাপনার ধরন যেমন নতুন, তেমনই বিষয়টি অনেক ইন্টারেক্টিভ। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, দ্য বোস্টন গ্লোবের গ্লোব লাইভ এবং গ্যানেট উইথ ইটস অ্যারিজোনা স্টরিটেলার প্রজেক্টের কথা। এখানে সরাসরি উপস্থিতির টিকিট বিক্রি থেকে কিছু অর্থ এলেও মূল অর্থ আসে স্পন্সর কোম্পানিগুলো থেকে (Mandla chinula)।

স্পন্সরড কনটেন্ট

বিশ্বজুড়েই আজ সাংবাদিকরা তাদের প্রতিবেদনের গল্প নিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছেন। ডিজিটাল গণমাধ্যমে পরিবেশিত অনেক অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদনের ভিউ এখন অনেক বেশি। স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্যের প্রচারে এ ধরনের অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকেন। এখানে বলা বাহুল্য, সাংবাদিকতার মৌলিক নীতিমালা মেনেই অনুষ্ঠানগুলো তৈরি হয়। যেগুলো এখন বিজ্ঞাপনদাতাদের মনোযোগ কাড়ছে।

তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার ও ইন্টারনেটের ব্যাপক বিস্তার সত্ত্বেও অনেকেই আজ এ প্রশ্ন তুলছেন গণমাধ্যম এ থেকে কীভাবে এবং কতটা লাভবান হতে পারে। কিছু কিছু চ্যালেঞ্জের কথাও বলা হচ্ছে। কোম্পানিগুলোর নিজস্ব যে ব্যাবসায়িক চর্চা, সেটির কারণেও অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তহবিল সংকটও একটা সময় বড়ো সমস্যা ছিল, সেটি এখনো আছে। আশার কথা এই, ইলেকট্রনিক প্রেস তার সীমাবদ্ধতাগুলো কাটিয়ে ওঠছে। বিজ্ঞাপনদাতারাও ইন্টারনেটভিত্তিক এই মাধ্যমগুলোয় বিজ্ঞাপন দিতে এখন অনেক বেশি আগ্রহী।

সাংবাদিকতার জগৎ গত এক দশকে বদলে গেছে অনেকটাই। ইউনাইটেড স্টেট ব্যুরো অব লেবার স্ট্যাটিক্স জানাচ্ছে, ২০২৯ সাল নাগাদ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে চাকরির সুযোগ কমে আসবে ১১ শতাংশ। এটি অবশ্যই আশঙ্কার কথা। টিকে থাকার জন্যই ডিজিটাল যুগে সাংবাদিকদের প্রযুক্তির সর্বোচ্চ সুবিধা ব্যবহার করে কঠিন সত্যের ওপর আলো ফেলতে হবে। সহানুভূতি নিয়ে প্রতিবেদন তৈরির পাশাপাশি সামাজিক অস্বস্তিকর বিষয়গুলো আলোয় আনতে হবে (Journalism in the Digital Age: What Is Digital Journalism? 2021)।

ডিজিটাল জার্নালিজমের সাফল্য নির্ভর করছে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ সুবিধা গ্রহণের পাশাপাশি সতর্কতার সঙ্গে মাধ্যমের চরিত্র বুঝে একে ব্যবহার করার ওপর। ডিজিটাল সংবাদপত্র আসলে পুরোনো সংবাদপত্রের একটি নতুন রূপ, যা পাঠকের চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে। এখনো নতুন বিজ্ঞাপনের বাজার সম্প্রসারণের সম্ভাবনা অনেক বেশি।

টিকে থাকার জন্যই ডিজিটাল যুগে সাংবাদিকদের প্রযুক্তির সর্বোচ্চ সুবিধা ব্যবহার করে কঠিন সত্যের ওপর আলো ফেলতে হবে। সহানুভূতি নিয়ে প্রতিবেদন তৈরির পাশাপাশি সামাজিক অস্বস্তিকর বিষয়গুলো আলোয় আনতে হবে

প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ডিজিটাল জার্নালিজম সুবিধার পাশাপাশি কিছু সমস্যাও মোকাবিলা করছে। ডিজিটাল টেকনোলজির কারণে কনটেন্ট তৈরি এবং তা বাজারজাতকরণ আর্থিকভাবে সাশ্রয়ী হলেও ডিজিটাল মিডিয়া প্রোডাক্ট এখন অনেক ক্ষেত্রে চৌর্যবৃত্তির কবলে (Robert G)। শুধু পাইরেসির কারণে অনলাইন মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিজ বড়ো ধরনের সংকটে। হ্যাকিংও ডিজিটাল মিডিয়ার জন্য একটি বড়ো হুমকি। পাশাপাশি পেশাদারির জায়গায়ও ডিজিটাল জার্নালিজম অনেক ক্ষেত্রেই প্রশ্নের সম্মুখীন। প্রশ্ন তোলা যেতে পারে কারিগরি ট্রিটমেন্ট এবং নৈতিকতার জায়গা থেকেও। এখানে তথ্যের উৎস কতটা নির্ভরযোগ্য ত্বরিত সংবাদ প্রদানের ক্ষেত্রে, সেটি যাচাই করাও একটি সমস্যা। এ ধরনের উৎসকে ভিত্তি করে তৈরি প্রতিবেদন ভুল বার্তা দিতে পারে।

অর্থনীতিবিদদের একটি বড়ো অংশ ইন্টারনেটভিত্তিক গণমাধ্যমগুলোর বিষয়ে আইটি কোম্পানিগুলোর একচেটিয়া প্রভাব নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করছে। তাদের মতে আইটি কোম্পানিগুলোর একচেটিয়া প্রভাব মিডিয়া শিল্পের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে। আইটি সে সুযোগ কাছে লাগাতে হবে। সম্পাদকীয়ের ক্ষেত্রেও মুদ্রণমাধ্যম ও ডিজিটাল মাধ্যমে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য দৃশ্যমান হতে হবে। নতুন নতুন আর্থিক উৎস সৃষ্টি করতে হবে।

ডিজিটাল টেকনোলজির প্রভাবে গণমাধ্যম শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটছে, আর্থিক দিক থেকেও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে পুরোনো ব্যাবসায়িক ধারণা। প্রতিষ্ঠিত, শক্ত আর্থিক ভিতের ওপর দাঁড়ানো মিডিয়া কোম্পানিগুলো নতুন এই প্রযুক্তিকে আঁকড়ে ধরছে এবং এই ডিজিটাল যুগের চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। কিন্তু এখনো অনেক কাজ করা বাকি। তবে আশা করা যায়, প্রযুক্তির এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই মিডিয়া এগিয়ে যাবে। আগামীদিনের রিপোর্টাররা নিজেরাই হয়তো ব্র্যান্ড হয়ে ওঠবেন। নিজস্ব অর্থায়নে সৃষ্ট ব্লগ কিংবা ওয়েবসাইট থেকেই তারা অনেক বেশি আয় করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু যা কিছুই পরিবর্তন হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত রিপোর্টিংয়ের মান ও নৈতিকতাই হবে তাদের সাফল্যের চাবিকাঠি।

লেখক: গবেষক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

সম্পাদনা ও প্রুফরিডিং প্রকাশনাশিল্পের প্রাণ

মুস্তাফা মাসুদ

সম্পাদনা ও প্রুফরিডিং–এ দুটি অনুষঙ্গ সৌকর্যপূর্ণ, সুরুচিসম্পন্ন এবং শৈলীসমৃদ্ধ প্রকাশনাশিল্পের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। সম্পাদক ও প্রুফরিডারের সচেতন, দক্ষ ও শৈল্পিক হাতের ছোঁয়ায় একটি লেখা অধিকতর সাবলীল, শ্রীপূর্ণ, নির্ভুল ও সুখপাঠ্য হয়ে ওঠে। তাদের নিরলস শ্রম, মেধায় প্রকাশনাশিল্প নিয়ত সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে; অথচ তারা থাকেন নিভৃতে, পর্দার অন্তরালে। পাঠক একটি উন্নতমানের বই পাঠ করে আনন্দিত হন, পুলকিত হন; সমৃদ্ধ করেন তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভান্ডার। কিন্তু সেই বইয়ের উৎকর্ষের একক কারিকর শুধু লেখক নন; পাণ্ডুলিপি-সম্পাদক এবং প্রুফরিডারের অবদানও সেখানে অসামান্য। যেসব পাণ্ডুলিপি তেমন সুলিখিত নয়, একজন সুদক্ষ সম্পাদকের মেধা ও পারঙ্গমতার স্পর্শে সেগুলোও অধিকতর উৎকর্ষমণ্ডিত হয়। আর প্রুফরিডারের হস্তক্ষেপ তো যে কোনো ধরনের পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রেই অপরিহার্য। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, প্রযুক্তির এই অভাবনীয় উন্নতির যুগেও কম্পোজিটরের কম্পোজকৃত কোনো প্রুফ কমপক্ষে তিনবার না দেখলে তা প্রিন্ট অর্ডার দেওয়ার উপযোগী হয় না; কখনো কখনো চার-পাঁচবার প্রুফ দেখেও প্রিন্ট অর্ডার দেওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে অবশ্য নির্ভর করে পাণ্ডুলিপি কতখানি পরিচ্ছন্ন ও সহজবোধ্য এবং কম্পোজিটর কতখানি দক্ষ ও অভিজ্ঞ তার ওপর। অস্পষ্ট, গোলমেলে, বেশি কাটাকাটি করা এবং জটিলতাপূর্ণ পাণ্ডুলিপি প্রুফরিডার ও কম্পোজিটর উভয়ের জন্যই বিরক্তিকর এবং চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের অন্য কোনো উপায় থাকে না; অসীম ধৈর্য আর নিষ্ঠার সঙ্গে প্রুফরিডারকে বারবার প্রুফ কাটতে হয়; আর কম্পোজিটরকে তা নিখুঁতভাবে, সচেতনতার সঙ্গে সংশোধন করতে হয়। এভাবেই–এই উভয়মুখী শ্রমের সম্মিলনেই একটি নির্ভুল বই পাঠকের সামনে আসে।

প্রকাশনা ও মুদ্রণশিল্পের সুবিস্তৃত ক্ষেত্রে সম্পাদক ও প্রুফরিডার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য কারিকর হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়ে তাদের শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের জন্য স্থায়ী প্রকৃতির কোনো একক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে আছে বলে আমাদের জানা নেই। পাশ্চাত্য দেশগুলোয় সম্পাদনা ও প্রুফরিডিং শেখার নানা ধরনের ব্যবস্থা আছে; এসব বিষয়ে তথ্যপূর্ণ অনেক বইও আছে। ইংল্যান্ডে এ ধরনের একটি সংগঠন আছে; এটির নাম *Society for Editors and Proofreaders*। এটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৮৮ এবং বর্তমান সদস্যসংখ্যা ১ হাজার ৭০০। এই সংগঠনের কাজ হলো

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া, সম্পাদিত কাজের নমুনার ওপর অনলাইন ডিরেক্টরি প্রকাশ এবং সম্পাদনা ও প্রুফরিডিং বিষয়ে একটি দ্বিমাসিক পত্রিকা প্রকাশ। যুক্তরাজ্যে পেশাদার সম্পাদক ও প্রুফরিডার শ্রেণিও গড়ে উঠেছে। এই পেশার মাধ্যমে তারা কাঁড়ি কাঁড়ি ইউরো-পাউন্ড রোজগার করছেন, গাড়ি-বাড়ি করছেন। ইংল্যান্ডে একজন দক্ষ প্রুফরিডার প্রতি ঘণ্টায় ২২ পাউন্ড (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় আড়াই হাজার টাকা!) আয় করেন। সেখানে প্রুফরিডারদের সর্বনিম্ন সম্মানি ঘণ্টায় ১৫ পাউন্ড। জন হ্যামিল্টন নামে একজন প্রুফরিডার শুধু বাড়িতে বসে প্রুফ দেখে প্রচুর অর্থ আয় করছেন। তিনি ২০ বছরেরও বেশি সময় প্রুফ দেখছেন। প্রুফের জন্য তাকে কারও কাছে ধরনা দিতে হয় না। পাবলিশাররাই তার কাছে প্রুফ দেখতে দিয়ে যান; এমনকি ই-মেইলেও তার কাছে দেদার প্রুফ আসে। প্রুফ দেখার টাকায় তিনি প্রাসাদোপম বাড়ি করেছেন, গাড়ি করেছেন। বছরে অন্তত দুবার তিনি রিক্রিয়েশনের জন্য বিদেশে বেড়াতে যান। আমেরিকায়ও এ ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতেও সম্পাদনা এবং প্রুফিঙের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বেশকিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে; এমন একটি প্রতিষ্ঠানের নাম *Cosmic Strands ePublishing Pvt. Ltd.*। বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানটির কাজ হলো প্রকাশনা, পাণ্ডুলিপি রচনা, সম্পাদনা, প্রুফরিডিং প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চতর ও নিবিড় প্রশিক্ষণ দেওয়া। আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে গড়ে উঠেছে *Association of Freelance Editors, Proofreaders and Indexers* নামে সম্পাদক ও প্রুফরিডারদের একটি সংগঠন। উচ্চশিক্ষিত, ব্যাপক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বাঘা বাঘা সম্পাদক, প্রুফরিডার এই সংগঠনের সদস্য। এই সংগঠন সম্পাদক-প্রুফরিডারদের পেশাগত স্বার্থসংরক্ষণ ছাড়াও সম্প্রতি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করছে। পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশেও এ ধরনের ব্যবস্থা আছে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের দেশে এডিটিং ও প্রুফরিডিঙে দক্ষতা ও মেধা বিকাশের ক্ষেত্রে তেমন প্রতিষ্ঠান/সংগঠন গড়ে ওঠেনি। এখানে এডিটিং ও প্রুফরিডিঙের কাজ যারা করেন, প্রধানতই তা তারা শিখেছেন বা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। আমি বাংলা একাডেমির বিক্রয়কেন্দ্রে খোঁজ নিয়ে দেখেছি–তাদের স্টকে কবি অরুণাভ সরকার লিখিত *লেখালেখি ও সম্পাদনা* শীর্ষক অত্যন্ত ক্ষীণকায় একটি বই ছাড়া এ বিষয়ে আর কোনো বই নেই; কোনোকালে যে ছিল, তাও মনে হয়নি বিক্রয়কর্মীদের সঙ্গে আলাপ করে। আন্তর্জাতিকমানের প্রকাশনা সংস্থা *ইউপিএল* এবং অত্যন্ত মেধাপূর্ণ পুস্তক প্রকাশনা সংস্থা *ঐতিহ্য*-এর ওয়েবসাইট ঘেঁটেও এ ধরনের বইয়ের হদিস পাইনি। অরুণাভ সরকারের পূর্বোক্ত বইটি খুবই সংক্ষিপ্ত। তাছাড়া সেখানে খবরের কাগজের রিপোর্টভিত্তিক আলোচনাই বেশি; তৎসত্ত্বেও বইটি অপেক্ষাকৃত নবীন রিপোর্টার এবং উঠতি লিখিয়ে-সম্পাদক-প্রুফরিডারদের উপকারে আসবে। এ বই থেকে সম্পাদক ও প্রুফরিডাররা কিছু শব্দের সঠিক ব্যবহার এবং বানানসংক্রান্ত কিছু জরুরি গাইডলাইন পাবেন। কিন্তু Louise Poland-এর *The business, Craft and profession of a book editor* (Queensland University press, 2007) এবং John Wilson-এর *The Importance of the Proofreader* (U.k)-এর মতো সম্পাদনা ও প্রুফরিডিং সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা-পুস্তক বা গাইডলাইনের অভাব আমাদের থেকেই যাচ্ছে। সম্পাদনা ও প্রুফরিডিং কাজকে পদ্ধতিগতভাবে এগিয়ে নেওয়া এবং এর ভিত্তি সংহত করে এই কাজকে ফলপ্রসূ পেশায় পরিণত করার লক্ষ্যে কোনো বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান, সমিতি বা সংগঠনও আমাদের দেশে গড়ে ওঠেনি। যার জন্য এত বড়ো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের ক্ষেত্র সেভাবে পল্লবিত হচ্ছে না; এর সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মীরাও তাই সেভাবে মূল্যায়িত হচ্ছেন না। তবে আশার কথা, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র মাঝেমধ্যে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে, যার একটায় কয়েক বছর আগে প্রশিক্ষক হিসাবে যোগদানের সুযোগ আমার হয়েছিল। এই কার্যক্রমকে একক বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় আরও সম্প্রসারিত, দৃঢ়বদ্ধ ও ব্যাপক অংশগ্রহণমূলক করে এগিয়ে যেতে পারলে ভবিষ্যতে ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে।

দুই.

সম্পাদনা ও প্রুফরিডিং ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রায় চার দশকের–কখনো ব্যক্তিগত প্রকাশনা সূত্রে; কখনো চাকরি বা কর্মসূত্রে। অন্য প্রায় সবার মতো আমিও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোথাও সম্পাদনা ও প্রুফরিডিং শেখার সুযোগ পাইনি। ১৯৭২ সালে একটি মাসিক সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের সুবাদেই প্রত্যক্ষভাবে সম্পাদনা ও প্রুফরিডিঙের সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং ঘষামাজার মধ্য দিয়েই শিখতে থাকা; এরপর ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলা। আলোচ্য প্রবন্ধে তাই আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ পয়েন্টগুলো যেমন থাকবে; তেমনই বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া কিছু জরুরি বিষয়ও তুলে ধরার চেষ্টা করব। তবে শীর্ষ টীকা হিসাবে বিনীতভাবে বলতে চাই–এ লেখাটি খুব ঝানু বা অভিজ্ঞদের জন্য নয়; যারা নবীন, উদীয়মান বা মাঝারি পর্যায়ে আছেন–সম্পাদনা ও প্রুফরিডিংকে যারা পেশা হিসাবে নিতে চান, এটি তাদের জন্য একটা গাইডলাইন হিসাবে অনেকটা সাহায্য করতে পারবে বলে আশা করি। প্রথমেই আমরা সম্পাদনা বিষয়ে কিছু কথা বলব।

সম্পাদনা কী ও কেন: ইংরেজি ***Editing*** শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে সম্পাদনা। এডিটিঙের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে *আলেকজান্ডার ম্যামিসেভ ও সিন উইলিয়ামস* তাদের লেখা *Technical Writing for Team: The STREAM Tools Handbook* বইয়ে বলেছেন: 'Editing is the process of selecting and preparing written, visual, audible and film media used to convey information through the processes of correction, condensation, organization, and other modifications performed with an intention of producing a correct, consistent, accurate, and complete work.' সোজাসাপটাভাবে এর অর্থ দাঁড়ায়: সম্পাদনা হলো এমনই একটি পদ্ধতি বা কর্মপ্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে লিখিত বিষয়, ছবি, গান ও চলচ্চিত্রকে সংশোধন, পুনর্বিন্যাস, সংহত এবং প্রয়োজনীয় পরিমার্জন-পরিবর্ধন করে পূর্ণাঙ্গরূপে দাঁড় করানো হয়। সুসম্পাদনার মাধ্যমে একটি 'কাজ' অধিকতর আকর্ষণীয় আর উৎকর্ষমণ্ডিত হয়। লিখিত বিষয়ের এডিটিং সম্পর্কে খুব সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ ইঙ্গিতসহকারে বলা হয়ে থাকে: 'Editing is spelling capitalization, punctuation, grammar, sentence structure, subject/verb agreement, consistent verb tense, word usage.' অর্থাৎ, সম্পাদনা হলো বানান শুদ্ধীকরণ, বিরামচিহ্নের যথাযথ ব্যবহার, ব্যাকরণ-রীতির সঠিক প্রয়োগ, বাক্যগঠন, বিষয়/ক্রিয়ার সাযুজ্য, ক্রিয়ার কালের সংগতি, শব্দ ব্যবহার। শব্দাশ্রিত এই চৌম্বক সংজ্ঞার মধ্য দিয়ে একেবারে খুঁটিনাটি বিষয়ে নজর দেওয়ার জন্য সম্পাদকের প্রতি তাগিদ রয়েছে। এডিটিঙের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে ব্রিটিশ লেখক, কবি ও সাংবাদিক ব্লেক মরিসন (জন্ম: ৮ অক্টোবর ১৯৫০ খ্রি.) ২০০৫ সালের ৬ আগস্ট *গার্ডিয়ান* পত্রিকায় প্রকাশিত *Black day for the blue pencil* শীর্ষক লেখায় বলেন: 'When a book appears, the author must take

সম্পাদনা করতে গিয়ে পাণ্ডুলিপির স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ গতি, শৈলী ও সৌন্দর্য যাতে কিছুতেই ক্ষুণ্ন না হয়, সেদিকে যত্নবান থাকা খুবই জরুরি। প্রয়োজনে এক্ষেত্রে লেখকের সঙ্গেও পরামর্শ করা যেতে পারে

credit, but if editing disappears, as it seems to be doing, there will be no books worth taking the credit for.' অর্থাৎ, একটি বই যখন আত্মপ্রকাশ করে, তখন এর কৃতিত্ব অবশ্যই লেখক নেন; কিন্তু সেখানে কৃত সম্পাদনা যদি না থাকে, তাহলে কৃতিত্ব দাবি করার মতো বই সেটি আর থাকে না।

সম্পাদনার ক্ষেত্র, প্রকৃতি: স্বতঃস্ফূর্ত ও ফরমায়েশি–নিজের লেখা সম্পাদনা স্বতঃস্ফূর্ত আর অন্যের লেখা সম্পাদনা করা হয় ফরমায়েশিভাবে–কারও দ্বারা অনুরুদ্ধ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে। কখনো পুরো বইয়ের পাণ্ডুলিপি, কখনো বিচ্ছিন্ন লেখা–প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ফিচার, প্রতিবেদন প্রভৃতি। কখনো সরকারি পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পাদনা; কখনো বেসরকারি পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পাদনা; আবার কখনো ব্যক্তিগত পর্যায়ে সরকারি/বেসরকারি সম্পাদনা।

সম্পাদনার বিষয়, প্রকারভেদ: ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী সম্পাদককে বিচিত্র বিষয়ের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করতে হয়। এগুলো হলো: ১. সৃজনশীল সম্পাদনা, ২. পত্রপত্রিকা ও সাময়িকী সম্পাদনা, ৩. জ্ঞানগর্ভ পুস্তক ও পত্রপত্রিকা সম্পাদনা, ৪. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বা টেকনিক্যাল বিষয় সম্পাদনা, ৫. ব্যাবসায়িক সম্পাদনা, ৬. সংবাদ, প্রতিবেদন ও ফিচার সম্পাদনা, ৭. শিশুতোষ পুস্তক ও পত্রিকা সম্পাদনা–শিশুসাহিত্য সম্পূর্ণ আলাদা বৈশিষ্ট্য, চরিত্র ও মেজাজের হওয়ায় এভাবে আলাদা ক্যাটাগরিতে রাখা হলো। সৃজনশীল সম্পাদনার মধ্যে সাহিত্যনির্ভর রচনা–প্রবন্ধ-নিবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনি, স্মৃতিচারণ, জীবনী প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। সাহিত্যনির্ভর এবং জ্ঞানগর্ভ ও টেকনিক্যাল রচনার পাণ্ডুলিপি সাধারণত বাইরের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ, অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দিয়ে সম্পাদনা করানো হয়। পত্রপত্রিকা, সাময়িকী সাহিত্যনির্ভর হতে পারে; আবার বিজ্ঞান-প্রযুক্তিবিষয়ক হতে পারে। জ্ঞানগর্ভ বইয়ের মধ্যে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, শিক্ষা-সভ্যতা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, ভাষা-সংস্কৃতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। এসব বিষয়ও অভিজ্ঞ রিসোর্স পারসন দ্বারা সম্পাদনা করাতে হয়। কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির হ্যান্ডবুক বা উদ্দেশ্য-আদর্শ-কর্মসূচি প্রচারমূলক পত্রিকা-সাময়িকী সম্মানির বিনিময়ে সম্পাদনা করাই হলো ব্যাবসায়িক সম্পাদনা। এক্ষেত্রে সম্পাদক সাধারণত পার্টটাইমার হয়ে থাকেন। সংবাদপত্রভিত্তিক সম্পাদনা অর্থাৎ সংবাদ, প্রতিবেদন, ফিচার প্রভৃতি সম্পাদনা হয় সাধারণত নিয়মিতভাবে নিযুক্ত কর্মী দ্বারা। শিশু-কিশোর পত্রপত্রিকা, সংবাদপত্রের সাহিত্য পাতা ও শিশুদের পাতাও নিয়মিতভাবে নিযুক্ত/দায়িত্বপ্রাপ্ত লোক দ্বারা সম্পাদিত হয়। শিশুতোষ পত্রিকা-সাময়িকী সম্পাদনার দায়িত্ব অবশ্যই নিয়মিতভাবে নিযুক্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকের ওপর দেওয়া উচিত।

কীভাবে এগোবেন: নিজের লেখার ক্ষেত্রে লেখা কয়েকদিন রেখে দেওয়ার পর আবার পড়ুন; দেখা যাবে এর মধ্যে অনেক অসংগতি, ত্রুটিবিচ্যুতি আছে। সেই ত্রুটিবিচ্যুতি শব্দ-প্রয়োগ, ভাষা ব্যবহার কিংবা বাক্য নির্মাণের ক্ষেত্রে হতে পারে; আবার তথ্য-উপাত্তের ক্ষেত্রেও হতে পারে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখায় এ ধরনের কাটাকুটি বা সম্পাদনার অনেক নমুনা আমরা দেখেছি। বস্তুত এ ধরনের কাটাকুটি বা সম্পাদনা একদিকে যেমন রচনাকারীর আন্তরিকতা, নিষ্ঠা এবং পরিশুদ্ধির শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করার ক্রমাগত প্রয়াসের প্রমাণ; অন্যদিকে এই প্রয়াস-প্রচেষ্টা লেখক ও সম্পাদনাকর্মীদের জন্যও অব্যাহত প্রেরণার উৎস হয়ে থাকে। আবার অন্যের লেখা বইয়ের পাণ্ডুলিপি আপনার কাছে সম্পাদনার জন্য এলে প্রথমেই এর শিরোনামের প্রতি চোখ বোলান। প্রবন্ধ বা গবেষণামূলক পাণ্ডুলিপি হলে সূচিপত্র ভালোভাবে–পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষণ করবেন এবং আলোচ্য বিষয় মোটামুটিভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করবেন। এরপর একটু রিলাক্স মুডে পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করবেন। প্রথমেই সূচিপত্রের বিন্যাসে কোনো ত্রুটি আছে কি না পরীক্ষা করুন এবং প্রয়োজনে সংশোধন করুন। মনে রাখতে হবে, এই সংশোধন একেবারে প্রাথমিক–পুরো পাণ্ডুলিপি পড়া শেষ হলে সূচিপত্র হয়তো পুনঃসম্পাদনারও প্রয়োজন হতে পারে। যাহোক, সূচির পর পাণ্ডুলিপির ভেতরে প্রবেশ করুন এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হোন। সাবহেডিং, শব্দ ও ভাষাবিন্যাস, তথ্য-উপাত্তের উপস্থাপনা প্রভৃতির ওপর তীক্ষ্ণভাবে, সতর্কতার সঙ্গে নজর রাখুন; প্রতিটি শব্দ অন্তরের স্পর্শ ও অনুরাগ মিশিয়ে পড়ুন এবং প্রয়োজনমতো সংশোধন করুন। কোনো শব্দ বা তথ্যের বিষয়ে খটকা লাগলে অভিধান ও প্রয়োজনীয় রেফারেন্স বই দেখুন। ইন্টারনেট ব্যবহারের অভিজ্ঞতা থাকলে অতিসহজে ওয়েবসার্চিঙের মাধ্যমে যে কোনো তথ্যগত জটিলতার সমাধান পাওয়া যায়। তবে সম্পাদনা করতে গিয়ে পাণ্ডুলিপির স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ গতি, শৈলী ও সৌন্দর্য যাতে কিছুতেই ক্ষুণ্ন না হয়, সেদিকে যত্নবান থাকা খুবই জরুরি। প্রয়োজনে এক্ষেত্রে লেখকের সঙ্গেও পরামর্শ করা যেতে পারে। কোনো ক্ষেত্রে লেখকের সঙ্গে যদি মতানৈক্য সৃষ্টি হয়, সেক্ষেত্রে

সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। পাণ্ডুলিপিতে জাতীয় স্বার্থ ও দেশবিরোধী, ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিবিরোধী কোনো বক্তব্য বা ইঙ্গিত থাকলে তা অবশ্যই বাদ দিতে হবে। এক্ষেত্রে দ্বিধা-সংকোচের কোনো অবকাশ নেই।

সৃজনশীল গল্প-কবিতা, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনি, জীবনী ও স্মৃতিচারণামূলক বইয়ের ক্ষেত্রে সূচিবিন্যাসে কিছু স্বাধীনতা ও রকমফের থাকে। কবিতা ও গল্পের পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে সূচিতে কবিতা ও গল্পের নামগুলো থাকলেই চলে। উপন্যাসে সাধারণত কোনো সূচি থাকে না; তবে ভেতরে অধ্যায়ের নম্বর অথবা সাবহেডিং থাকা ভালো। জীবনী বা স্মৃতিচারণামূলক লেখায় বিস্তারিত সূচিপত্র থাকা আবশ্যক। সম্পাদককে এসব বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। শিশু-কিশোর উপযোগী পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে সম্পাদককে অধিকতর যত্নবান হতে হয়। লেখার ভাষা, শব্দ ব্যবহার, উপস্থাপনা প্রভৃতি সহজ-সরল-সাবলীল ও সুখপাঠ্য হওয়া অপরিহার্য। শিশুর রুচি, চাহিদা, ভালোলাগা ও মানসিক ধারণক্ষমতা বড়োদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এ কারণে শিশুর জন্য লেখা যেমন কঠিন, সম্পাদনাও তেমনই কঠিন আর চ্যালেঞ্জিং। সম্পাদককে শিশুর মন-মানসিকতা ও রুচিকে নিজের মধ্যে ধারণ করে সম্পাদনা করতে হবে। শিশুতোষ পাণ্ডুলিপি সম্পাদনাকালে সম্পাদককে সতর্কভাবে খেয়াল রাখতে হবে–ভাষা যেন কোনোভাবে জটিল, ঘোরালো আর কষ্টকল্পনাদুষ্ট না হয়। শব্দের ব্যবহারও হতে হবে যথাযথ–সহজবোধ্য, শিল্পগুণসম্পন্ন ও ঝরঝরে। ছড়া-কবিতার ক্ষেত্রে অন্তর্মিল আছে কি না, তা বিবেচনা করা জরুরি। ছন্দের মাত্রা, বক্তব্যের সরলরৈখিক স্পষ্টতা ও পরিমিতি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচ্য। 'ছোটো মুখে বড়ো কথা'–এমন ভাব যেন পাণ্ডুলিপিতে না থাকে। সম্পাদক যদি শিশুসাহিত্যিক হন, তাহলে তার জন্য শিশুতোষ রচনার পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার কাজটি সহজ হয়।

বাংলা শব্দের ব্যাবহারিক রূপ ও বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি প্রকাশিত অভিধান, বিশেষ করে *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*-এর সাহায্য নেওয়া সম্পাদক-প্রুফরিডার উভয়ের জন্যই নিরাপদ। ইংরেজি শব্দের বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি প্রকাশিত ইংরেজি-বাংলা এবং বাংলা-ইংরেজি ডিকশনারির ওপর নির্ভর করা ভালো। এতে সম্পাদনার ক্ষেত্রে আধুনিকতার পাশাপাশি সর্বত্র একটি ইউনিফর্মিটি বা সমরূপতা অক্ষুণ্ন থাকবে; নানারূপ বৈপরীত্য আর বিভ্রান্তির আশঙ্কাও তাতে কমবে।

ঘরে বসে পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করা বেশি স্বচ্ছন্দ ও উপভোগ্য। এ কাজ করতে গিয়ে কখনো ধৈর্য বা আত্মবিশ্বাস হারাবেন না। জটিল পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে মাঝেমধ্যে কাজ বন্ধ রেখে ঘরে বা বারান্দায় পায়চারি করুন; অনুচ্চ কণ্ঠে প্রিয় কোনো গানের কলি আওড়ান; হালকা কিছু খেয়ে নিন কিংবা কম্পিউটারে কিছুক্ষণ ওয়েবসার্চিং করুন। এতে আপনি রিলাক্সড ফিল করবেন এবং চাঙা হয়ে উঠবেন। পাণ্ডুলিপির কোনো প্যারা বা পৃষ্ঠাবিশেষ বেশি জটিল ও গোলমেলে মনে হলে লাল কালি দিয়ে চিহ্নিত করে রাখুন; পরবর্তী সময়ে অবসরে ওই অংশ পুনরায় দেখুন–প্রয়োজনে একাধিকবার দেখুন এবং ঠান্ডামাথায় সম্পাদনা করুন; দেখবেন, আর জটিল মনে হচ্ছে না। এরপরও যদি সম্পাদনা সন্তোষজনক মনে না হয়, তখন অন্য কোনো সহকর্মী, বন্ধু বা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পারদর্শী কারও সাহায্য নিতে পারেন। এতে সময় কিছুটা বেশি যাবে; কিন্তু একটি নির্ভুল ও শৈলীসমৃদ্ধ সম্পাদনাকর্মের জন্য এর বিকল্প নেই। একজন দক্ষ সম্পাদক শুধু মেরামতকারী নন; একজন শিল্পী এবং নির্মাতাও। শিল্পী ও নির্মাতাকে সময় ও অর্থের হিসাব করলে চলে না; এ এক আলাদা হিসাব। নতুন কিছু সৃষ্টিজনিত কৃতিত্ব ও তৃপ্তির হিসাব কি বৈষয়িক মাপকাঠিতে নির্ণয় করা যায়?

দক্ষ সম্পাদকের বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা: দক্ষ সম্পাদকের যোগ্যতা ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য তৈরি হয় দীর্ঘদিনের বাস্তব অভিজ্ঞতার অঙ্গারে পোড় খেয়ে খেয়ে। এগুলোকে সংক্ষিপ্ত ও সমন্বিত করলে যা দাঁড়ায় তা হলো: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পর্যাপ্ত স্বচ্ছ জ্ঞান, শব্দের যথোপযুক্ত ও বিভিন্নমুখী প্রয়োগ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা, বানান সম্পর্কে সঠিক ও স্বচ্ছন্দ ধারণা, সম্পাদনার জন্য প্রাপ্ত/গৃহীত বিষয়টি অন্তরঙ্গভাবে আত্মস্থ করা, সম্পূর্ণ বিষয়ের ওপর একধরনের দখল ও আধিপত্য তৈরি করা, সৎসাহস ও আত্মবিশ্বাস, পক্ষপাতহীন নৈর্ব্যক্তিকতা, অসীম ধৈর্য, একাগ্রতা, নিজের মধ্যে নবসৃষ্টির আনন্দ অনুভব করা, সংশোধন-সংযোজন-পরিমার্জনের জন্য যথাযথ রেফারেন্সের অনুসন্ধান, পেশাদারিহীন একান্ত নিবেদিতচিত্ততা; পাণ্ডুলিপির বিষয়বিন্যাস, সূচিবিন্যাস, হেডিং ও সাবহেডিং বিন্যাস, ভাষা ব্যবহার, বিষয় উপস্থাপন প্রভৃতি যথাযথ আছে কি না, তা দেখা ও প্রয়োজনবোধে সংশোধন করার সামর্থ্য; ইন্টারনেট সার্চিংয়ে পারঙ্গমতা প্রভৃতি। পুনরুক্তি হলেও বলব, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ববিরোধী এবং ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী কোনো বিষয় বা ইঙ্গিত পাণ্ডুলিপিতে আছে কি না, এ বিষয়ে সতর্ক থাকা–থাকলে বাদ দেওয়া একজন সচেতন, নিরপেক্ষ ও সজ্জন সম্পাদকের জন্য অপরিহার্য। পক্ষপাতহীন, অসাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনার অধিকারী, প্রাজ্ঞ ও প্রগতিশীল একজন মানুষই যথার্থ সম্পাদক হিসাবে সর্বোচ্চ অবদান রাখতে পারেন। সম্পাদকের প্রতিনিয়ত-সঞ্চিত বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং সেই অভিজ্ঞতাকে আত্মস্থ করে তার কাজকে ক্রমাগত শানিত ও উৎকর্ষমণ্ডিত করার মধ্যেই প্রকৃত সার্থকতা ও পরিপক্বতা নিহিত; তাত্ত্বিক বা একাডেমিক জ্ঞান দিয়ে যা পুরোপুরি সম্ভব হয় না।

বিভ্রান্তি আর ভুলের ঘেরাটোপে: পাণ্ডুলিপি সম্পাদনাকালে বিচিত্র আর নব নব সমস্যা হাজির হয় সম্পাদকের সামনে। বাংলা ভাষা আর শব্দের যথোপযুক্ত অর্থ ও ব্যবহার না জানলে; ভাষার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য, প্রাণশক্তি, আবেগ ও স্বতঃপ্রবহমানতা সম্পর্কে ভালো ধারণা না থাকলে এবং সন্দেহজনক কোনো বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হওয়ার প্রবণতা ও যোগ্যতা না থাকলে সামান্য ত্রুটি বা অসাবধানতার কারণে একটি পঙ্‌ক্তি, একটি অনুচ্ছেদ বা গোটা বইয়ের সার্বিক আবহের ওপরও তা বিরূপ প্রভাব ফেলে। এমন কিছু ত্রুটিপূর্ণ বাক্যের বিষয়ে নিচে আলোচনা করা হলো:

ক. ***বিজয় দিবসে হাজার হাজার মানুষেরা সাভার স্মৃতিসৌধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন।*** এখানে ভুল কোথায়? হাজার হাজার মানুষেরা নয়, হাজার হাজার মানুষ–দ্বৈত বহুবচন অশুদ্ধ। এই বাক্যে আরও একটি ভুল আছে–উদ্দেশ্যে নয়, উদ্দেশে অর্থাৎ দিকে। শ-এর শেষে য-ফলা (্য) থাকলে তা টার্গেট বা লক্ষ্যবাচক বোঝায়। এসব বিষয়ে সচেতন না থাকলে সম্পাদকের মূল উদ্দেশ্যই ভন্ডুল হয়ে যাবে। অতএব বিজ্ঞ সম্পাদককে সতর্কতার সঙ্গে শুদ্ধরূপটি নিশ্চিত করতে হবে।

খ. ***১৯৭৫ সালে সরকারিভাবে সারা দেশে ১৬.১২৫ টন ধানবীজ বিতরণ করা হয়।*** এখানে একটি মারাত্মক ত্রুটি রয়েছে, তা হলো–সারা দেশে মাত্র ওই পরিমাণ ধানবীজ বিতরণ? লেখকের লেখাটি টাইপকৃত। লেখকও অনেক নামিদামি। আপাতত তার সঙ্গে যোগাযোগ সহজসাধ্য নয়; কর্তৃপক্ষীয় তাগাদাও আছে। এখন সম্পাদক কী করবেন? দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং সচেতন-সপ্রতিভ সম্পাদকের মাথার মধ্যে তখন একটি প্রশ্ন দ্রুতই জাগ্রত হবে–এ কীভাবে হয়? টাইপের সময় কপিতে হয়তো ভুলটি হয়ে গেছে; এখন এর সুরাহা না করে কি তিনি নীরবে স্ক্রিপ্ট ছেড়ে দেবেন? কখনোই না। তিনি তখন এ বিষয়ে যথাসাধ্য অনুসন্ধান করবেন, বিফল হলে কর্তৃপক্ষের গোচরে বিষয়টি উপস্থাপন করবেন। এভাবে ইন্টার‍্যাকশন (মিথস্ক্রিয়া) ও অনুসন্ধানের

মাধ্যমে ঠিকই বেরিয়ে আসবে যে, অঙ্কটি ১৬.১২৫ নয়; আসলে তা ১৬,১২৫। এই 'বিন্দু' (.) আর 'কমা'র (,) হেরফেরের কারণে যে তেলেসমাতি কাণ্ড ঘটে যাচ্ছিল, কোনো কৈফিয়ত দিয়ে কি সম্পাদক তার দায় এড়াতে পারতেন?

গ. ***জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে মাতৃভাষা বাংলায় ভাষণ দেন।*** এ বাক্যে কি কোনো ভুল আছে? আক্ষরিক অর্থে ভুল না থাক, বিভ্রান্তি আছে। বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে ভাষণ দিতে শুরু করেছিলেন ২৪ সেপ্টেম্বর, নিউইয়র্ক সময় বিকাল ৪টায়, যা বাংলাদেশের হিসাবে পরের দিন অর্থাৎ ২৫ সেপ্টেম্বর। আসলে দুটি তারিখই সঠিক–পার্থক্য যা তা হলো ভৌগোলিক অবস্থান ও দূরত্বের কারণে সৃষ্ট। কিন্তু এই বিভ্রান্তি এড়ানোর লক্ষ্যে ২৪ সেপ্টেম্বরের পরে নিউইয়র্ক সময় অপরাহ্ণ ৪টা (4 p.m.) এবং ২৫ সেপ্টেম্বরের পরে বাংলাদেশ সময় পূর্বাহ্ণ ২টা (2 a.m.) লিখে দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। কপিতে না থাকলেও এটি ঠিক করে দেওয়া সম্পাদকের দায়িত্ব।

চৌধুরী শামসুর রহমান, চৌধুরী ওসমান ইত্যাদি), ভুঁইয়া ('ভুঁইয়া' যখন নামের আগে লেখা হয়–যেমন: ভুঁইয়া ইকবাল, ভুঁইয়া মো. গোলাম কবির ইত্যাদি), ডাক্তার, প্রফেসর প্রভৃতির আগেও 'জনাব' লিখতে হয় না। জনাবের স্ত্রীলিঙ্গ 'জনাবা' নয়, বেগম। স্ক্রিপ্টে এমনসব 'সফেদ আগাছা' থাকলে সম্পাদক তার তীক্ষ্ণ-ধারলো নিড়ানি-হাতে তা সাফ করবেন। আর বড়ো বড়ো অভিজাত পদবির তকমা দেখে তিনি যদি ঘাবড়ে যান, তাহলে ডাবল সম্মান দিতে গিয়ে সম্মান/খেতাবধারীর সম্মানের পুরোটাই যেমন মাটি হবে; তেমনই বাক্যের সৌন্দর্য আর অন্তর্নিহিত ছন্দও মার খাবে।

সম্পাদককে এমনই অজস্র ভুলভ্রান্তি আর কালো-ধলো-লাল-নীল-সবুজ-হলুদ গোলকধাঁধার মুখোমুখি হতে হয় প্রতিনিয়ত। ***তথাপিও*** (হায় হায়, কী লিখলাম! হবে তো 'তথাপি'!) পরম ধৈর্যসহকারে, স্বীয় নিষ্ঠা আর বুদ্ধি-জ্ঞান-অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে তিনি এগিয়ে যান। নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় তাঁর ঝুলিতে; তিনি তাও দিতে থাকেন অকৃপণভাবে।

স্ক্রিপ্টে এমনসব 'সফেদ আগাছা' থাকলে সম্পাদক তার তীক্ষ্ণ-ধারলো নিড়ানি-হাতে তা সাফ করবেন। আর বড়ো বড়ো অভিজাত পদবির তকমা দেখে তিনি যদি ঘাবড়ে যান, তাহলে ডাবল সম্মান দিতে গিয়ে সম্মান/খেতাবধারীর সম্মানের পুরোটাই যেমন মাটি হবে

ঘ. ***আমি বন্ধুর বাড়িতে যেয়ে শুনলাম, সে কাউকে না বলে চট্টগ্রাম চলে গেছে।*** এখানে 'যেয়ে' অশুদ্ধ, শুদ্ধ–'গিয়ে' হবে।

ঙ. ***ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ছাড়াও সংস্কৃতি, ইংরেজী, আরবী, ফারসী, ফরাসীসহ ১৮টি ভাষা জানতেন।*** বিজ্ঞ সম্পাদক নির্দ্বিধায় কলম চালিয়ে সংশোধন করবেন–সংস্কৃত, ইংরেজি, আরবি, ফারসি, ফরাসি...। বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানবিধি অনুযায়ী 'ী'-এর স্থলে 'ি' হবে।

চ. ***হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মাচুপিচুতে প্রাচীন ইনকা সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার হয়েছে।*** এখানে দুটো ভুল–একটি তথ্যগত, অন্যটি শব্দের ব্যবহারগত। মাচুপিচু হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের নয়, পেরুর একটি হারিয়ে যাওয়া শহর। লেখকের অবশ্য এমনভাবে লেখার কথা নয়; কিন্তু যেভাবেই হোক ভুলটি হয়ে গেলে সম্পাদকের অ্যান্টেনায় তা ধরা পড়তে হবে এবং সংশোধন করতে হবে। ওই বাক্যে অন্য যে ভুলের কথা বললাম, তা হলো–'আবিষ্কার হয়েছে' নয়, 'আবিষ্কৃত হয়েছে'।

ছ. ***জনাব খান বাহাদুর লতিফুর রহমান জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।*** এখানে সম্মানসূচক খেতাবের আগে 'জনাব' হয় না। তেমনই কাজী, সৈয়দ, শেখ, চৌধুরী ('চৌধুরী' যখন নামের আগে লেখা হয়–যেমন:

তিন.

এ পর্যায়ে আমরা প্রুফরিডিং সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করতে চাই।

প্রুফরিডিং কী: প্রুফের আভিধানিক অর্থ–প্রমাণ, সাক্ষ্যপ্রমাণ, প্রামাণ্যকরণ, প্রতিপাদন প্রভৃতি। প্রকাশনা ও মুদ্রণশিল্পের ক্ষেত্রে এর অর্থ–মুদ্রণ সংশোধন করা, পাণ্ডুলিপির ভুলত্রুটি নিরসন করা।

কেন প্রুফরিডিং: সৌকর্যপূর্ণ ও রুচিসম্মত পুস্তকের পূর্বশর্ত হচ্ছে প্রুফরিডিং–নিখুঁত-নির্ভুল প্রুফ সংশোধন। প্রুফরিডিং ছাড়া একটি বই ছাপা বা প্রকাশের কথা কল্পনাও করা যায় না। প্রুফরিডিং এমনই একটি শৈল্পিক কর্মপ্রক্রিয়া, যার স্পর্শে ভুলগুলো সব ফুল হয়ে সুরভি ছড়ায় নতুন একটি বইয়ের পাতাজুড়ে। বইটি হয়ে ওঠে নির্ভুল আর নান্দনিক। একটি বইয়ের প্রুফরিডিং যত নির্ভুল হয়, বইটির গুণগত সৌকর্য, উৎকর্ষ এবং মানও তত বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে প্রুফের ভুল বা মুদ্রণপ্রমাদপূর্ণ একটি বই সুধী পাঠকনন্দিত হওয়ার আশা করতে পারে না; হোক না বইটি কোনো ডাকসাইটে নামি লেখকের লেখা কিংবা হোক না সে বইয়ের বিষয় অভিনব ও অশেষ মূল্যবান।

পদ্ধতি/প্রকারভেদ: ১. সাধারণ বা সনাতন পদ্ধতি–কাগজে মুদ্রিত 'ম্যাটার' দেখে দেখে সংশোধন করা; ২. বিকল্প পদ্ধতি–কপিহোল্ডারের

সাহায্যে প্রুফ দেখা; ৩. দ্বৈত রিডিং–একই পৃষ্ঠা পরপর দুজন দেখা; ৪. কাটা-প্রুফ মেলানো–বিশেষজ্ঞ বা ঊর্ধ্বতন কারও সংশোধিত/নির্দেশিত বিষয় মিলিয়ে দেখা; ৫. কম্পিউটার স্ক্রিনে প্রুফ দেখা; তবে প্রুফের প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ বেশি কাটাকাটি করা প্রুফ কম্পিউটার স্ক্রিনে সংশোধন না করা ভালো; তাতে সব ভুল ঠিকভাবে শনাক্ত ও সংশোধন করতে কষ্ট হয়, বাদও পড়ে যায় অনেক। স্ক্রিন প্রুফরিডিং একেবারে ফাইনাল স্টেজে করা বাঞ্ছনীয়–এতে প্রুফরিডিং অধিকতর নির্ভুল হয়।

প্রুফরিডারের যোগ্যতা ও দক্ষতা: ভাষার ওপর স্বচ্ছন্দ দখল; আধুনিক বানানরীতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা; অপরিসীম ধৈর্য, স্থৈর্য; কাজের প্রতি একনিষ্ঠতা ও ভালোবাসা; তিনি মাছিমারা কেরানি নন, তিনিও একধরনের সম্পাদক–কপি এডিটর–এ বিশ্বাসে উজ্জীবিত থাকা; অবহেলা ও যেনতেনভাবে কাজ শেষ করার মানসিকতা পরিহার প্রভৃতি। এজন্যই পত্রিকা অফিসের প্রুফরিডারদের বলা হয় 'সম্পাদনা সহকারী' (দৈনিক জনকণ্ঠের সহকারী সম্পাদক হিসাবে কর্মকালে আমি এটি দেখেছি)।

কীভাবে প্রুফ দেখবেন: ১. প্রুফের ম্যাটার কখনো শব্দ করে, কখনো নীরবে পড়ুন–এতে ভুল শনাক্ত করা সহজ হবে; ২. মাঝেমধ্যে পেছনের পৃষ্ঠা আকস্মিকভাবে পরীক্ষা করুন; দেখবেন, দু-একটা ভুল বেরিয়ে যাবে; ৩. প্রুফ দেখার সময় তাড়াহুড়া না করে ধীরে ধীরে পড়ুন এবং অন্তরের স্পর্শ দিয়ে পড়ুন; নিছক চর্মচক্ষুতে নয়, মনের চোখ দিয়ে পড়ুন; দেখবেন পঠিত ম্যাটার আপনার পুরো অস্তিত্বে মিশে গেছে–তখন ভুলের আশঙ্কা কমে যাবে, দ্রুত পড়লে স্লিপ করবে; ৪. প্রতিটি শব্দের ওপর আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে অগ্রসর হোন; দেখবেন, ভুল সহজেই নজরে পড়বে; ৫. কিছুটা প্রুফ দেখার পর কমন যে ভুলগুলো বারবার নজরে আসবে, শুদ্ধ বানানসহ সেসব শব্দের একটি চার্ট করে নিন; তাহলে দ্রুত নির্ভুল প্রুফ দেখা সম্ভব হবে–বারবার ডিকশনারি খুলতে হবে না; ৬. সম্পাদকের মতোই, অনেকক্ষণ প্রুফ দেখার পর কিছুক্ষণ ঘরে হাঁটাচলা করুন, গুনগুন করে কোনো প্রিয় গানের কলি আওড়ান অথবা কিছুক্ষণ ওয়েবসার্চিং করুন; হালকা কিছু খেয়েও নিতে পারেন। এতে মানসিক রিলাক্সনেস বাড়বে, আপনি অধিকতর চাঙা হয়ে উঠবেন; ৭. প্রুফরিডিংকে ক্লান্তিকর কাজ মনে না করে বিষয়ের মধ্যে ঢুকে যান এবং তৃপ্তিসহকারে এনজয় করুন; দেখবেন প্রুফরিডিং বিনোদনের মতো মনে হবে; ৮. মানসিক দুশ্চিন্তা বা উদ্‌বেগ নিয়ে প্রুফ দেখবেন না; ৯. পাণ্ডুলিপির কোনো অংশ জটিল ও বেশি ভুলে ভরা মনে হলে সেই অংশ চিহ্নিত করে রাখুন এবং বিশ্রামের সময় ঠান্ডামাথায় ওই অংশের প্রুফ দেখুন; ১০. কোনো জটিল বানানের ব্যাপারে কোনো সহকর্মীর সঙ্গে আলোচনা করে সমাধান করুন কিংবা পাশে তেমন কেউ না থাকলে বা তেমন পরিবেশ না থাকলে উপযুক্ত কাউকে ফোনও করা যেতে পারে–এতে মানসিকভাবে যেমন রিলাক্সড ফিল করবেন, তেমনই সঠিক বানানটিও পেয়ে যাবেন; ১১. আপনি নিজেকে একজন শিল্পী ভাবুন; তাহলে নিজেকে অনেক বড়ো ও মহিমান্বিত মনে হবে, ক্লান্তি ও একঘেয়েমি তখন আপনাকে কাবু করতে পারবে না; ১২. সম্পাদকের মতো আপনিও সঠিক বানানের জন্য বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান ও বাংলা একাডেমি বাংলা-ইংরেজি, ইংরেজি-বাংলা অভিধান ব্যবহার করুন। মনে রাখবেন: থিয়োরি হজম করার চেয়ে ব্যক্তিগত জ্ঞান, বাস্তব অভিজ্ঞতা, মানসিক সচেতনতা এবং নিষ্ঠাপূর্ণ ধৈর্য ও আন্তরিকতাই আপনার সবচেয়ে বড়ো শক্তি। বিশ্বস্ত বন্ধু।

আসুন কিছু প্রুফ দেখি: কম্পোজকৃত প্রুফ যখন সংশোধনের জন্য হাতে আসে, তখন আমাদেরকে বিচিত্রমুখী অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। কম্পোজিটরের অজ্ঞাতে/অসাবধানতায়, ে/ে, ি, ী ইত্যাদির হেরফেরে, কোনো বর্ণের অনাকাঙ্ক্ষিত আগমনে কিংবা অনুপস্থিতিতে এমনসব অভিনব আর আজগুবি শব্দ তৈরি হয়ে যায়, যা দেখে অনেক সময় ভিরমি খেতে হয়। তবে মাথা ঠান্ডা রেখে ভালো করে নিরীক্ষণ করুন; দেখবেন, ধীরে ধীরে গোলকধাঁধা খোলাসা হয়ে আসছে। এরপরও যদি সুরাহা না হয়, তখন স্ক্রিপ্ট পরীক্ষা করুন। অনেক সময় টাইপকৃত স্ক্রিপ্টেও এ ধরনের কিছু ভুল থাকতে পারে। তখন আপনি সেই ত্রুটিগুলো নিরসনের যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন; ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট স্থানে/স্থানগুলোয় লাল কালি দিয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) দিন এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। এখন আসুন হাতেকলমে কিছু প্রুফ সংশোধন করি:

বিদেশী–বিদেশি; গুণগুণ–গুনগুন; মুখোমুখী–মুখোমুখি; জাপানী–জাপানি; আতাত–আঁতাঁত; আকাঙ্খা–আকাঙ্ক্ষা; ফরমায়েশী–ফরমায়েশি; গিয়েছিলো–গিয়েছিল; বটি–বঁটি; এক যোগে–একযোগে; এ যাবৎ–এযাবৎ; এ্যাপার্টমেন্ট–অ্যাপার্টমেন্ট; স্বদেশী–স্বদেশি; স্বপরিবারে–সপরিবারে; ইংল্যাণ্ড–ইংল্যান্ড; ঐক্যমত– ঐকমত্য; উপনিবেশিক–ঔপনিবেশিক; বনিক–বণিক; কর্ণেল– কর্নেল; সরকারী–সরকারি; সহকারি–সহকারী; কর্মচারি– কর্মচারী; কুণ্ঠিত–কুণ্ঠিত; মন্ত্রীপরিষদ–মন্ত্রিপরিষদ; শিক্ষামন্ত্রি– শিক্ষামন্ত্রী; উচ্ছ্বল–উচ্ছল; উচ্ছাস–উচ্ছ্বাস; কল্যাণীয়েসু– কল্যাণীয়েষু; কল্যাণীয়াষু– কল্যাণীয়াসু; কার্টুণ–কার্টুন; মন্ডলি–মণ্ডলী; আল্লাহ্– আল্লাহ; দেশব্যাপি–দেশব্যাপী; ব্যধি–ব্যাধি; ব্যাণ্ডেজ–ব্যান্ডেজ; ঘন্টা– ঘণ্টা; যুক্তফ্রন্ট–যুক্তফ্রন্ট; ছয় দফা–ছয়দফা; ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান– উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান; ময়ুর–ময়ূর; মরমীয়া–মরমিয়া; আসিরিয়– আসিরীয়; এশিয়–এশীয়; সম্বর্ধনা–সংবর্ধনা, ষ্টেশনারী– স্টেশনারি, অমর্ত সেন–অমর্ত্য সেন, ভালবাসা–ভালোবাসা, অন্তর্ভূক্ত– অন্তর্ভুক্ত, ভুতুড়ে–ভূতুড়ে, শ্লোগান–স্লোগান প্রভৃতি। একটু কষ্ট স্বীকার করে প্রথমদিকে হয়তো বারবার অভিধান দেখতে হবে; কিন্তু দেখতে দেখতে এমন অবস্থা হবে, যখন আপনাকে আর তেমনটি করতে হবে না। পরবর্তী সময়ে বিরক্তি, ক্লান্তি আর আলস্যও ক্রমে ক্রমে কমে আসবে। তবে মনে রাখবেন, কখনো হেলা করবেন না বা আলস্যের কাছে ধরা দেবেন না। একটু সন্দেহ হলেই অভিধান দেখবেন। তাহলে ভুলের দৈত্য আপনার সতর্ক বেড়া ডিঙিয়ে কখনোই আপনার ফুলেল আঙিনায় প্রবেশ করতে পারবে না। প্রুফের চমৎকার মালা দিয়ে আপনি যদি একটি সুরভিত ভুবন তৈরি করতে পারেন নিজের মধ্যে, তাহলে ক্লান্তি বা বিরক্তি আপনার কাছেই ***ঘেঁসবে*** না–স্যরি, ঘেঁষবে না।

শেষ কথা: সম্পাদনা ও প্রুফরিডিং দেশের প্রকাশনাশিল্পে প্রবল প্রাণসঞ্চারী শক্তি। কিন্তু এই শিল্পের যারা নেপথ্য কারিকর এবং নিরলস শিল্পী, তারা এখনো অসংগঠিত; নিভুনিভু প্রদীপের মতো অবস্থা–বিশেষ করে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যারা সম্পাদনা ও প্রুফরিডিঙের কাজ করেন, তাদের অবস্থা বেশ নাজুক। তাদের চাকরির পজিশন ও বেতনক্রম সন্তোষজনক নয় বলে মেধাবীরা এ কাজকে স্থায়ী পেশা হিসাবে নিতে আগ্রহী হন না। এদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সরকারের উদ্যোগে এ বিষয়ে একটি জাতীয় ইনস্টিটিউট গড়ে তুলে কর্মীদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দক্ষ করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। সম্পাদক ও প্রুফরিডারদের পেশার আর্থিক-সামাজিক মূল্যায়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা গেলে প্রকাশনা ও মুদ্রণ শিল্প যেমন লাভবান হবে, তেমনই এই পেশায় কর্মরতদের আর্থিক-সামাজিক অবস্থারও পরিবর্তন হবে বলে আশা করা যায়।

লেখক: শিশুসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, গল্পকার;
সাবেক সহকারী সম্পাদক, দৈনিক জনকণ্ঠ

আহমদুল কবির সংবাদের কালপরিক্রমায়

সালাম জুবায়ের

সংবাদ বাংলাদেশের প্রাচীন সংবাদপত্র। একই সঙ্গে বাংলাদেশের প্রগতিশীল ও আদর্শবাদী দৈনিক পত্রিকা। পাকিস্তানের স্বাধীনতালাভের বছরচারেক পর ১৯৫১ সালের ১৭ মে সংবাদ আলোর মুখ দেখে। কিছুটা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে সংবাদ আহমদুল কবিরের হাতে আসে ১৯৫৪ সালে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে তিনি সংবাদ প্রকাশনা শুরু করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের প্রথম ভিপি আহমদুল কবির সেই চল্লিশের দশক থেকেই ছিলেন আধুনিক মানসিকতা, প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক আদর্শে পরিপুষ্ট মানুষ। তার এই আদর্শবাদিতা তিনি পুরোপুরি প্রয়োগ করেছেন সংবাদ প্রকাশনার সময়।

এ উপমহাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসের দিকে চোখ রাখলে দেখা যায়, সংবাদ ছিল পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম প্রগতিশীল ধ্যানধারণার দৈনিক সংবাদপত্র। তবে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল মুসলিম লীগের রাজনৈতিক পত্রিকা হিসাবে প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র নিয়ে। সে অবস্থা থেকে সংবাদের দায়িত্ব নিয়ে আহমদুল কবির সংবাদকে তুলে এনেছেন, নবজীবন দিয়েছেন আদর্শের সত্যনিষ্ঠ পথচলায়। আর এই ব্যাপক কর্মকাণ্ডে তার মেধা, প্রগতিশীল নীতি-আদর্শই ছিল পাথেয়, যা তিনি অর্জন করেছেন শিক্ষা ও মর্যাদাশীল পারিবারিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে।

এক্ষেত্রে প্রগতিশীল ও আধুনিক মানসিকতাসম্পন্ন আদর্শের পথে আহমদুল কবিরের আগুয়ান সম্ভব হয়েছিল মেধা আর উচ্চ ভাবনাসমৃদ্ধ চিন্তাচেতনার ধারক-বাহক হওয়ার ফসল হিসাবে। একই সঙ্গে তার রাজনীতিতেও এই চিন্তাচেতনা আর আদর্শের প্রভাব পড়েছিল। এ পর্যায়ে তার সাংবাদিকচেতনা ও রাজনৈতিক আদর্শ একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করেছে–তা থেকেই গ্রহণ-বর্জনের দীর্ঘ পথ পেরিয়ে তার জীবনের সবকিছু অর্জন করেছেন তিনি।

আহমদুল কবিরের রাজনৈতিক দর্শন ছিল এদেশের সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ে কাজ করা। তদানীন্তন পাকিস্তানের রাজনীতিতে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল যে ধারা এদেশে ধর্মবর্ণনির্বিশেষে বিপুল জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক চেতনাকে নাড়া দিয়েছিল, সেই ধারার পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী রাজনীতিতে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন তিনি। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন আদর্শবান এবং নীতিনিষ্ঠ এক নেতা হিসাবে।

এ অবস্থা আহমদুল কবিরকে যেমন ভিন্নমাত্রার সাংবাদিকতার দিকপাল হওয়া এবং আদর্শবাদী রাজনীতিকের মর্যাদা দিয়েছে, তেমনই তাকে আদর্শবাদী রাজনৈতিক কর্মী ও গণমানুষের নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এটা আমাদের আগের প্রজন্মের মানুষের জন্য ছিল বেশি পাওয়া।

বাংলাদেশের সংবাদপত্রে সাংবাদিকতা ও ব্যবস্থাপনার আধুনিক ধারা যেসব ক্ষণজন্মা মানুষের পরিকল্পনা ও শ্রমে বর্ধিত হয়েছে, আহমদুল কবির ছিলেন তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। দৈনিক সংবাদ তার হাত দিয়ে পরিপুষ্ট এবং চরম প্রতিকূল রাজনৈতিক আবহে সংবাদ তৈরিতে প্রগতিশীলতা ও আধুনিকতার একটি নতুন ধারা প্রবর্তনে তার অবদান অনেকটা পথিকৃতের মতো। বাংলাদেশে আজ সংবাদপত্র যে চেহারায় আবির্ভূত–বলা যায়, এর প্রথম প্রচলন সংবাদের মাধ্যমে এবং আহমদুল কবিরের নেতৃত্বে সংবাদ সেই আধুনিক ধারা এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রথম সচেষ্ট হয়েছিল। যার ফল বাংলাদেশে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা পেশার বিস্তার এবং কাঙ্ক্ষিত মান অর্জন। পঞ্চাশের দশকের শুরু হলেও তা কালে কালে রাজনীতি ও ইতিহাসের বাঁক পেরিয়ে আরও সমৃদ্ধ ও পরিণত অবস্থান পাচ্ছে।

আজ সংবাদপত্রজগতের একটি আদর্শবাদী প্রতিষ্ঠান হিসাবে সংবাদ দেদীপ্যমান হলেও এর যাত্রা ছিল চরম প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্র হিসাবে। ১৯৫১ সালে সংবাদ প্রকাশিত হলেও আর্থিক সমস্যার কারণে ১৯৫২ সালে এর মালিকানা চলে যায় তথনকার ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের হাতে। সেই ১৯৫২ সালে সংবাদ প্রকাশিত হয় ধর্মীয় আদর্শের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগের মুখপত্র হিসাবে। তখনকার রাজনীতিতে সৃষ্টি হচ্ছিল নতুন আদর্শের প্রগতিশীল ধারা।

সেই আবহে প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি একাধিক কারণে। এর পরিণতি হিসাবে অপমৃত্যু হয় সংবাদের। একেবারে নিঃশেষ না হয়ে হাতবদল হয়ে পড়ে আহমদুল কবিরের হাতে। মুসলিম লীগের হাত থেকে আহমদুল কবিরের হাতে আসাকে নিছক হাতবদল বলা যাবে না, বলতে হবে সংবাদের নতুন জীবনলাভ, প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থা থেকে প্রগতিশীল ধারায় রূপান্তর। আর এই রূপান্তরের রূপকার হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন আহমদুল কবির। একইভাবে তার মাধ্যমে সংবাদ যে নতুন সাংবাদিকতার প্রগতিশীল ধারা প্রবর্তন করে, এরও তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক দিকটি সমৃদ্ধ হয়েছে আহমদুল কবিরের সার্বিক চিন্তায়।

আহমদুল কবির শুরুতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে সংবাদ পরিচালনা শুরু করেন। সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১৯৭২ সালে। এর মধ্য দিয়ে তিনি প্রত্যক্ষ সাংবাদিকতায় ব্যাপৃত হন। ২০০১ সালে তিনি প্রধান সম্পাদক হন এবং আমৃত্যু এ দায়িত্ব পালন করে গেছেন। এর প্রতিটি অধ্যায়ে তিনি এক ধরনের স্রষ্টা হিসাবেও–জনজীবনের নানা অনুষঙ্গ সংবাদে তুলে আনা, ভিন্ন ভিন্ন মাত্র যোগ করা, নানাকিছু প্রবর্তন, সাধারণ ও শিক্ষিত মানুষের চাহিদা পূরণে নানা বিষয় ও তথ্য যুক্ত করা–এসব কিছুতেই তিনি স্রষ্টা হিসাবে আবির্ভূত হন।

আহমদুল কবির সংবাদপত্রজগতে অনেক নতুন স্রষ্টা ও চিন্তক তৈরি করেছেন, যারা তার চেতনার আদর্শ ও করণীয়গুলো আরও এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আহমদুল কবিরের আদর্শ ও চেতনার পথ অনুসরণ করে তাদের অনেকেই পরবর্তী সময়ে স্মরণীয়-বরণীয় হয়েছেন। নিজ প্রতিভার আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছেন যেমন, তেমনই অন্যকে, সাংবাদিকতার পেশার নতুন প্রজন্মকে আলোকিত জগতের বাসিন্দা বানিয়েছেন, দীপ্তমানও করেছেন। এক্ষেত্রেও আহমদুল কবিরের কর্মচিন্তা পথপ্রদর্শক হিসাবে জাগরূক ছিল।

কর্ম আর চিন্তাচেতনার নতুনত্ব ও সৃজনশীলতা প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে কী সাংবাদিকতা, কী রাজনীতি–সবখানে তিনি ছিলেন সমসাময়িক অন্যদের চেয়ে উজ্জ্বল এবং ব্যতিক্রমধর্মী। নেতৃত্বের গুণাবলি তাকে এ মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেছে। এর ফল হিসাবে আহমদুল কবির ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংবাদিকতা অঙ্গনের এক প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন। আপসহীন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের জন্য পাকিস্তান আমল থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি ছিলেন একজন ভিন্নমাত্রার সাংবাদিক-রাজনীতিক।

আহমদুল কবিরের নেতৃত্বে সংবাদ সব ধরনের মানুষ এবং সব ধরনের পেশার মর্যাদা তুলে ধরতে নিরপেক্ষ ভূমিকা ধারণ করতে সচেষ্ট ছিল বলেই সম্ভব হয়েছিল মানুষের শ্রেণি-পেশার বিভেদ দূর করে সংবাদের মৌলিক তথ্যকে গুরুত্ব দেওয়া। তথ্যই সেখানে মূল ভূমিকা পালন করেছে। এই চেতনা তার সমকালে ছিল বিরল ও অপ্রত্যাশিত। অপ্রত্যাশিত বলা হচ্ছে এ কারণে যে, তখন সংবাদপত্র ছিল উচ্চমার্গের একটি বিষয়, সেখানে নিম্নশ্রেণি ও পেশার গুরুত্ব ছিল না বললেই চলে।

সেই পঞ্চাশের দশকে কেউ প্রত্যাশা করতেন না সংবাদপত্রে শ্রমিক, কৃষক ও নিম্নবিত্তের খবর গুরুত্ব পাবে। আহমদুল কবির দৈনিক সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে এসব বিষয় প্রাধান্য দিতে কার্পণ্য করেননি। এখানে তিনি ছিলেন সমকালের অন্যদের চেয়ে ব্যতিক্রম এবং এগিয়ে থাকা চিন্তার ধারক। তার এ ধরনের চিন্তাচেতনা ও আদর্শের প্রভাব পড়েছে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার উত্তর প্রজন্মের মনমানসিকতায়।

সংবাদপত্রে আহমদুল কবিরই প্রথম সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার জন্য আলাদা পাতা প্রকাশের সূচনা করেছিলেন। মহিলা পাতা, কৃষকদের পাতা, শিশুদের পাতা, সাহিত্যিকদের পাতা, খেলাধুলার পাতা, সংস্কৃতি পাতা, কৃষি সংবাদ, শ্রমিক সংবাদ প্রভৃতি ছিল সংবাদপত্রে আহমদুল কবিরের সৃজনশীলতার ছাপ এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে সংবাদপত্রে তুলে ধরার প্রত্যাশার বাস্তবায়ন। তার আগে এমন অবস্থা কেউ সৃষ্টি করেননি তা বলা যাবে না; কিন্তু এমন বিস্তারিত ও পরিকল্পিতভাবে হয়নি তা বলা যায়। আহমদুল কবির তখন আধুনিক মানসিকতাসম্পন্ন ছিলেন বলেই এসব কাজ তিনি সংবাদে বাস্তবায়ন করেছেন।

অসাম্প্রদায়িক চেতনা, মুক্তবুদ্ধি এবং জাতীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আহমদুল কবির ছিলেন আপসহীন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তান সরকার 'সংবাদ' পুড়িয়ে দেয় এবং আহমদুল কবিরকে গ্রেফতার করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সামরিক জান্তা 'সংবাদ' প্রকাশের জন্য অনেক প্রলোভন দেখায়; কিন্তু আহমদুল কবির পত্রিকা প্রকাশ করেননি, কোনো প্রলোভনের কাছে মাথা নত করেননি, স্বাধীনতার প্রশ্নে আপস করেননি। স্বাধীনতার পরপরই তিনি জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন এবং সংবাদ পুনঃপ্রকাশ করেন। এক্ষেত্রে আদর্শ ও আপসহীন মনোভাব তাঁকে উজ্জীবিত করেছে।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক

যুদ্ধদিনের অকুতোভয় বন্ধুর চিরবিদায়

দুলাল আচার্য

দীর্ঘ ৫৮ বছরের সাংবাদিক-জীবন তার। সংবাদপত্র ও টেলিভিশনে সাংবাদিক হিসাবে কাজ করেছেন ১৮ বছর বয়স থেকে। সাংবাদিক-জীবনে প্রত্যক্ষ করেছেন ২২টি দেশের যুদ্ধ, অভ্যুত্থান ও বিপ্লব। তার পরিচয় আন্তর্জাতিক সংবাদদাতা, টেলিভিশন উপস্থাপক এবং প্রতিবেদন নির্মাতাসহ বহু পরিচয়ে। তিনি বিশ্বখ্যাত সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের বৈদেশিক প্রতিনিধি হিসাবে বিশ্বের বহুদেশের গুরুত্বপূর্ণ খবর পরিবেশনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বিশ্বখ্যাত সাংবাদিক সায়মন জন ড্রিং। সাংবাদিক পরিচয়ের চেয়েও এ দেশের মানুষের কাছে তার বড়ো পরিচয় তিনি আমাদের আপনজন। আমাদের গর্বের ইতিহাস মহান মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে আছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন নানা দেশের অসংখ্য সহমর্মী মানুষ। যুদ্ধের মাঠে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, শরণার্থীশিবিরে, প্রতিবাদে বা জনমত গঠনে কঠিন সেই সময়ে তারা রেখেছেন স্বীয় ভূমিকা। তাদেরই একজন সায়মন ড্রিং। ২০২১ সালের ২০ জুলাই ৭৬ বছর বয়সে রোমানিয়ায় না-ফেরার দেশে চলে যান তিনি। এ সময় তিনি স্ত্রী ফিয়োনার কর্মস্থলে ছিলেন। বাংলাদেশের অকুতোভয় ও অকৃত্রিম বন্ধু সায়মন ড্রিংয়ের চিরবিদায়ে আমরা ব্যথিত ও শোকার্ত।

সায়মন ড্রিং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী প্রথম বিদেশি সাংবাদিক, যিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে সরেজমিন প্রতিবেদন তৈরি করেন। তার প্রতিবেদনে পাকিস্তানি বাহিনীর লোমহর্ষক নির্যাতন ও গণহত্যার কথা বিশ্ববাসীর কাছে উঠে আসে। একাত্তরে 'দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এর রিপোর্টার হিসাবে কম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেনে কাজ করতেন। সেসময় লন্ডনের সদর দপ্তর থেকে ফোন করে তাকে বলা হলো, 'পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত। সেখানে বড়ো কিছু ঘটতে যাচ্ছে, তুমি ঢাকা যাও।' সেসময় সাংবাদিকতা করছিলেন যুদ্ধবিধ্বস্ত লাওস, কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামে। কিন্তু পাকিস্তান বা পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে তার তেমন কোনো ধারণা ছিল না। তখন বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের উত্তাল নগরী ঢাকা। ৬ মার্চ কম্বোডিয়া থেকে ঢাকায় চলে আসেন সায়মন। উঠেছিলেন ঢাকার শাহবাগে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে। অবশ্য ১৯৬৮ সালে তিনি প্রথম ঢাকায় এসেছিলেন। এই সফর সাংবাদিকতাসংশ্লিষ্ট ছিল কি না প্রকাশ পায়নি। দ্বিতীয় দফায় ঢাকায় আসার পরদিনই বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ সরাসরি শোনার সুযোগ হয় তার। রেসকোর্স ময়দানে মঞ্চের খুব কাছে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর পুরো ভাষণ শুনেছিলেন তিনি। এরপর ঢাকায় বিভিন্ন কাজ করছিলেন। এভাবেই পার হয়ে যায় দুই সপ্তাহ। তারপর ভয়াল পঁচিশে মার্চ।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি বাহিনীর বাঙালি নিধনযজ্ঞ শুরুর আগেই ঢাকায় অবস্থানরত সব বিদেশি সাংবাদিককে হোটেলে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। সেনা কর্তৃপক্ষ তাদের বলে, শহরের পরিস্থিতি খুব খারাপ, নিরাপত্তার স্বার্থে তাদের হোটেলের ভেতরেই অবস্থান করতে হবে। পরদিন সকালে তাদের বিমানবন্দরে নিয়ে তুলে দেওয়া হয় বিমানে। কিন্তু সায়মন ড্রিংকে তারা খুঁজে পায়নি। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বাঙালি কর্মচারীর সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলে হোটেলেই লুকিয়ে পড়েন সায়মন। পরে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, প্রায় ৩২ ঘণ্টা হোটেলের লবি, ছাদ, বার এবং কিচেনে কাটান। ২৭ মার্চ কারফিউ উঠে গেলে বাঙালি হোটেলবয়ের সাহায্যে প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলে (বর্তমানে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) যান তিনি। সেখানে এক বিভীষিকাময় অধ্যায়ের মুখোমুখি হন। ছাত্রদের মরদেহ পুড়ছিল, অনেক মরদেহ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। চারুকলা গিয়ে জানতে পারেন, সেখানেও হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছে। পুরান ঢাকাসহ আশপাশের এলাকাগুলো ঘুরে চিত্র এবং তথ্য জোগাড় করতে থাকেন। রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে গিয়ে দেখেন পাকিস্তানি সেনারা পতাকা উড়িয়ে রেখেছে এবং শত শত মরদেহ ট্রাকে তুলে নিচ্ছে। সব তথ্য সংগ্রহ করে একদিন পর ব্রিটিশ হাইকমিশনের সহায়তায় ঢাকা ছাড়েন সায়মন। অবশ্য তাকে এয়ারপোর্টে নাজেহাল করা হয়। পুরো তল্লাশি করে চেক করা হয় সঙ্গে কী নিয়ে যাচ্ছেন! তার ক্যামেরা নিয়ে যেতে দেওয়া হয়নি। পায়ের মোজায় কাগজ লুকিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু ধরা পড়ে যান। প্রথমে তাকে পাকিস্তানের করাচিতে পাঠানোর চিন্তা করা হয়েছিল। কিন্তু অনুরোধ করে এবং শর্ত সাপেক্ষে ব্যাংকক চলে যাওয়ার অনুমতি পান। ব্যাংকক থেকে ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় প্রতিবেদন পাঠান 'ট্যাংকস ক্র্যাশ রিভোল্ট ইন পাকিস্তান' শিরোনামে। ৩০ মার্চ তা প্রকাশিত হয়। ওই প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেন:

'আল্লাহর নামে আর অখণ্ড পাকিস্তান রক্ষার অজুহাতে ঢাকা আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত ও সন্ত্রস্ত এক নগর। ...সৈন্যরা ব্রিটিশ কাউন্সিল-লাইব্রেরি দখল করে। সেখান থেকে পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোয় গোলাবর্ষণের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে। মর্টার ফায়ার ও কামান ফায়ারে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা প্রকম্পিত হতে থাকে। আমরা তখন হোটেলেই অবরুদ্ধ ছিলাম। বুঝতে পারছিলাম বাইরে কী হচ্ছে। বুঝলাম মানুষ মারা পড়ছে...পাকিস্তান আর্মি গুলির মাধ্যমে যেন সবাইকে বুঝিয়ে দিতে চাচ্ছে, এটা পাকিস্তান। এখানে অন্য কোনো সত্তার অস্তিত্ব নেই।

...সকাল ৭টার ৫-৬ মিনিট পর মিশেলকে নিয়ে অত্যন্ত সাধারণ কাপড়ে বের হলাম। আমরা প্রথমেই গেলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলে (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল)। এটাই ছিল আর্মিদের প্রথম টার্গেট। দেখলাম দুইদিন পরও পুড়িয়ে দেওয়া কক্ষগুলোয় ছাত্রদের মৃতদেহ একটু একটু করে পুড়ছিল। অনেক মৃতদেহ বাইরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল, অবশ্য হলের পার্শ্ববর্তী পুকুরেই বেশির ভাগ মৃতদেহ ভেসে ছিল। চারুকলার একজন ছাত্রের মৃতদেহ পড়ে ছিল, তার ইজেলের পাশেই হাত-পা ছড়িয়ে। সাতজন শিক্ষক নিহত হন। বাইরের ঘরে লুকিয়ে থাকা ১২ সদস্যের এক পরিবারের সবাইকেই হত্যা করা হয়েছে। সৈনিকরা অনেক মৃতদেহ সরিয়ে ফেলেছে। ইকবাল হলে এখনো ৩০টি মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। এ হলের করিডরে যে পরিমাণ রক্ত জমাট বেঁধে আছে, তা নিশ্চিতভাবে এই ৩০ জনের চেয়ে অনেক বেশি মৃতদেহের রক্ত। অন্য একটি হলে মৃতদেহগুলো দ্রুত গণকবর খুঁড়ে পুঁতে রেখে এর ওপর ট্যাংক চালিয়ে মাটি সমান করে দেওয়া হয়েছে। আশপাশে বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশের রেললাইনের ২০০ গজজুড়ে গড়ে ওঠা কুঁড়েঘরগুলো ধ্বংস করা হয়েছে। টহলদার সেনাবাহিনী এখানকার একটা বাজার ধ্বংস করেছে এবং এর ঘুমন্ত দোকানদারদেরও হত্যা করেছে। দুইদিন পর যখন রাস্তায় বেরিয়ে এসব

দেখার সুযোগ ঘটল, তখনও অনেক মানুষের মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে, তাদের পরনের কাপড় গলার কাছে উঠে এসেছে।

দেখলাম ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে বাজুকা হামলার চিহ্ন। মসজিদটি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত। এরপর রাজারবাগ পুলিশ লাইনসের দিকে যাওয়া শুরু করলাম। যাওয়ার সময় দেখলাম সব বাড়িতে পাকিস্তানের পতাকা উড়ছে। রাস্তায় রাস্তায় অনেক লাশ। আর মানুষ ঘুরে ঘুরে এগুলো দেখছে। তখনও পাকিস্তান আর্মির অনেক গাড়ি টহল দিচ্ছে। রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে গিয়ে দেখলাম একস্থানে অভিযান শেষ করে সেনারা যতগুলো পারা যায় মৃতদেহ ট্রাকে করে নিয়ে গেছে। তারপরও পুরো এলাকায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ও যত্রতত্র লাশ পড়ে আছে। ...পরে গেলাম পুরান ঢাকার হিন্দু এলাকায়। সেখানে শুনেছি, সৈন্যরা অধিবাসীদের প্রথমে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াতে বলে। তারপর তাদের দলবদ্ধভাবে গুলি করে হত্যা করে। বাড়িগুলোও এরপর ধ্বংস করা হয়। সৈন্যরা বাঙালি ইনফরমারদের সঙ্গে নিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ ও হত্যাকাণ্ড চালাতে শুক্রবার প্রায় রাত ১১টা পর্যন্ত পুরান ঢাকায় অবস্থান করে। সৈন্যরা সংকেত দিলেই বাঙালি ইনফরমাররা আওয়ামী লীগের গোঁড়া সমর্থকদের বাড়ি চিনিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটি ধ্বংস করা হয় ট্যাংক চালিয়ে, রিকয়েলস রাইফেলের গুলিতে কিংবা এক ক্যান পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে।

নয়াবাজার এলাকার একজন অধিবাসী জানালেন, হঠাৎ করেই রাস্তার মাথায় সৈন্যদের গাড়ি দেখা গেল। অতঃপর প্রতিটি বাড়ি তাক করে গুলি করতে করতে তারা এগিয়ে এলো। অগ্রবর্তী বাহিনীর পেছনে ক্যানভর্তি পেট্রোল নিয়ে আরেকটি দল আসছিল। যারা পালাতে চেষ্টা করল তাদের গুলি করা হলো। আর যারা গৃহাভ্যন্তরে থেকে গেল, তারা জীবন্ত পুড়ে কয়লা হয়ে গেল। আমরা সব মিলিয়ে ধারণা করলাম, ১২টা থেকে ২টার মধ্যে সেখানে ৭০০ নারী-পুরুষ-শিশু নিহত হলো।'

ঢাকায় দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর চালানো প্রথম দফার গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের প্রত্যক্ষ চিত্র উঠে আসে ওই প্রতিবেদনে। এটাই ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত বহির্বিশ্বে প্রচারিত প্রথম সংবাদ। খবরটি প্রকাশের পর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিশ্ববাসী সজাগ হয়। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জনমত সৃষ্টিতে সহায়ক হয়। এরপরই পাকিস্তানকে চাপ দিতে শুরু করে আন্তর্জাতিক মহল।

তারপর বাংলাদেশকে নিয়ে সারা বিশ্বে তাঁর সাংবাদিকতা মিশন। নভেম্বরে তিনি কলকাতা ফিরে আসেন। সেখান থেকেই মুক্তিযুদ্ধের খবর সংগ্রহ করে পাঠাতেন লন্ডনের টেলিগ্রাফ পত্রিকায়। ১৬ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনীর সঙ্গে ট্যাংকে চড়ে ময়মনসিংহ হয়ে তিনি পুনরায় প্রবেশ করেন স্বাধীন বাংলাদেশে। যে কারণে মুক্তিযুদ্ধের শুরু এবং শেষ অর্থাৎ বাঙালির বিজয়ের দিনের সাক্ষীও তিনি। তিনিই ছিলেন বাংলাদেশে চালানো পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যাযজ্ঞের প্রথম বিদেশি প্রত্যক্ষদর্শী। একাত্তরে যুদ্ধে নির্মমতার খবর সংগ্রহ করে বিশ্ববাসীকে জানানোর যে দায়িত্ব তিনি কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, সেটা শুধু তার পেশাগত দায়িত্ব পালনই ছিল না–এ দেশের মাটি, মানুষকে তিনি ভালোবেসেছিলেন। স্বাধীন দেশে এর নজিরও তিনি স্থাপন করেছেন। তার সেসময়ের উদ্যোগ বাঙালির পক্ষে বিশ্বে জনমত গঠন করতে এবং পাকিস্তানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুলতে ভূমিকা রেখেছে। এজন্য পাকিস্তানিদের রোষানলেও তিনি পড়েছেন। কিন্তু কর্তব্যে ত্রুটি রাখেননি বরং অবিচল থেকেছেন। সাংবাদিকতায় ছিল তার এমনই নিষ্ঠা। যে কারণে মৃত্যুকেও পরোয়া করেননি তিনি।

গত শতকের শেষদিকে বাংলাদেশে একুশে টেলিভিশনের প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা ছিল তার। এ দেশের টেলিভিশন সাংবাদিকতায় নতুন এক যুগের সূচনাকারী ছিলেন এই সাংবাদিক। বলা হয়, একুশে টেলিভিশন ও সায়মন ড্রিং ছিলেন একে অপরের পরিপূরক। একুশে টিভির প্রতিষ্ঠাকালীন যারা নেপথ্যে কাজ করেছিলেন তাদের অনেককেই আমরা চিনতাম। এদের সঙ্গে সায়মন ড্রিং প্রায়ই ধানমন্ডির সাপ্তাহিক বিচিত্রা অফিসে আসতেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ রেহানা প্রকাশিত ও সম্পাদিত 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা'য় আমি তখন সহ-সম্পাদক। সে কারণে সায়মন ড্রিংয়ের সান্নিধ্য আমরাও পেয়েছিলাম। প্রায়ই বেবী আপা (সাংবাদিক বেবী মওদুদ)-সহ অন্যদের সঙ্গে আড্ডা দিতেন। সব সময় তার হাসিমাখা মুখখানির ছায়া আমাদের সামনে ভেসে উঠত। তার জীবনধারণ ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে। বিচিত্রা অফিসের গেটে ঢুকেই বলতেন 'হাই'। যাওয়ার বেলায় মৃদু হাসতে হাসতে বের হয়ে যেতেন। আমার এই কথাগুলো বলার অর্থ–তিনি কেবল বাংলাদেশের বন্ধুই নন, একজন বাঙালির অবয়বও তার মধ্যে খুঁজে পেতাম। বাংলাদেশের প্রগতিমনা বহু সিনিয়র সাংবাদিকের ঘনিষ্ঠজন ছিলেন সায়মন ড্রিং। বাংলাদেশের টেলিভিশন সাংবাদিকতার আধুনিকায়নে তার অবদান অনস্বীকার্য। আজকের টিভি সাংবাদিকতার আলোচিতদের অনেকেরই হাতেখড়ি তার হাত ধরে। যদিও এ দেশ থেকে সায়মন ড্রিংয়ের সেসময়ের চলে যাওয়াটা সম্মানজনক হয়নি। সময়টা ২০০১ সালের শেষদিকে। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর একুশে টিভি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ২০০২ সালের অক্টোবরে সরকার সায়মন ড্রিংয়ের ভিসা ও ওয়ার্ক পারমিট বাতিল করে তাকে অবিলম্বে বাংলাদেশ ত্যাগের নির্দেশ দেয়। বলা যায়, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে ইতি ঘটে টেলিভিশন শিল্পের এগিয়ে যাওয়ার অগ্রযাত্রা। এর দায় তৎকালীন বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের। সেই লজ্জা পুরো জাতির।

প্রকৃত বন্ধুর বৈশিষ্ট্য হলো বন্ধুর দুঃসময়ে এগিয়ে আসা। এই ভূমিকায় সায়মন ড্রিংকে আমরা সব সময় দেখেছি। সায়মন ড্রিং কেবল বাংলাদেশের বন্ধু ছিলেন না, পৃথিবীর বিপদগ্রস্ত সব মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলের জনগণকে সহায়তার জন্য তিনি একটি দাতব্য তহবিলের ধারণা তুলে ধরেন। এই তহবিল সৃষ্টি ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা; যেখানে ১২০টি দেশের ২০ মিলিয়ন মানুষ একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। ১৯৮৬ সালে তিনি দুটি দাতব্য তহবিল গড়েন। এই তহবিলে বহুদেশের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। মানুষের জন্য সায়মন ড্রিং এভাবেই কাজ করে গেছেন। সাংবাদিকতার দায় শোধেই কর্তব্য শেষ করেননি। তিনি করতে চেয়েছেন আরও বেশি কিছু। আর এখানেই তিনি হয়ে উঠেছেন অনন্য।

আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি ঢাকা ফিরে আসার পর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সায়মন ড্রিং। পরের দিন ১১ জানুয়ারি সায়মনের জন্মদিন হওয়ায় বঙ্গবন্ধু কেক কেটে জন্মদিন উদ্‌যাপন করেছিলেন। উল্লেখ্য, সায়মন ড্রিং ইংল্যান্ডে ১৯৪৫ সালের ১১ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি থাইল্যান্ডের ব্যাংকক ওয়ার্ল্ড সংবাদপত্রে সম্পাদনা সহকারী হিসাবে কাজে যোগ দেন। এরপর নিউইয়র্ক টাইমস ও রয়টার্সের মতো খ্যাতনামা গণমাধ্যমে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে তিনি ডেইলি টেলিগ্রাফ ও বিবিসি টেলিভিশন নিউজের বৈদেশিক সংবাদদাতা হিসাবে কাজ করেছেন। এর পরের ইতিহাস সংবাদপত্রের অভিভাবকের। সাংবাদিকতা-জীবনের সাফল্যের স্বীকৃতি হিসাবে বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ইন্টারন্যাশনাল রিপোর্টার অব দ্য ইয়ার ১৯৭১। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের বন্ধু হিসাবে ২০১২ সালে সায়মন ড্রিংকে সম্মাননা দেয় সরকার। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সায়মন ড্রিংয়ের সাহসী ভূমিকার প্রতি কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশের জন্মলগ্নে যে অবদান রেখেছেন, তা ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তাঁর আত্মার সদগতি কামনা করছি।

লেখক: সহকারী সম্পাদক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

সংবাদপত্রের টিকে থাকা না থাকা

জাফর ওয়াজেদ

বদলে যাচ্ছে বিশ্ব। জগৎজুড়ে পরিবর্তনের ছোঁয়া। নতুন কলাকৌশলে পালটে যাচ্ছে সংবাদজগৎ তথা গণমাধ্যম। সত্য-অসত্যের ব্যাপকতাও সেই সঙ্গে বিস্তৃত হচ্ছে। অবাধ তথ্যপ্রবাহের সঙ্গে 'প্রোপাগান্ডা' বা প্রচারণারও প্রসার ঘটছে। সংবাদপত্র তথা গণমাধ্যমব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক প্রচারণারও ঘটেছে বিকাশ। এটা তো বাস্তব যে একুশ শতকে গণমাধ্যমই হয়ে উঠেছে প্রচারণার সবচেয়ে সহজ ও শক্তিশালী মাধ্যম। মিথ্যা, বানোয়াট বা কুরুচিপূর্ণ কোনো বক্তব্য প্রচার বা প্রকাশ করে জনগণের মতামত বা বিশ্বাসকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার অপকৌশলই প্রোপাগান্ডা। যার সঙ্গে গণমাধ্যমের রয়েছে এক গভীর সম্পর্ক। গণমাধ্যমের পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমগুলোও গড়ে উঠেছে সত্য-মিথ্যার বেসাতি হিসাবে। তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ ও বিস্তারের কালে সংবাদপত্র অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে এখন তুমুল লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। মুদ্রণমাধ্যমকে অনেক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বিশ্লেষকরা বিষয়টিকে দেখছেন এভাবে–নতুন প্রযুক্তি, বার্তা মঞ্চ আর এসবের পেছনে অপর্যাপ্ত বিনিয়োগে বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যমে এখন চলছে প্রচণ্ড এক অস্থিরতা। প্রতিনিয়তই ভাঙচুর হচ্ছে এর আদল। বদলে যাচ্ছে এর ভাষা আর ব্যবহার। কারও মতে, গণমাধ্যমের দুনিয়া এতই দ্রুত বদলে যাচ্ছে যে বুলেট ট্রেন থেকে দেখা বাইরের দৃশ্যপটের মতো অস্পষ্ট মনে হচ্ছে সব। এমনটাও বলছেন গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা যে আগামী এক-দেড় দশকের মধ্যে বোধকরি গণমাধ্যমের স্থিত একটি অবয়ব ফিরে তাকিয়ে বোঝা যাবে। অবশ্য ততদিনে গণমাধ্যমের চেহারা নিশ্চিতই হয়ে যাবে অনেক আলাদা।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যে জোয়ার শুরু হচ্ছে, তাতে অন্যতর রূপ ধারণ করতে পারে সংবাদপত্রসহ গণমাধ্যম। সে নিয়ে এখন থেকেই প্রস্তুতি নেওয়াটা জরুরি হয়ে পড়েছে। বর্তমান সময়ে নতুন নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হতে হচ্ছে যেমন, একই সঙ্গে নতুন নতুন প্রাযুক্তিক দক্ষতা শিখতে হচ্ছে। দেড় দশকে অনেক রূপান্তর ঘটেছে। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রযুক্তির দক্ষতা শিখতে হচ্ছে। কিন্তু প্রযুক্তিবদলের গতি আরও অনেক দ্রুত। আজ যা শেখা হচ্ছে, আগামীকাল তা হয়ে যাচ্ছে সেকেলে। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য মার্ক বেনিওফ মনে করেন, আমরা যেভাবে বেঁচে আছি, কাজ করছি আর একে-অপরের সঙ্গে

যুক্ত আছি, সেই বিষয়গুলোই বদলে যাচ্ছে। উৎকর্ষের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি। প্রযুক্তির যে রূপের সঙ্গে সূক্ষ্ম ও স্পষ্টভাবে মানুষের পরিচয় বদলে যাচ্ছে, তাও। তিনি মনে করেন, আগামী দশকগুলোয় প্রযুক্তিচালিত চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বিশ্বের অর্থনীতি, মানব সম্প্রদায় আর তাদের মানবিক পরিচিতির পুরো কাঠামোকে রূপায়িত ও রূপান্তরিত করবে নতুনভাবে। এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জিন প্রকৌশল ও অন্যান্য প্রযুক্তি মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। তাই এমন পদ্ধতির বা উপায় আমাদের তৈরি করতে হবে, যা ঝুঁকি কমায় এবং একই সঙ্গে মানবিক অবস্থার উত্তরণ ঘটায়। এই ক্ষেত্রে গণমাধ্যমেরও রূপান্তর ঘটবে বলে আশা করা যায়।

ডিজিটাল প্রযুক্তি সংবাদপত্র তথা গণমাধ্যমের স্বরূপ পালটে দিচ্ছে ক্রমান্বয়ে। ডিজিটাল তথ্যপ্রযুক্তির যত বিকাশ ও বিস্তার ঘটছে, ছাপামাধ্যম তথা সংবাদপত্রের পরিধিও সংকুচিত হওয়ার ক্ষেত্র হচ্ছে প্রসারিত। ছাপামাধ্যম তথা সংবাদপত্রমাধ্যমের অস্তিত্ব বা টিকে থাকা নিয়ে সংশয়-উদ্‌বেগ এখনো রয়েছে। ইলেকট্রনিকমাধ্যমের তথা টেলিভিশনের ক্রমপ্রসারে ছাপামাধ্যমের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা এখনো বিরাজমান। আবার টিভিমাধ্যমও অন্যান্য মাধ্যম তথা কেবল টিভি, আইপি টিভি হয়ে ইউটিউব ইত্যাকার মাধ্যমগুলোর আত্মপ্রকাশের কারণে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকতে পারছে না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সমাজে ব্যাপক প্রভাব রাখছে। তাই সব মাধ্যমকে এখন ফেসবুক, টুইটার প্রভৃতির মাধ্যমে পাঠক, দর্শক, পরিদর্শকদের সঙ্গে সংযোগ সাধন করতে হচ্ছে। ডিজিটাল দেশ গঠনে কম্পিউটার প্রযুক্তি ও ইন্টারনেটের কল্যাণে দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে 'ইনফরমেশন হাইওয়ে'তে প্রবেশের ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন জননন্দিত সরকার অগ্রণী ভূমিকা রেখে আসছে।

২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, 'ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতা নিশ্চিত করা, সর্বত্র স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা, উন্নত চিকিৎসা ও শিক্ষা নিশ্চিত করা, ক্ষুধামুক্ত দেশ গড়ে তোলা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা পেতে জনগণকে সচেতন করা এবং সর্বোপরি সরকরি ও বেসরকারি সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া।' প্রধানমন্ত্রী, যিনি এই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন, তিনি গণমাধ্যমকেও ডিজিটালাইজেশনের আওতায় নিয়ে আসতে বদ্ধপরিকর। আর এটা তো বাস্তব–জনগণকে সচেতন করা শুধু নয়, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলায় গণমাধ্যম খুবই সক্রিয়।

সংবাদপত্রগুলোর প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ঘটছে প্রতিনিয়ত। সংবাদপত্র তথা গণমাধ্যমের চারটি প্রধান কাজ রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে–তথ্য প্রদান, শিক্ষা দেওয়া, প্রভাবিত করা এবং বিনোদন দেওয়া। বলা যায়, এমনকি নানা অজানা রহস্য উন্মোচন করে জনগণকে তথ্যসমৃদ্ধ করা। সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে সঠিক পথ দেখানোরও দায়িত্ব পালন করে আসছে গণমাধ্যম। বার্তার মাধ্যমে ভোক্তাকে প্রভাবিত করার পাশাপাশি গণমাধ্যমের কাজও কিন্তু বিনোদন প্রদান। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে বেড়ে চলেছে সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিকমাধ্যমের সংখ্যা। মিডিয়া জগতের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে বলা যায়। সারা দেশ থেকে ৫ শতাধিক দৈনিক পত্রিকা বের হয়। এর বাইরে রয়েছে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, সংবাদপত্র ও সাময়িকী। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ হিসাবে ২ হাজার ১৭৫টি সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশের উল্লেখ রয়েছে। এসবই যে পাঠকপ্রিয়তা পায় বা পেয়েছে, এমন নয়। অনেক দৈনিকের 'সার্কুলেশন' নামমাত্র। কোনোটার একেবারেই নেই। পাঠকবিহীন এসব সংবাদপত্র প্রকাশনার নিশ্চয় অন্তর্নিহিত তাৎপর্য রয়েছে।

অতিমারি তথা কোভিড-১৯-এর ধকলে সংবাদপত্রও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেই সঙ্গে সাংবাদিকও। অনেকেই কর্মরত অবস্থায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। অপপ্রচার ছড়ানো হয়েছিল যে সংবাদপত্রের মাধ্যমে করোনাভাইরাস ছড়ায়। এরপরই পাঠক হ্রাস পেতে থাকে। বাসাবাড়িতে সংবাদপত্র সরবরাহও বন্ধ হয়ে যায়। পাঠক স্মার্টফোনের কল্যাণে অনলাইনে খবরের কাগজের স্বাদ মেটাচ্ছে অদ্যাবধি। প্রিন্টমাধ্যমের চেয়ে পত্রিকার অনলাইনমাধ্যমে পাঠক বেশি। এটা বর্তমানে অনস্বীকার্য যে ডিজিটাল প্রযুক্তির আবির্ভাব, বিশেষত ইন্টারনেট ও ওয়েবের আবিষ্কার সাংবাদিকতার জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। এরই মধ্যে বদলে গেছে সাংবাদিকতার ধরন ও আঙ্গিক। নানা বৈচিত্র্যে মুহূর্তের মধ্যেই ঘটনার ছবিসহ পাঠকের সামনে দৃশ্যায়িত হচ্ছে। বড়ো ঘটনার সরাসরি সম্প্রচার শুরু হয়ে যায় নিমিষেই। ২৪ ঘণ্টার সংবাদভিত্তিক চ্যানেলও প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে দ্রুতগতিতে সচিত্র সংবাদ প্রচার করছে।

শুধু গণমাধ্যমই নয়, আরও রয়েছে–ব্যক্তিগত ব্লক, ওয়েবসাইট, সামাজিক মাধ্যম ফেসবুক, টুইটার প্রভৃতি তুলে ধরছে অনেক সংবাদ প্রতিবেদন উপাদানসহ। অনেকটা আবার প্রথাগত গণমাধ্যমগুলোরও আগে। মূলধারার গণমাধ্যমে যা উঠে আসে না, তাও উঠে আসছে এসব সামাজিক মাধ্যমে। তবে এসব মাধ্যম যেহেতু অসম্পাদিত, তাই তাতে সঠিক বা বস্তুনিষ্ঠ তথ্য যে প্রচারিত হচ্ছে তা নয়। অনেক সময় গুজব এবং মিথ্যাচারও সুনিপুণভাবে উপস্থাপন করা হয়, যা পাঠক অনেক ক্ষেত্রেই বিশ্বাস করেন। এ ধরনের গুজবে সমাজে অনেক হানাহানি, সংঘর্ষ, হতাহতের ঘটনাও ঘটছে। ১৯৯৬ সালের ৬ জুন বাংলাদেশ অনলাইন ইন্টারনেটের যুগে প্রবেশ করে। শুরু থেকে দু-একটি পত্রিকা অনলাইন ভার্সনে যাত্রা শুরু করে। এখন দেশে কতগুলো অনলাইন নিউজ পোর্টাল রয়েছে, এর সঠিক হিসাব খুঁজে পাওয়া কঠিন। শুধু ঢাকা নয়, জেলা-উপজেলা পর্যায়েও প্রকাশিত হচ্ছে এসব অনলাইন। প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সমাজ বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় ব্যক্তি ও সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে গণমাধ্যম। এই মাধ্যম নানাভাবে ব্যক্তি তথা সমাজকে প্রভাবিত করছে।

সাংবাদিকতা আর গণমাধ্যম–দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সংবাদপত্রকে বানানো হয়েছে গণমাধ্যম শিল্প। বলা হয় 'সাংবাদিকতা' শব্দে পেশাগত মর্যাদার একটি বিষয় রয়েছে। কিন্তু 'গণমাধ্যমকর্মী' শব্দে তা নেই। বর্তমানে সংবাদপত্র বা গণমাধ্যমশিল্পে বহু পক্ষের আবির্ভাব ঘটেছে। মালিক, সম্পাদক, প্রকাশকদের অনেক দল, অনেক গ্রুপ। সংবাদপত্রশিল্প বর্তমানে একটি লাভজনক ব্যবসায় খাত। তাই সারা দেশে হাজার হাজার পত্রপত্রিকা, বেতার, টিভি, আইপি টিভি, অনলাইন নিউজ পোর্টাল। আবার সংবাদপত্রও অনলাইন পোর্টালের পাশাপাশি ভিজ্যুয়ালও হয়ে উঠেছে। সব মিলিয়ে একটি নতুন অবয়ব তৈরি হচ্ছে।

অন্যান্য শিল্পের মতো সংবাদপত্রও একটি শিল্প–এমনই মানুষ মনে করে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৪ সালে সংবাদপত্রকে শিল্প হিসাবে ঘোষণা করেন। সংবাদপত্র সেদিকেই ধাবিত হচ্ছিল। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ ও বিস্তার অনেক কিছুকেই বদলে দিয়েছে। ইলেকট্রনিকমাধ্যমের প্রসার শুধু নয়, একই সঙ্গে অনলাইনমাধ্যমে সংবাদ প্রচার সংবাদপত্রজগৎকে পিছু হটিয়ে দিতে সহায়ক হয়েছে। একই সঙ্গে করোনার প্রকোপে সংবাদপত্র হারিয়েছে তার পাঠক। সংবাদপত্র অবশ্য একটি সেবামূলক শিল্প খাত। করোনাকালে এই খাতের কর্মী-সাংবাদিকরা চিকিৎসক ও নার্সের পরই সম্মুখসারির যোদ্ধা

হিসাবে কাজ করেছেন। সংবাদপত্র মালিকদের সংগঠন নোয়াব বলছে, সংবাদপত্র এমন একটি সেবা, যা বিক্রীত মূল্যের চেয়ে উৎপাদন খরচ কয়েক গুণ বেশি। বিজ্ঞাপনের আয় দিয়ে উৎপাদন ব্যয়ের ঘাটতি পূরণ করে টিকে আছে। করোনা পরিস্থিতিতে পত্রিকাগুলোর বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন ব্যাপকভাবে কমেছে। পত্রিকা মালিকদের সংগঠন সংবাদপত্র মালিক সমিতি বাংলাদেশের (নোয়াব) সভাপতি এ কে আজাদ বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতির (এফবিসিসিআই) সঙ্গে গত জানুয়ারিতে এক মতবিনিময় সভায় বলেছেন, একটি পত্রিকা ছাপাতে ১৮ থেকে ২০ টাকা খরচ হয়, আর পাঠক তা ১০ টাকায় কেনেন। কিন্তু কমিশন দিয়ে আমরা হকারের কাছ থেকে পাই ৬ টাকা ৫০ পয়সা। তথাপি প্রচুর টাকা অনাদায়ি পড়ে থাকে। করোনাকালে দেশের বেশির ভাগ ছাপা সংবাদপত্রের বিক্রি কিছুটা কমেছে। সংবাদপত্র শিল্পের অন্যান্য উপকরণসহ নিউজপ্রিন্টের দাম বেড়েছে। এর ফলে আগামী বছরগুলোয় সংবাদপত্রের সংকট আরও গভীর হবে। সংবাদপত্রে বেতনভাতাসহ অন্যান্য খরচ বেড়েছে। নানা চাপে সংবাদপত্র রুগ্ণ শিল্পে পরিণত হয়ে যাচ্ছে।

সভ্যজগতে অপরিহার্য পণ্য সংবাদপত্র। বেতার, টিভি, ইন্টারনেটের ব্যাপক প্রসারের পরও গুরুত্বহীন হয়ে পড়েনি। সংবাদপত্রকে সরকার শিল্প হিসাবে ঘোষণা দিয়েছে। অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে শিল্প স্থাপনের যে নিয়ম বা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে তা নয়। দেশের কোনো সংবাদপত্রই ইনস্টিটিউশন হিসাবে দাঁড়াতে পারেনি। সংবাদপত্রের বিপণনব্যবস্থা অন্যান্য পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিপণনব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। সংবাদপত্রের মতো অন্য কোনো পণ্যকে এত নানা প্রতিযোগিতার মধ্যে টিকে থাকতে হয় না। জটিল উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই প্রতিদিন সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছে। এই কঠিন প্রতিযোগিতা মেনে নিয়েই পত্রিকা টিকে থাকছে। শুধু টিকে থাকা নয়, প্রায় প্রতিনিয়তই নতুন নতুন পত্রিকার জন্মও হচ্ছে। সংবাদপত্রের মালিকরা বলছেন, কাগজসহ অন্যান্য উপকরণের দাম বেড়ে যাওয়ায় দেশের সংবাদমাধ্যম এমনিতেই সমস্যায় ছিল। এর ওপর করোনাকালে দেশের অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাবও এই খাতে পড়েছে। পত্রিকা বিক্রি, বিজ্ঞাপন কমে যাওয়াসহ নানা সংকটের মধ্যে এই খাত রয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে দেশের সংবাদপত্রশিল্প সামনের দিনে আরও বড়ো সংকটে পড়বে।

দেশে সংবাদপত্রের বিপণন মূলত পরোক্ষ বণ্টনপ্রণালিতে হয়ে থাকে। মালিকের প্রত্যক্ষ বিপণনব্যবস্থা নেই। এই ক্ষেত্রটিতে গত পঞ্চাশ বছরে কোনো সংস্কার হয়নি। পত্রিকা বিক্রি না হলে মালিককে ফেরত নিতে হয়। যথাসময়ে বিতরণ না হলে পত্রিকা পাঠক হারায়। সংবাদপত্রের বাজার উন্নয়নমূলক কর্মক্ষেত্রে গতি আনা প্রয়োজন।

অর্থনীতি বিষয়ে যারা সাংবাদিকতা করেন, তারা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন–সংবাদপত্র উৎপাদন ও বিপণন ক্ষেত্রে সংস্কার আনা হলে আর্থিক সাশ্রয় হয় কি না। সংবাদপত্রের বাজার উন্নয়নে চিরাচরিত প্রথা ভেঙে বেরিয়ে আসা জরুরি। সংবাদপত্রের অর্থনৈতিক ভূগোলকে পরিচর্যা করা না গেলে শিল্পের আঙিনায় আর কখনো পৌঁছাতে পারবে না।

লেখক: একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক; মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

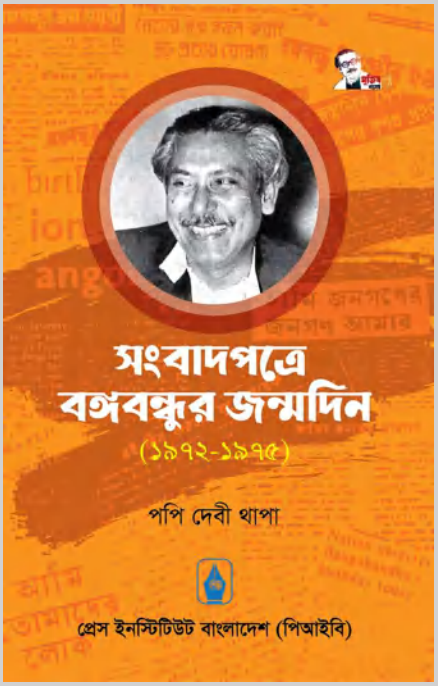

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে ডিআরইউ আয়োজিত নগদ-ডিআরইউ বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে অতিথিদের সঙ্গে পুরস্কারপ্রাপ্তরা

২২ সাংবাদিক পেলেন নগদ-ডিআরইউ সেরা প্রতিবেদন পুরস্কার

ছাপা পত্রিকা, অনলাইন ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ২২ সাংবাদিককে সেরা প্রতিবেদন পুরস্কার দিয়েছে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ)। ২৬ অক্টোবর রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

দেশের শীর্ষস্থানীয় সম্পাদক ও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকদের নিয়ে গঠিত ১০ সদস্যের জুরি বোর্ড ২২টি সেরা প্রতিবেদন নির্বাচন করেন। 'নগদ-ডিআরইউ বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড-২০২১' আয়োজনে সার্বিক সহায়তা দিয়েছে মোবাইল আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান নগদ।

অনুষ্ঠানে স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, গণমাধ্যমের দায়িত্বশীল ভূমিকা সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। নৈতিক ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারে।

নৈতিকতা মেনে সাংবাদিকতা করার ওপর জোর দিয়ে স্পিকার বলেন, গণমাধ্যম জনজীবনের এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ। এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে অনেক নাশকতার ঘটনা ঘটছে। সাংবাদিকদের সেসব থেকে জনগণকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার পরিচয় দিয়ে বিশ্বাসযোগ্য, নির্ভরযোগ্য এবং যথাযথ তথ্যভিত্তিক সংবাদ পরিবেশন করতে হবে। যে গণমাধ্যম জনগণের যত আস্থা অর্জন করতে পারবে, সেই গণমাধ্যম তত এগিয়ে যাবে।

ডিআরইউ সভাপতি মুরসালিন নোমানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদের রেকর্ড করা বক্তব্য শোনানো হয়।

সূত্র: ২৭ অক্টোবর ২০২১, সমকাল

জাতীয় প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত

ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে জাতীয় প্রেস ক্লাব আগামী দিনগুলোয়ও দেশপ্রেম, গণতন্ত্র ও মানবিক মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত থেকে বহুমাত্রিক সমাজ নির্মাণে ভূমিকা অব্যাহত রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ। মন্ত্রী ২২ অক্টোবর জাতীয় প্রেস ক্লাবের ৬৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ক্লাব প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে একথা বলেন। তিনি আরও বলেন, পূর্বসূরিরা যে স্বপ্নে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে এদেশ স্বাধীন করে গেছেন, সবাই মিলে দেশকে সেই স্বপ্নের ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়ার মধ্যেই কর্মের সার্থকতা নিহিত।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন ক্লাবের ভবিষ্যৎ পথনকশা বর্ণনা করেন। সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস খান, সহ-সভাপতি হাসান হাফিজ ও রেজওয়ানুল হক, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক মাইনুল আলম ও মো. আশরাফ আলী, কোষাধ্যক্ষ শাহেদ চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা কমিটি ও উপকমিটিগুলোর সদস্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র: ২৩ অক্টোবর ২০২১, প্রথম আলো

প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়ায় 'বঙ্গবন্ধু সংবাদকেন্দ্র'-এর উদ্‌বোধন

ভারতের নয়াদিল্লিতে প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়ায় বঙ্গবন্ধু সংবাদকেন্দ্রের উদ্‌বোধন করেছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে নয়াদিল্লির রাইসানা রোডের প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়ার দ্বিতীয়তলায় ৬ সেপ্টেম্বর এই কেন্দ্রের উদ্‌বোধন করেন ভারত সফররত তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী।

এ সময় তিনি বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দুই দেশের সম্পর্ক এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। এই সুসম্পর্ককে এগিয়ে নিতে দুই দেশের জনগণের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের জন্য আমাদের উদ্যোগ

নয়াদিল্লিতে প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়ায় বঙ্গবন্ধু মিডিয়া সেন্টার উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী হাছান মাহ্‌মুদের উপস্থিতিতে সমঝোতা স্মারকে সই করেন বাংলাদেশ হাইকমিশনের মিনিস্টার (প্রেস) শাবান মাহমুদ ও প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বিনয় কুমার

নিতে হবে। প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়ায় বঙ্গবন্ধু সংবাদকেন্দ্র নিঃসন্দেহে এক্ষেত্রে একটি মাইলফলক।

প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়ার সভাপতি উমাকান্ত লাখেরার সভাপতিত্বে ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মোহাম্মদ ইমরান, প্রেস মিনিস্টার শাবান মাহমুদ, বাংলাদেশের জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন, প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়ার সাবেক সভাপতি গৌতম লাহিড়ী এবং সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বিনয় কুমার অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন।

প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়া এবং নয়াদিল্লির বাংলাদেশ হাইকমিশনের যৌথ উদ্যোগে গড়ে তোলা আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি সংবলিত বঙ্গবন্ধু সংবাদকেন্দ্রে একটি গ্রন্থাগার এবং প্রজেকশন হল রয়েছে। কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণে দুই সংস্থার মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারকও স্বাক্ষরিত হয়।

সূত্র: ৭ সেপ্টেম্বর ২০২১, সমকাল

বিএফইউজের সভাপতি ওমর ফারুক মহাসচিব দীপ আজাদ

বিএফইউজে–বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনে

বাসসের উপপ্রধান বার্তা সম্পাদক ওমর ফারুক সভাপতি এবং নাগরিক টিভির হেড অব নিউজ দীপ আজাদ মহাসচিব নির্বাচিত হয়েছেন। কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন খায়রুজ্জামান কামাল। ২৩ অক্টোবর এই নির্বাচনে ভোটগ্রহণ করা হয়।

নির্বাচনে সহসভাপতি পদে মধুসূদন মন্ডল, যুগ্ম মহাসচিব পদে শেখ মামুনুর রশিদ, কোষাধ্যক্ষ খায়রুজ্জামান কামাল ও দপ্তর সম্পাদক পদে সেবীকা রানী নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাহী পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন উম্মুল ওয়ারা সুইটি, উৎপল কুমার সরকার, নূরে জান্নাত আখতার ও শেখ নাজমুল হক। বিভাগীয় পর্যায়েও সহসভাপতি, যুগ্ম মহাসচিবসহ একাধিক পদে নির্বাচন হয়।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ময়মনসিংহ, বগুড়া, রাজশাহী, খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া ও নারায়ণগঞ্জে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ভোটার ছিলেন ৩ হাজার ৯৮০ জন। নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শাহজাহান সরদার।

সূত্র: ২৪ অক্টোবর ২০২১, প্রথম আলো

ডিআরইউ সভাপতি মিঠু সাধারণ সম্পাদক হাসিব

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) নির্বাচনে সভাপতি পদে জার্মান বার্তা সংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধি নজরুল ইসলাম মিঠু ও সাধারণ সম্পাদক পদে বাংলাদেশ পোস্টের নুরুল ইসলাম হাসিব নির্বাচিত হয়েছেন।

৩০ নভেম্বর রাজধানীর সেগুনবাগিচার ডিআরইউ কার্যালয়ে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। দুট পদে একক প্রার্থী থাকায় তারা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

ভোটগ্রহণ শেষে সন্ধ্যায় ফল ঘোষণা করেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান দ্য ফিন্যান্সিয়াল হেরাল্ড সম্পাদক রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ। নির্বাচনে অন্যান্য সম্পাদকীয় পদে নির্বাচিতরা হলেন: সহসভাপতি পদে ওসমান গণি বাবুল, যুগ্মসম্পাদক শাহনাজ শারমীন, অর্থ সম্পাদক পদে এসএমএ কালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আব্দুল্লাহ আল কাফি, দপ্তর সম্পাদক পদে রফিক রাফি, নারীবিষয়ক সম্পাদক পদে তাপসী রাবেয়া আঁখি, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক কামাল উদ্দিন সুমন, ক্রীড়া সম্পাদক পদে মাকসুদা লিসা, সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে নাদিয়া শারমিন এবং কল্যাণ সম্পাদক পদে কামরুজ্জামান বাবলু।

কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য পদে নির্বাচিতরা হলেন: হাসান জাবেদ, মাহমুদুল হাসান, সোলায়মান সালমান, সুশান্ত কুমার সাহা, মো. আল আমিন ও এসকে রেজা পারভেজ, তানভীর আহমেদ ও মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ মেজবাহ। এছাড়া তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক পদে কামাল মোশারেফ এবং আপ্যায়ন সম্পাদক পদে মুহাম্মাদ আখতারুজ্জামান বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

সূত্র: ১ ডিসেম্বর ২০২১, সমকাল

ডিকাব সভাপতি লোটাস সাধারণ সম্পাদক মঈন

ডেইলি সানের নির্বাহী সম্পাদক রেজাউল করিম লোটাস ডিপ্লোম্যাটিক করেসপনডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশের (ডিকাব) ২০২২ সালের নির্বাহী কমিটির সভাপতি ও ইউএনবির

বিশেষ প্রতিনিধি একেএম মঈনুদ্দিন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। ৩০ ডিসেম্বর জাতীয় প্রেস ক্লাবে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ফরিদ হোসেন নির্বাচনের ফল ঘোষণা করেন।

অপর দুই নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন দৈনিক অবজারভারের বিজনেস এডিটর নিজামউদ্দিন আহমেদ ও মাছরাঙা টিভির হেড অব নিউজ রেজোয়ানুল হক রাজা।

সূত্র: ৩১ ডিসেম্বর ২০২১, কালের কণ্ঠ

ক্র্যাবের নতুন সভাপতি তমাল সম্পাদক বিকু

বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ক্র্যাব) কার্যনির্বাহী কমিটি-২০২২-এর নির্বাচনে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিনের বিশেষ প্রতিনিধি মির্জা মেহেদি তমাল। এছাড়া সহসভাপতি পদে জয়ী হয়েছেন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম। অন্যদিকে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন আসাদুজ্জামান বিকু। ৩০ ডিসেম্বর সেগুনবাগিচায় ক্র্যাব

কার্যালয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ভোটগ্রহণ হয়। নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন সিনিয়র সাংবাদিক পারভেজ খান। নির্বাচনে যুগ্মসম্পাদক পদে ইমরান হোসেন সুমন, সাংগঠনিক সম্পাদক আতাউর রহমান (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়), অর্থ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম মন্টু এবং প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে রুদ্র রাসেল জয়ী হয়েছেন। এছাড়া দপ্তর সম্পাদক পদে ইসমাইল হুসাইন ইমু, প্রশিক্ষণ ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক সাজ্জাদ মাহমুদ খান, ক্রীড়া সম্পাদক এসএম মিন্টু হোসেন, কল্যাণ সম্পাদক নাহিদ তন্ময় এবং আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে শাহীন আলম বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

সূত্র: ৩১ ডিসেম্বর ২০২১, কালের কণ্ঠ

সাংবাদিক আফতাব চৌধুরী নেলসন ম্যান্ডেলা স্মৃতি সম্মাননায় ভূষিত

বাংলাদেশ স্বাধীনতা পরিষদের উদ্যোগে সিলেটের বিশিষ্ট সাংবাদিক, কলামিস্ট ও পরিবেশকর্মী আফতাব চৌধুরীকে স্বচ্ছ সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'নেলসন ম্যান্ডেলা স্মৃতি সম্মাননা-২০২১'

দেওয়া হয়েছে। ১৩ আগস্ট ঢাকার তোপখানা রোডের হোটেল এশিয়ায় এক অনুষ্ঠানে তাঁকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য সাবেক মন্ত্রী অ্যাডভোকেট আবদুল মান্নান খান।

প্রধান আলোচক ছিলেন সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকু, সাপ্তাহিক দেশের ডাক পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক এটিএম মমতাজুল করিম। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্বাধীনতা পরিষদের সভাপতি জিন্নত আলী খান জিন্নাহ।

সূত্র: ১৮ আগস্ট ২০২১, সমকাল

সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের এমডি সুভাষ চন্দ বাদল

সাংবাদিক সুভাষ চন্দ বাদলকে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) হিসাবে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। দুই বছরের জন্য তাঁকে এ পদে নিয়োগ দিয়ে ২১ অক্টোবর আদেশ জারি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৪-এর ধারা ১০(২) অনুযায়ী তাঁকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সঙ্গে কর্মসম্পর্ক ত্যাগের শর্তে যোগদানের তারিখ থেকে পরবর্তী দুই বছর মেয়াদে নিয়োগ দেওয়া হলো।

বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী পদাধিকার বলে ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান। তথ্য ও সম্প্রচার সচিব পদাধিকার বলে ভাইস চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদাধিকার বলে সদস্য সচিব। দুস্থ ও অসচ্ছল সাংবাদিকদের কল্যাণসাধন, পেশাগত কাজ করতে অক্ষম ও অসমর্থ সাংবাদিকদের আর্থিক সাহায্য প্রদান, অসুস্থ সাংবাদিকদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা বা আর্থিক সাহায্য প্রদান এবং সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের জন্য বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করাসহ সাংবাদিকদের কল্যাণে নানা ধরনের কাজ করে থাকে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট।

সূত্র: ২২ অক্টোবর ২০২১, সমকাল

জনকণ্ঠ থেকে অব্যাহতি নিলেন তোয়াব খান

প্রখ্যাত প্রবীণ সাংবাদিক তোয়াব খান সম্প্রতি দৈনিক জনকণ্ঠের উপদেষ্টা সম্পাদকের পদ থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসংগ্রামী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেস সচিব ও দৈনিক বাংলার সম্পাদক তোয়াব খানের দক্ষ নেতৃত্বে 'জনকণ্ঠ'

একসময় সারা দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার তাঁকে দৈনিক বাংলা থেকে চাকরিচ্যুত করে। এরপর ১৯৯৩ সালে জনকণ্ঠের জন্মলগ্ন থেকে তিনি সেটির উপদেষ্টা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

একুশে পদকপ্রাপ্ত তোয়াব খানের সাংবাদিকতা জীবনের শুরু ১৯৫৫ সালে। ১৯৬১ সালে তিনি দৈনিক সংবাদের বার্তা সম্পাদক হন, ১৯৬৪ সালে যোগ দেন দৈনিক পাকিস্তানে। ১৯৭২ সালে তিনি 'দৈনিক বাংলা'র সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি প্রধান তথ্য কর্মকর্তা এবং প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের (পিআইবি) মহাপরিচালক ছিলেন।

সূত্র: ৪ অক্টোবর ২০২১, সমকাল

রেহানা মরিয়ম নূর কানে বিরল সম্মান পেল বাংলাদেশ

প্রায় আট হাজার কিলোমিটার দূরে ফ্রান্সের কানে বিশ্ব চলচ্চিত্রের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আসর। সেই কান চলচ্চিত্র উৎসবের মূল আসরে প্রথমবারের মতো প্রদর্শিত হলো বাংলাদেশের চলচ্চিত্র 'রেহানা মরিয়ম নূর'। প্রদর্শনী শেষ হতেই হলভর্তি আপ্লুত দর্শক-চলচ্চিত্রবোদ্ধা দাঁড়িয়ে তুমুল করতালির মাধ্যমে সম্মান জানান

চলচ্চিত্রের কলাকুশলীদের। এর মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রের বিশ্বমঞ্চে বিরল সম্মান পেল বাংলাদেশ।

৭ জুলাই বাংলাদেশ সময় বিকাল ৩টা ১৫ মিনিটে কান চলচ্চিত্র উৎসবের ৭৪তম আসরের আঁ সার্তে রিগা বিভাগের প্রথম প্রদর্শনীতে দেখানো হয় আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ সাদ নির্মিত ছবি 'রেহানা মরিয়ম নূর'। ছবিটি দেখতে আগে থেকেই বেশ লম্বা লাইন ছিল ডেবুসি হলের সামনে। ১ হাজার ৬৮ জন দর্শক পিনপতন নীরবতায় চলচ্চিত্রটি উপভোগ করেন।

সূত্র: ৮ জুলাই ২০২১, কালের কণ্ঠ

কলকাতা প্রেস ক্লাবে বঙ্গবন্ধু সংবাদকেন্দ্র উদ্‌বোধন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রীর

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ২৮ অক্টোবর কলকাতা প্রেস ক্লাবে বঙ্গবন্ধু সংবাদকেন্দ্র উদ্‌বোধন করেছেন। তথ্যমন্ত্রী তার বক্তৃতায় মুক্তিযুদ্ধকালে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সহায়তার জন্য ভারত সরকার ও ভারতের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ যে সময়ে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বাংলাদেশ-ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছরপূর্তি উদ্‌যাপন করছে, সেসময় বঙ্গবন্ধুর নামে কলকাতা প্রেস ক্লাবে সংবাদকেন্দ্র স্থাপন দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের আরেকটি মাইলফলক। ভারত সফররত তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ২৮ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় ঐতিহ্যবাহী প্রেস ক্লাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে প্রতিষ্ঠিত এই সংবাদকেন্দ্র উদ্‌বোধন করেন।

প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস সুর, সাধারণ সম্পাদক কিংশুক প্রামাণিক, বাংলাদেশের সংসদ সদস্য নাইমুম সরওয়ার কমল, কলকাতায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনার তৌফিক হাসান, উপদূতাবাসের প্রথম সচিব (প্রেস) রঞ্জন সেন ও প্রেস ক্লাবের সদস্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ এ সময় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের জনগণ ও সরকারের অকুণ্ঠ সহায়তা এবং হাজার হাজার ভারতীয় সেনা সদস্যের প্রাণদানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের খবর সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে কলকাতা প্রেস ক্লাব যে বিশাল ভূমিকা রেখেছে, তা ভোলার নয়। কলকাতায় বাংলাদেশ উপদূতাবাসের সহায়তায় স্থাপিত এই সংবাদকেন্দ্রে কম্পিউটার, প্রদর্শনী হল, লাইব্রেরি, প্রজেক্টরসহ আধুনিক ডিজিটাল সুবিধাদি রয়েছে।

সূত্র: ২৯ অক্টোবর ২০২১, দৈনিক ইত্তেফাক

ব্র্যাক মাইগ্রেশন মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড পেলেন ১৭ সাংবাদিক

অভিবাসনবিষয়ক সাংবাদিকতায় অবদান রাখায় ব্র্যাক মাইগ্রেশন মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন ১৭ জন সাংবাদিক। ৩০ ডিসেম্বর ব্র্যাক সেন্টারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী ইমরান আহমদ। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক মো. শহীদুল আলম, এনডিসি, ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালেহ, সিনিয়র ডিরেক্টর কেএমএম মোর্শেদ এবং মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের প্রধান শরিফুল হাসান এ সময় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রী ইমরান আহমদ বলেন, মতামত তৈরি ও নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাংবাদিকই পারেন সঠিক তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে অভিবাসীদের জন্য সংবাদ প্রকাশ করতে। সূত্র: ৩১ ডিসেম্বর ২০২১, দৈনিক ইত্তেফাক

ফজলুল হক স্মৃতি পুরস্কার পেলেন কাজী হায়াৎ ও মাজহারুল ইসলাম

চলচ্চিত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'ফজলুল হক স্মৃতি পুরস্কার' পেলেন কিংবদন্তি চলচ্চিত্র নির্মাতা কাজী হায়াৎ ও 'অন্যদিন' সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম। ২৬ অক্টোবর রাজধানীর তেজগাঁওয়ে চ্যানেল আইয়ের কার্যালয়ে ফজলুল হক স্মৃতি কমিটি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পুরস্কারের অর্থমূল্য হিসাবে প্রত্যেককে ২৫ হাজার টাকা, সম্মাননাপত্র ও ক্রেস্ট তুলে দেন অতিথিরা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও নাট্যনির্দেশক নাসির উদ্দীন ইউসুফ, সৈয়দ সালাহউদ্দীন জাকী, অভিনেতা আল মনসুর, ফজলুল হকের মেয়ে বিশিষ্ট রন্ধনশিল্পী কেকা ফেরদৌসী, প্রকৃতিবন্ধু মুকিত মজুমদার বাবু, বাচসাসের সাবেক সভাপতি আবদুর রহমান, নুরুল আলম বাবু প্রমুখ।

চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার অন্যতম পথিকৃৎ, প্রথম চলচ্চিত্রবিষয়ক পত্রিকা 'সিনেমা'র সম্পাদক, প্রথম শিশু চলচ্চিত্র 'প্রেসিডেন্ট'-এর পরিচালক ফজলুল হক। প্রতিবছর ২৬ অক্টোবর তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে দেওয়া হয় এ পুরস্কার। প্রয়াত ফজলুল হক স্মরণে ২০০৪ সাল থেকে এই পুরস্কার প্রবর্তন করেন বিশিষ্ট কথাশিল্পী রাবেয়া খাতুন।

সূত্র: ২৭ অক্টোবর ২০২১, সমকাল

শান্তিতে নোবেল দুই সাংবাদিকের

কর্তৃত্ববাদী শাসনকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা দুই সাংবাদিক পেলেন এবারের শান্তির নোবেল।

নরওয়ের নোবেল ইনস্টিটিউট ৮ অক্টোবর অসলোতে সংবাদ সম্মেলনে ১০২তম নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য ফিলিপাইনের মারিয়া রেসা এবং রাশিয়ার দিমিত্রি মুরাতভের নাম ঘোষণা করে।

নোবেল কমিটির প্রধান বেরিট রেইস অ্যান্ডারসেন বলেন, গণতন্ত্র আর টেকসই শান্তির অন্যতম পূর্বশর্ত মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে লড়াইয়ে 'সাহসী' ভূমিকার জন্য এ পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে তাদের। বিশ্বে গণতন্ত্র আর

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যখন ক্রমেই হুমকির মুখে পড়ছে; এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে যারা এই আদর্শের জন্য লড়াই করে চলেছেন, সেসব সাংবাদিকের প্রতিনিধিত্ব করছেন মারিয়া ও মুরাতভ।

১৯৩৫ সালে জার্মান সাংবাদিক কার্ল ফন ওজিয়েতস্কির পর এই প্রথম কোনো সাংবাদিককে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য বেছে নিল নরওয়ের নোবেল কমিটি। এমন সময় এই দুই সাংবাদিক নোবেল পুরস্কার পেলেন, যখন বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সংকুচিত হয়ে পড়েছে এবং সাংবাদিকরা ক্রমবর্ধমান চাপের মধ্যে কাজ করছেন। কর্তৃত্ববাদী সরকারের পাশাপাশি অন্যান্য বৈরী শক্তিও মুক্ত সাংবাদিকতার বিরুদ্ধে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সূত্র: ৯ অক্টোবর ২০২১, সমকাল

শোক সংবাদ

রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ

একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও সাংবাদিক নেতা রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ (৭৭) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৫ ডিসেম্বর ঢাকার বেসরকারি একটি হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। অবিভক্ত সাংবাদিক ইউনিয়ন ও বিএফইউজের নেতৃত্বদানকালে সাংবাদিক সমাজের পেশাগত মানোন্নয়নে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। শ্রদ্ধা জানানোর জন্য রিয়াজ উদ্দিন আহমেদের লাশ ২৬ ডিসেম্বর বেলা ১১টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে রাখা হয়। দুপুর দেড়টায় সেখানেই তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর দাফন করা হয় রাজধানীর বনানী কবরস্থানে।

রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৭ সালে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর এবং ১৯৭২ সালে এলএলবি পাশ করেন। ১৯৬৮ সালে সাংবাদিকতা শুরু করেন পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকায় যোগদানের মধ্য দিয়ে। তিনি ডেইলি স্টারের উপসম্পাদক, ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের প্রধান সম্পাদক, ডেইলি টেলিগ্রাফের সম্পাদক এবং নিউজ টুডের সম্পাদক ও প্রকাশকের দায়িত্ব পালন করেছেন। সর্বশেষ ফিন্যান্সিয়াল হেরাল্ড পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন। তাঁর জন্ম ১৯৪৫ সালের ৩০ নভেম্বর নরসিংদী জেলার মনোহরদীর নারান্দী গ্রামে। তিনি ১৯৭০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের কার্যকরী সদস্য হিসাবে ট্রেড ইউনিয়নে যুক্ত হন। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক, ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৪ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের মহাসচিব এবং ১৯৮৬ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত সভাপতি ছিলেন। সম্পাদক পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যও ছিলেন।

একাত্তরের ২৫ মার্চ তিনি পাকিস্তান অবজারভারের চাকরি ছেড়ে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করেন এবং স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ অবজারভারে যোগ দেন। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সেখানে প্রধান প্রতিবেদক ও বিশেষ প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। তিনি সার্কভুক্ত দেশগুলোর সাংবাদিকদের ফেডারেশন সমন্বয়ে গঠিত দক্ষিণ এশিয়া সাংবাদিক সমন্বয় পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সাউথ এশিয়ান ফ্রি মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের (সাফমা) সভাপতি ছিলেন। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ছিলেন ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত। এরপর ২০০২ থেকে আবার দুই দফা প্রেস ক্লাবের সভাপতি নির্বাচিত হন। ছাত্ররাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন রিয়াজ উদ্দিন। ছাত্রলীগ নেতৃত্বে ছিলেন তিনি। ২০০০ সালে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার তথ্য উপদেষ্টাও ছিলেন কিছুদিন। কাজের স্বীকৃতি হিসাবে রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ শেরেবাংলা পদক, মওলানা আকরম খাঁ স্বর্ণপদক, নরসিংদী প্রেস ক্লাব পদক, মাদকবিরোধী ফেডারেশন স্বর্ণপদকসহ বিভিন্ন পদক ও সম্মাননা অর্জন করেন।

রফিকুল হক দাদুভাই

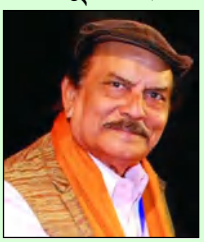

শিশুসাহিত্যিক, ছড়াকার ও দৈনিক যুগান্তরের ফিচার এডিটর রফিকুল হক দাদুভাই (৮৫) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। ১০ অক্টোবর রাজধানীর মুগদার নিজ বাসায় তিনি মারা যান। রফিকুল হকের জন্ম ১৯৩৭ সালের ৮ জানুয়ারি। তাঁর গ্রামের বাড়ি রংপুরের কামালকাচনায়। সত্তরের দশকে গড়া শিশু-কিশোরদের সংগঠন চাঁদের হাটের প্রতিষ্ঠাতা দাদুভাই। এর আগে তাঁর পরিকল্পনায় এবং তত্ত্বাবধানে দৈনিক পূর্বদেশে 'চাঁদের হাট' নামে ছোটোদের একটি পাতা বের হতো। তখন থেকে তিনি 'দাদুভাই' নামে পরিচিতি পান। পরে ১৯৭৪ সালে 'চাঁদের হাট' নামে শিশু সংগঠন গড়ে তোলেন।

বাংলা শিশুসাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য রফিকুল হক দাদুভাই ২০০৯ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একই বছর বাংলাদেশ শিশু একাডেমি পুরস্কার, অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার, চন্দ্রাবতী একাডেমি পুরস্কার, নিখিল ভারত শিশুসাহিত্য পুরস্কারসহ দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন পুরস্কার লাভ করেন। নব্বইয়ের দশকে প্রতিষ্ঠিত দৈনিক রূপালীর নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন বর্ষীয়ান এ সাংবাদিক। এর আগে দৈনিক জনতার নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন। কাজ করেছেন দৈনিক লাল-সবুজ, আজাদ, বাংলাদেশ অবজারভারে। সত্তরের দশকে শিশু-কিশোরদের জনপ্রিয় 'কিশোর বাংলা' নামের সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন তিনি। 'বর্গি এলো দেশে'সহ তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা সাতটি।

হামিদুজ্জামান রবি

জাতীয় প্রেস ক্লাবের জ্যেষ্ঠ সদস্য সাংবাদিক হামিদুজ্জামান রবি (৭৩) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। ২৭ সেপ্টেম্বর

রাজধানীর ধানমন্ডির বাসায় তাঁর মৃত্যু হয়। হামিদুজ্জামান রবি ১৯৭২ সালে সাংবাদিকতা শুরু করেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) মাধ্যমে। ২০০৮ সালে বাসসের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক হিসাবে অবসর নেন। আশির দশকে বাংলাদেশ বিমানের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১০ বছর বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) প্রেসিডেনশিয়াল করেসপনডেন্টও ছিলেন তিনি।

নূরুল ইসলাম বরিন্দী

কবি ও সাহিত্যিক দৈনিক ইত্তেফাকের সাবেক সিনিয়র সম্পাদনা সহকারী নূরুল ইসলাম বরিন্দী (৭৩) আর নেই। ২৭ সেপ্টেম্বর ঢাকার মুগদা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। নূরুল ইসলাম বরিন্দীর লেখা প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'নোবেল বিজয়ীদের সেরা গল্প', 'নানা দেশের রূপকথা', 'গল্প শোনো বিজ্ঞানের' উল্লেখযোগ্য।

গোলাপ মুনীর

সিনিয়র সাংবাদিক, বিশিষ্ট কলামিস্ট ও দৈনিক নয়াদিগন্তের সহকারী সম্পাদক গোলাপ মুনীর আর নেই (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। ১৮ সেপ্টেম্বর তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) ইন্তেকাল করেন। গোলাপ মুনীর ঢাকা সংবাদিক ইউনিয়ন-ডিইউজে (একাংশ) ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সদস্য ছিলেন।

জাহিদুজ্জামান ফারুক

জাতীয় প্রেস ক্লাবের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) জ্যেষ্ঠ সদস্য ও দৈনিক অর্থনীতির সম্পাদক প্রবীণ সাংবাদিক জাদিুজ্জামান ফারুক (৭২) ১৯ আগস্ট রাজধানীতে নিজ বাসায়

ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। জাহিদুজ্জামান ফারুক ক্যানসারে ভুগছিলেন। জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে জানাজা শেষে রাজধানীর নিকুঞ্জ-১ কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়।

কাফি খান

প্রখ্যাত সাংবাদিক ও বাচিকশিল্পী কাফি খান (৯৩) আর নেই। ১ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ার আর্লিংটনে একটি হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসারে ভুগছিলেন।

তিনি ১৯৬৬ সালে যোগ দেন ভয়েস অব আমেরিকায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ওয়াশিংটনে থেকেই স্বাধীনতার পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭৩ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন।

অরুণ বসু

জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও প্রথমা প্রকাশনের সমন্বয়ক অরুণ বসু (৬৮) আর নেই। ৭ অক্টোবর রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছিলেন। ৫ অক্টোবর তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। অরুণ বসুর জন্ম ১৯৫৩ সালের ১০ নভেম্বর। ১৯৯৯ সালের ১ মার্চ তিনি প্রথম আলোতে যোগ দেন। এর আগে তিনি গণসাহায্য সংস্থায় সমন্বয়কারী হিসাবে ছয় বছর কাজ করেন।

মো. লুৎফর রহমান বীনু

প্রবীণ ফটোসাংবাদিক জাতীয় প্রেস ক্লাবের জ্যেষ্ঠ সদস্য মো. লুৎফর রহমান বীনু (৬৬) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। রাজধানীর খিলগাঁওয়ের বাসা থেকে অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়ার পথে ২৬ জুলাই তার মৃত্যু হয়। লুৎফর রহমান বীনু সর্বশেষ দৈনিক ইনকিলাবের জ্যেষ্ঠ ফটোসাংবাদিক হিসাবে অবসর নেন। তার উল্লেখযোগ্য ফটো অ্যালবাম ও ছবির বইয়ের মধ্যে রয়েছে ঢাকা-৭১, স্ট্রাগল ফর ডেমোক্রেসি, আমাদের প্রধানমন্ত্রী, এ চলার শেষ নেই। জানাজা শেষে তার লাশ পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

আবুল মনসুর চৌধুরী

ডেইলি অবজারভারের যুগ্মবার্তা সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল মনসুর চৌধুরী (৬৮) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। ৯ আগস্ট রাজধানীর ইবনে সিনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

ফেনীর পরশুরাম উপজেলার কোলাপাড়া গ্রামে জানাজা শেষে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় পারিবারিক কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়।

আরিফুল ইসলাম ডালিম

সাংবাদিক আরিফুল ইসলাম ডালিম (৩৯) করোনায় আক্রান্ত হয়ে ১২ আগস্ট ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। চুয়াডাঙ্গায় শরীরিক অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকা নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। সাংবাদিক ডালিম যমুনা টেলিভিশন, দৈনিক দেশ রূপান্তর ও ইউএনবির চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি ছিলেন। ডালিম ছিলেন চুয়াডাঙ্গা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক।

কামরুন নাহার রুমা

করোনায় আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সহকারী অধ্যাপক ও সাবেক ক্রীড়া সাংবাদিক কামরুন নাহার রুমা। ৯ আগস্ট রাজধানীর ইমপালস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৩৯ বছর। তিনি দৈনিক অবজারভারের ক্রীড়া সম্পাদক মশিউর রহমানের স্ত্রী। জানাজা শেষে কামরুন নাহারের লাশ গ্রামের বাড়ি নরসিংদীতে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী কামরুন নাহার পিআইবিতে যোগদানের আগে বাংলাদেশ অবজারভার ও ডেইলি অবজারভারে কাজ করেছেন। ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটির সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিভাগেও তিনি শিক্ষকতা করেছেন।

আবদুর রহিম

প্রবীণ সাংবাদিক, দৈনিক ইনকিলাবের সিনিয়র রিপোর্টার আবদুর রহিম (৭৫) ৬ আগস্ট রাজধানীর একটি হাসপাতালে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। খিলগাঁও তিলপাপাড়া মসজিদে জানাজা শেষে শাহজাহানপুর কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়।

মিজানুর রহমান তোতা

যশোর প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও দৈনিক ইনকিলাবের বিশেষ প্রতিনিধি মিজানুর রহমান তোতা (৬৫) ১৭ জুলাই যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। শহরের পালবাড়ী জামে মসজিদে জানাজা শেষে খয়েরতলায় পারিবারিক কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়। মিজানুর রহমান তোতা প্রায় ৪৫ বছরের সাংবাদিকতা জীবনে ৩৫ বছরই কাজ করেছেন দৈনিক ইনকিলাবে।

শাহাবুদ্দিন আহমেদ

খুলনায় সাংবাদিকদের গুরু হিসাবে খ্যাত খুলনা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি প্রবীণ সাংবাদিক শাহাবুদ্দিন আহমেদ (৮৪) ৩ জুলাই রাজধানীর একটি হাসপাতালে বার্ধক্যজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)।

শাহাবুদ্দিন আহমেদের জন্ম ১৯৩৯ সালের ১ জানুয়ারি মানিকগঞ্জে। বাবার চাকরির সুবাদে খুলনায় পড়ালেখা করেন। ১৯৬৫ সালে খুলনার স্থানীয় ওয়েভ পত্রিকার মাধ্যমে সাংবাদিকতা শুরু করেন। ৪৪ বছরের পেশাগত জীবনে সাপ্তাহিক হলিডে, বাংলাদেশ টাইমস, টেলিগ্রাফ, ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস ও ইনডিপেনডেন্ট পত্রিকায় কাজ করেছেন।

মুশফিকুর রহমান

ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ফরিদপুর বাণী পত্রিকার সম্পাদক, দৈনিক অর্থনীতি পত্রিকার সাবেক জেলা প্রতিনিধি, ফরিদপুর শহরের ঝিলটুলী মহল্লার বাসিন্দা, জেলা প্রেস ক্লাবের সদস্য মুশফিকুর রহমান ঝান্ডা (৬২) শ্বাসকষ্টজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে ২৩ জুলাই একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। আশির দশকের সূচনালগ্নে মুশফিকুর রহমান সাংবাদিকতা শুরু করেন। ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক জাগরণ পত্রিকার মাধ্যমে তার সাংবাদিকতার হাতেখড়ি।

আব্দুর রাজ্জাক

ঈশ্বরদী প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রাজ্জাক (৭০) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। ২৫ জুলাই রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। পাকশীতে জানাজা শেষে তার লাশ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়।

দিদারুল আলম

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক নির্বাহী সদস্য, চট্টগ্রাম ফটো-জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন এবং চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য দিদারুল আলম (৫২) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। ১৯ আগস্ট চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি বাংলাদেশ প্রতিদিনের চট্টগ্রাম ব্যুরো অফিসে সিনিয়র ফটো-জার্নালিস্ট হিসাবে কর্মরত ছিলেন। এছাড়াও তিনি দৈনিক যুগান্তর, অবজারভারসহ বিভিন্ন পত্রিকায় কাজ করেছেন।

অরুণ দাশগুপ্ত

কবি ও সাংবাদিক অরুণ দাশগুপ্ত (৮৬) বার্ধক্যজনিত কারণে ১০ জুলাই চট্টগ্রামের পটিয়ার ধলঘাট গ্রামে নিজ বাড়িতে পরলোকগমন করেন। দৈনিক আজাদীর

সহযোগী সম্পাদক অরুণ দাশগুপ্ত ছিলেন অকৃতদার।

অরুণ দাশগুপ্ত ২০১৫ সালে পত্রিকাটি থেকে দাপ্তরিকভাবে অবসরে গেলেও আমৃত্যু তিনি সহযোগী সম্পাদকের পদে ছিলেন। ১৯৩৬ সালের ১ জানুয়ারি ধলঘাট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন অরুণ। পরে শিক্ষার জন্য কলকাতায় যান তিনি। লোকসেবক পত্রিকার মধ্য দিয়ে সাংবাদিকতা শুরু করেন। পরে দেশে ফিরে তিনি শিক্ষকতাসহ বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হন। ১৯৭৩ সালে দৈনিক আজাদীতে সহ-সম্পাদক হিসাবে কাজ শুরু করেন এই কবি। তখন থেকেই তিনি পত্রিকার সাহিত্য পাতা সম্পাদনা করতেন।

শাকির আহমেদ

হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে না-ফেরার দেশে চলে গেলেন মৌলভীবাজারের কুলাউড়ার তরুণ প্রতিভাবান সাংবাদিক শাকির আহমেদ (৩৪) (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। ৬ আগস্ট সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিভিন্ন সময়ে দৈনিক আমাদের অর্থনীতি, দৈনিক জাগরণ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার ছিলেন তিনি।

মোস্তফা কামাল

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দৈনিক যুগান্তরের খুলনা ব্যুরোপ্রধান মোস্তফা কামাল আহমেদ (৫১) ৮ জুলাই ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)।

আশির দশকে খুলনা থেকে প্রকাশিত গণদেশ পত্রিকার মাধ্যমে সাংবাদিকতা শুরু করেন মোস্তফা কামাল। এরপর দৈনিক প্রবাহের প্রধান প্রতিবেদক, বাংলাবাজার পত্রিকার খুলনা ব্যুরোপ্রধান হিসাবে কাজ করেছেন তিনি।

আবুল কালাম আজাদ (বিপ্লব)

প্রথম আলোর সম্পাদনা সহকারী আবুল কালাম আজাদ (বিপ্লব) (৪৯) আর নেই। ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়ে ১৩ জুলাই রাজধানীর একটি হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন

(ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। আবুল কালাম আজাদ ২০১০ সাল থেকে প্রথম আলো পরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

রুহুল কুদ্দুস মনি

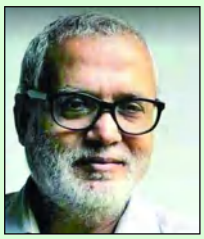

সাংবাদিক রুহুল কুদ্দুস মনি (৬৬) আর নেই। ২০ জুলাই করোনায় আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। কর্মজীবনে সর্বশেষ তিনি বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থায় (বাসস) সিনিয়র সাব-এডিটর হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৮০ সালে সাপ্তাহিক পাবনা বার্তায় সাংবাদিক হিসাবে যোগদান করেন। ঢাকায় এসে দিনকাল, বাংলাবাজার পত্রিকা, বাসসসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করেন। একসময় বাংলাদেশ টেলিভিশনে নদী ও পানিবিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান 'সুখ দুঃখের নদী' এবং 'দৈনন্দিন খাবার ও পুষ্টি' অনুষ্ঠান পরিকল্পনা, উপস্থাপনা ও পরিচালনা করতেন তিনি। বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা মৈত্রী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব ছিলেন তিনি।

মুহীউদ্দিন আহম্মদ

প্রবীণ সাংবাদিক মুহীউদ্দিন আহম্মদ (৭৭) আর নেই। ১৪ জুলাই রাজধানীর বনশ্রীর নিজ বাসভবনে বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)।

মুহীউদ্দিন আহম্মদ ১৯৭০ সালে দ্য পিপল (অধুনালুপ্ত) পত্রিকা দিয়ে সাংবাদিকতা শুরু করেন। পরে দ্য বাংলাদেশ অবজারভারে কাজ করেন। ২০১৩ সালে বার্তা সংস্থা ইউএনবির বার্তা সম্পাদক পদ থেকে অবসর নেন।

সেলিম চৌধুরী

দৈনিক বাংলাদেশের আলোর বিনোদন সম্পাদক সেলিম চৌধুরী (৫৫) আর নেই। ১৩ সেপ্টেম্বর রাজধানীর লালমাটিয়া ইস্টার্ন কেয়ার হসপিটালে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি.. রাজিউন)। সাংবাদিক

সেলিম চৌধুরী বহু দৈনিক ও ম্যাগাজিনে কর্মরত ছিলেন। সাংবাদিকতায় বিনোদন বিভাগে সেলিম চৌধুরীর চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগে তার সাবলীল লেখনীর মাধ্যমে পাঠকের হৃদয়ে বিশেষ স্থান করে নেন।

বজলুল করিম

জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বজলুল করিম (৮১) ২৯ জুলাই রাজধানীর একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। তিনি সাংবাদিকতা শুরু করেন ১৯৬৮ সালে। তিনি সর্বশেষ বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) বার্তা সম্পাদক ছিলেন। তার গ্রামের বাড়ি চট্টগ্রামের চান্দগাঁও থানার চর রাঙ্গামাটিয়া গ্রামে।

শফিকুল ইসলাম জনি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় ট্রাকচাপায় সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম জনি নিহত হয়েছেন। ১৮ অক্টোবর ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ পুরোনো সড়কের ফতুল্লার পঞ্চবটি কলোনির সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত অবস্থায় তাকে ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। ফতুল্লা মডেল প্রেস ক্লাবের সদস্য ও চ্যানেল এস টিভির ফতুল্লা প্রতিনিধি ও স্থানীয় নারায়ণগঞ্জের আলো পত্রিকার ফটোসাংবাদিক ছিলেন জনি। এছাড়া তিনি ফটো নারায়ণগঞ্জ অনলাইন পোর্টাল সম্পাদনা করতেন। স্থানীয় মসজিদে জানাজা শেষে মাসদাইর কেন্দ্রীয় কবরস্থানে জনির মরদেহ দাফন করা হয়।

আবু জাফর সাবু

বরেণ্য ছড়াকার ও সাহিত্যিক, গাইবান্ধা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক জনকণ্ঠের নিজস্ব সংবাদদাতা আবু জাফর সাবু (৭৪) আর নেই। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বগুড়া টিএমএসএস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৮ আগস্ট তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। গাইবান্ধা ইসলামিয়া হাইস্কুল মাঠে জানাজা শেষে পৌর কবরস্থানে তার মরদেহ দাফন করা হয়।

রাজা সিরাজ

দৈনিক খবরের সিনিয়র রিপোর্টার রাজা সিরাজ (৫৮) ৩০ নভেম্বর রাজধানীর কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। কিশোরগঞ্জের সদর উপজেলার সাদুল্লাহচর গ্রামের বাড়িতে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়।

সৈয়দ আকরাম

জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য ও দৈনিক দিনকালের সিনিয়র সহ-সম্পাদক সাংবাদিক সৈয়দ আকরাম ২৫ ডিসেম্বর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। নড়াইলের লোহাগড়া থানার ধলাইতলা গ্রামের বাড়ির পারিবারিক কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়। সৈয়দ আকরাম ১৯৭২ সালে দৈনিক জনপদ পত্রিকার মাধ্যমে সাংবাদিকতা শুরু করেন। ১৯৮৯ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত দৈনিক দিনকালে কর্মরত ছিলেন তিনি। এর আগে তিনি দৈনিক আজাদ ও দৈনিক জনপদ এবং খুলনার তৎকালীন সাপ্তাহিক স্বাধিকার ও সাপ্তাহিক সকাল পত্রিকায় কাজ করেন।

দিলীপ কুমার

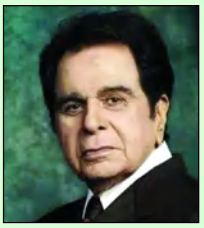

জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকে দূর আকাশে চলে গেলেন কিংবদন্তি অভিনেতা দিলীপ কুমার (৯৮)। রুপালি পর্দায় তাঁর দৃপ্তকণ্ঠস্বরে আন্দোলিত হতো মানুষের স্বপ্ন ও আগামী। অবিস্মরণীয় অভিনেতা দিলীপ কুমার ছিলেন গোটা দুনিয়ার সিনেমাপ্রেমী মানুষের আনন্দ-বেদনা আর ভালোবাসার অনন্য রূপকার। ৭ জুলাই মুম্বাইয়ের হিন্দুজা হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

দানিশ সিদ্দিকি

আফগানিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী ও তালেবানের মধ্যকার সংঘর্ষের সময় পুলিৎজারজয়ী ফটোসাংবাদিক দানিশ সিদ্দিকি নিহত হয়েছেন। তিনি বার্তা সংস্থা রয়টার্সে কাজ করতেন। ১৬ জুলাই তিনি নিহত হন।

পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের কাছে কান্দাহার সীমান্তের স্পিন বলদাক এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিতে তালেবানদের সঙ্গে লড়াই করছে আফগানিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী। সেখানে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন সাংবাদিক দানিশ। দুই পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি চলাকালে নিহত হন বলে জানিয়েছে আফগানিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী। রয়টার্সের ফটোগ্রাফি দল ২০১৮ সালে রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে কাজ করে পুলিৎজার পুরস্কার জিতেছিল। সেই দলে ছিলেন দানিশ সিদ্দিকি। তিনি ২০১০ সাল থেকে রয়টার্সের সঙ্গে কাজ করতেন।

অর্লান্দো দিনয়

ফিলিপাইনে বন্দুকধারীর গুলিতে অর্লান্দো দিনয় নামে এক সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। স্থানীয় পুলিশপ্রধান মেজর পিটার প্লেন ইপং ৩০ অক্টোবর মিন্দানাও দ্বীপের বানসালান শহরের নিজ ভবনে তিনি নিহত হন। বন্দুকধারী তাকে ছয়টি গুলি করে। দিনয় ফিলিপাইনের অনলাইন সংবাদমাধ্যম নিউজলাইন ফিলিপাইনদের প্রতিবেদক ও রেডিয়ো এনার্জি এফএফ-এর উপস্থাপক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ফিলিপাইনের সাংবাদিকদের সংগঠন ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্টদের তথ্যমতে, ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট হিসাবে রদ্রিগো দুতার্তের ক্ষমতায় আসার পর থেকে একের পর এক সাংবাদিক হত্যার ঘটনা ঘটছে। সর্বশেষ নিহত সাংবাদিকদের এ তালিকায় দিনয়ের অবস্থান ২১তম।

আবদিয়াজিজ মোহাম্মদ গুলেদ

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিসুতে আত্মঘাতী হামলায় দেশটির প্রথিতযশা সাংবাদিক আবদিয়াজিজ মোহাম্মদ গুলেদ নিহত হয়েছেন। তিনি ইসলামপন্থী সন্ত্রাসীগোষ্ঠী আল শাবাবের সমালোচক ছিলেন। আল শাবাব ওই হামলার দায় স্বীকার করেছে। ওই সাংবাদিক সোমালিয়ায় আবদিয়াজিজ আফ্রিকা নামে পরিচিত।

পিআইবি ই-লার্নিং প্ল্যাটফরমের উদ্‌বোধন এবং বিগত কোর্সের সনদপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য দিচ্ছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ এমপি

ই-লার্নিংয়ের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখা সম্ভব: তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ এমপি বলেছেন, দেশ এখন পরিপূর্ণ ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে। ই-লার্নিংয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ অনেক বেড়েছে। আগামী দিনে ই-লার্নিং প্ল্যাটফরমের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রশিক্ষণার্থীরা দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। ড. হাছান মাহ্‌মুদ ২ নভেম্বর বিকালে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত পিআইবি ই-লার্নিং প্ল্যাটফরমের উদ্‌বোধন এবং বিগত কোর্সের সনদপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। মন্ত্রী আরও বলেন, গত এক দশকে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের পাশাপাশি গণমাধ্যমেরও ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। দেশে বহু বেসরকারি রেডিয়ো-টেলিভিশন ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রসার ঘটেছে। তিনি বলেন, ২০১৫ সালে সব সূচকে আমরা পাকিস্তানকে পেছনে ফেলেছি। ভারতকেও কিছু কিছু সূচকে আমরা পেছনে ফেলেছি। মাথাপিছু আয়ে আমরা ভারত থেকে এগিয়ে। এসব উন্নয়ন অগ্রগতির খবর জনগণের কাছে তুলে ধরা গণমাধ্যমের দায়িত্ব। এক্ষেত্রে উন্নয়ন সাংবাদিকতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের বক্তব্যে পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির দিক দিয়ে বাংলাদেশ অনেক এগিয়েছে। আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশের সুযোগ-সুবিধাগুলোকে কাজে লাগাতে চাই দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে। তিনি জানান, পিআইবি ই-লার্নিং প্ল্যাটফরমে বর্তমানে চারটি কোর্স চলছে। আগামী দিনে আরও কোর্স যুক্ত হবে। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুভাষ চন্দ বাদল, পিআইবির পরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ আফরাজুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ পিআইবি ই-লার্নিং প্ল্যাটফরমের উদ্‌বোধন করেন।

প্রধানমন্ত্রীর ১০ উদ্যোগবিষয়ক ৮টি অনলাইন কর্মশালা অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে বিভিন্ন জেলার সাংবাদিকদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগবিষয়ক আটদিনব্যাপী অনলাইন কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে। ১৩ জুলাই সিলেট, ১৪ জুলাই চট্টগ্রাম, ২৮ জুলাই পাবনা, ১২ আগস্ট রংপুর, ১৩ আগস্ট কুষ্টিয়া, ১৪ আগস্ট জামালপুর, ১৭ আগস্ট ভোলা এবং ২৭ আগস্ট বরিশাল জেলার সাংবাদিকদের জন্য এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। জুম প্ল্যাটফরমে আয়োজিত কর্মশালায় প্রধান আলোচক ছিলেন এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার পত্রিকার সম্পাদক মোল্লা এম আমজাদ হোসেন। কর্মশালায় মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। কর্মশালায় ২১৭ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

তথ্য অধিকার আইনবিষয়ক ১০টি অনলাইন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে বিভিন্ন জেলার সাংবাদিকদের জন্য তথ্য অধিকার আইনবিষয়ক ১০টি অনলাইন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬ জুলাই যশোর, ৭ ও ১০ জুলাই কক্সবাজার, ১২ জুলাই নেত্রকোনা, ১৪ জুলাই ফরিদপুর, ১৮ জুলাই পঞ্চগড়, ৮ আগস্ট টাঙ্গাইল, ৯ আগস্ট কুষ্টিয়া, ১১ আগস্ট কুমিল্লা এবং ১২ আগস্ট নড়াইল জেলার সাংবাদিকদের জন্য এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। জুম প্ল্যাটফরমে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণগুলোয় সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণে ২৮৯ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

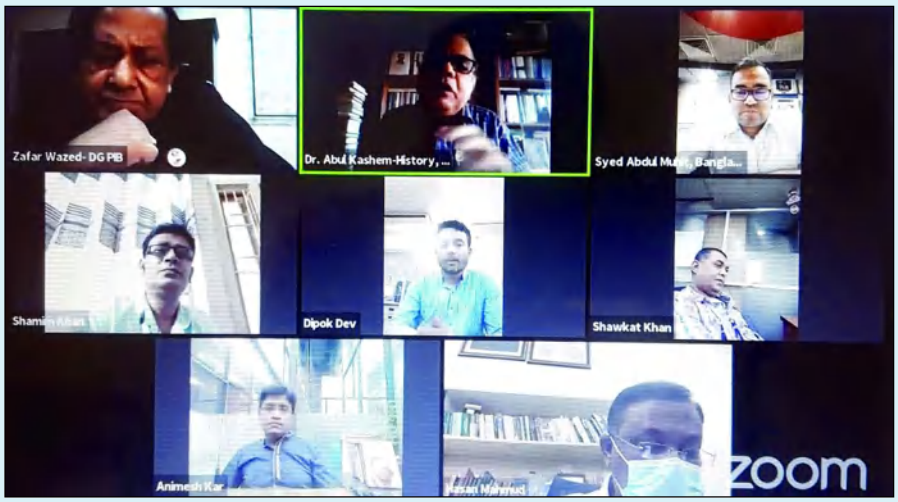

পিআইবি'র আয়োজনে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে জুম প্ল্যাটফরমে আলোচনাসভা

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকার সাংবাদিকদের সঙ্গে ৩০ আগস্ট এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জুম প্ল্যাটফরমে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ এমপি। বিশেষ অতিথি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মকবুল হোসেন পিএএ। আলোচনাসভায় আলোচক ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুল কাশেম এবং পিআইবির সাবেক সহযোগী সম্পাদক ড. মোহাম্মদ হান্নান। আলোচনাসভায় মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। আলোচনাসভায় ঢাকায় বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত ৩০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯২তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯২তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে ৮ আগস্ট এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জুম প্ল্যাটফরমে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় আলোচক ছিলেন দৈনিক বাংলাদেশের খবরের সম্পাদক আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. এম আবুল কাশেম। কর্মশালায় মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। কর্মশালায় ২৬ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

দুর্যোগ সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে বিভিন্ন জেলার সাংবাদিকদের জন্য দুইদিনব্যাপী দুর্যোগ সাংবাদিকতাবিষয়ক ৫টি অনলাইন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৮ ও ৯ জুলাই খুলনা, ১১ ও ১২ জুলাই বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা, ১৬ ও ১৭ জুলাই বরগুনা ও পিরোজপুর, ৩ ও ৪ আগস্ট কক্সবাজার এবং ২০ ও ২১ আগস্ট চট্টগ্রাম জেলার সাংবাদিকদের জন্য এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। জুম প্ল্যাটফরমে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণগুলোয় রিসোর্স পারসন ছিলেন সিনিয়র সাংবাদিক ও লেখক রফিকুল ইসলাম মন্টু। প্রশিক্ষণগুলোয় ১৪৭ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক তিনদিনব্যাপী (২৬-২৮ আগস্ট) প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। পিআইবি সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে পিআইবির প্রশিক্ষণ বিভাগের কর্মকর্তা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমের সিনিয়র সাংবাদিকরা অংশগ্রহণ করেন। ২৮ আগস্ট প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণে রিসোর্স পারসন ছিলেন মোবাইল সাংবাদিকতা বিশেষজ্ঞ ড. জামিল খান।

চাঁদপুরের সাংবাদিকদের জন্য দুটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে চাঁদপুর জেলার সাংবাদিকদের

চাঁদপুর জেলার সাংবাদিকদের জন্য সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি ও অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিচ্ছেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সাংবাদিকদের জন্য অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

জন্য তিনদিনব্যাপী (১৩-১৫ সেপ্টেম্বর) অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ এবং সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ১৫ সেপ্টেম্বর বিকালে চাঁদপুর প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে প্রশিক্ষণ দুটির সমাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। বিশেষ অতিথি চাঁদপুর পৌরসভার মেয়র জিল্লুর রহমান জুয়েল। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন চাঁদপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ইকবাল হোসেন পাটওয়ারী। প্রশিক্ষণ দুটিতে ৭০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

চাঁদপুরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে চাঁদপুর জেলার সাংবাদিকদের জন্য ১৬ সেপ্টেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চাঁদপুর প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। বিশেষ অতিথি চাঁদপুর পুলিশ সুপার মো. মিলন মাহমুদ এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ইমতিয়াজ হোসেন। কর্মশালায় সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন চাঁদপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ইকবাল হোসেন পাটওয়ারী। প্রধান আলোচক ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. প্রদীপ কুমার পাণ্ডে। কর্মশালায় ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের সাংবাদিকদের জন্য বুনিয়াদি ও অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি ও অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ১৯-২১ সেপ্টেম্বর অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ এবং ২৩-২৫ সেপ্টেম্বর সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ দুটির সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রশাসক মো. মঞ্জুরুল হাফিজ প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন। জুম প্ল্যাটফরমের মাধ্যমে সমাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণ দুটিতে চাঁপাইনবাবগঞ্জের ৭০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগবিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগবিষয়ক কর্মশালা ২২ সেপ্টেম্বর চাঁপাইনবাবগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়েছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মো. মঞ্জুরুল হাফিজ। জুম প্ল্যাটফরমে কর্মশালায় মডারেটর হিসাবে যুক্ত ছিলেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। কর্মশালায় আলোচক ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. প্রদীপ কুমার পাণ্ডে। কর্মশালায় আরও উপস্থিত ছিলেন পিআইবির পরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ আফরাজুর রহমান। কর্মশালায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

নওগাঁয় সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে নওগাঁ জেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (১৯-২১ সেপ্টেম্বর) সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ২১ সেপ্টেম্বর নওগাঁ কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্রে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে

নওগাঁ জেলার সাংবাদিকদের জন্য সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দিচ্ছেন নওগাঁ জেলা প্রশাসক মো. হারুন অর রশীদ

নওগাঁ জেলার সাংবাদিকদের জন্য অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার এমপি

প্রধান অতিথি ছিলেন নওগাঁর জেলা প্রশাসক মো. হারুন অর রশীদ। বিশেষ অতিথি নওগাঁর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কেএএম মামুন খান চিশতী এবং জেলা তথ্য কর্মকর্তা আবু সালেহ মো. মাসুদুল ইসলাম। প্রশিক্ষণটিতে নওগাঁর ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা দেশকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে: খাদ্যমন্ত্রী

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, সাংবাদিক জাতির বিবেক। সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা দেশকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে। সমাজ ও রাষ্ট্রের চোখ খুলে দেয়। ২৪ সেপ্টেম্বর সকালে নওগাঁয় কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্রে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত তিনদিনব্যাপী অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, সাংবাদিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকবে, সেটি হবে কে আগে তথ্য পাবে, কে আগে সংবাদ প্রকাশ করবে, তা নিয়ে। উন্নয়নমূলক সংবাদ প্রচার তথা ব্র্যান্ডিং করে নওগাঁকে সামনে এগিয়ে নিতে সাংবাদিকরা ভূমিকা রাখবেন। করোনাকালে সাংবাদিকরা সম্মুখযোদ্ধা হিসাবে কাজ করেছেন। মানুষকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করেছেন, যা সত্যিকার অর্থে প্রশংসার দাবি রাখে।

এ সময় জেলা প্রশাসক মো. হারুন অর রশীদ, পিআইবির পরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ আফরাজুর রহমান, নওগাঁ কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্রের অধ্যক্ষ ওহিদুল ইসলাম বক্তব্য দেন। পরে খাদ্যমন্ত্রী অংশগ্রহণকারী ৩৫ জন সাংবাদিকের হাতে সনদ তুলে দেন।

হবিগঞ্জে শিশু ও নারীবিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে হবিগঞ্জ জেলার সাংবাদিকদের জন্য দুইদিনব্যাপী (৩০-৩১ অক্টোবর) শিশু ও নারীবিষয়ক প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। ৩১ অক্টোবর হবিগঞ্জ প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসক ইসরাত জাহান। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির পরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ আফরাজুর রহমান। এর আগে ৩০ অক্টোবর প্রশিক্ষণের উদ্‌বোধন করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণে ৩০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

ময়মনসিংহে মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে ময়মনসিংহ জেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (২-৪ অক্টোবর) মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ৪ অক্টোবর ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ শফিকুর রেজা বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি ছিলেন ময়মনসিংহ রেঞ্জের ডিআইজি ব্যারিস্টার হারুন অর রশিদ। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ এনামুল হক। প্রশিক্ষণটিতে ময়মনসিংহের ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

ময়মনসিংহ জেলার সাংবাদিকদের জন্য মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করছেন ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ শফিকুর রেজা বিশ্বাস

হবিগঞ্জ জেলার সাংবাদিকদের জন্য হাওর সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিচ্ছেন হবিগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য মো. আবু জাহির

হবিগঞ্জে হাওর সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

হবিগঞ্জ জেলার সাংবাদিকদের জন্য প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে তিনদিনব্যাপী (২৭-২৯ অক্টোবর) হাওর সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। হবিগঞ্জ প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। এর আগে ২৭ অক্টোবর প্রধান অতিথি হিসাবে প্রশিক্ষণের উদ্‌বোধন করেন হবিগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য মো. আবু জাহির। প্রশিক্ষণে ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

নেত্রকোনায় হাওর সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত নেত্রকোনা জেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (২১-২৩ নভেম্বর) হাওর সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ২৩ নভেম্বর নেত্রকোনা প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মোহাম্মদ সুহেল মাহমুদ, বিশেষ অতিথি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফখরুজ্জামান জুয়েল, জেলা তথ্য অফিসের উপপরিচালক আল ফয়সাল, প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মুখলেছুর রহমান খান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন নেত্রকোনা প্রেস ক্লাবের সহসভাপতি হায়দার চৌধুরী। প্রশিক্ষণে জেলার ৩৫ জন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

ঢাবি সাংবাদিকদের জন্য মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (১১-১৩ নভেম্বর) মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ১৩ নভেম্বর পিআইবি সেমিনার কক্ষে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণে ৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে আলোচনাসভা (ভার্চুয়ালি) ২৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে। জুম প্ল্যাটফরমে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভায় আলোচক ছিলেন বাসস-এর সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া, এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার পত্রিকার সম্পাদক মোল্লা আমজাদ হোসেন। অনুষ্ঠানে মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। আলোচনায় বক্তরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কর্মময় জীবন, চিন্তা এবং দেশ পরিচালনায় তাঁর দূরদর্শিতা নিয়ে আলোচনা করেন। ৩০ জন সাংবাদিক এই আলোচনাসভায় অংশ নেন।

নেত্রকোনায় শিশু ও নারী উন্নয়নবিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

নেত্রকোনা জেলার সাংবাদিকদের জন্য প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

নেত্রকোনা জেলার সাংবাদিকদের জন্য শিশু ও নারী উন্নয়নবিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

পিআইবি'র আয়োজনে সাংবাদিকতায় ফ্যাক্টচেকবিষয়ক প্রশিক্ষণে সমাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

আয়োজিত দুইদিনব্যাপী (২৪-২৫ নভেম্বর) শিশু ও নারী উন্নয়নবিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ২৫ নভেম্বর নেত্রকোনা প্রেস ক্লাবে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নেত্রকোনা জেলা প্রশাসক কাজি মো. আবদুর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির পরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ আফরাজুর রহমান। প্রশিক্ষণে নেত্রকোনা জেলার ৩০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সদস্যদের জন্য তিনদিনব্যাপী (২৩-২৫ নভেম্বর) সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ২৫ নভেম্বর বিকালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির কার্যালয়ে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক শেখ মো. মনজুরুল হক। বিশেষ অতিথি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির উপদেষ্টা ড. শেখ তৌহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণে ৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

পিআইবিতে ফ্যাক্টচেকবিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে তিনদিনব্যাপী (২৮-৩০ নভেম্বর) সাংবাদিকতায় ফ্যাক্টচেক বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ৩০ নভেম্বর বিকালে পিআইবির সেমিনার কক্ষে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক প্রধান তথ্য কর্মকর্তা সুরথ কুমার সরকার। সভাপ্রধানের দায়িত্বে ছিলেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণে বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

কুমিল্লায় পিআইবির চারটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

কুমিল্লা জেলার সাংবাদিকদের জন্য প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে চারটি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ১৫-১৭ নভেম্বর মোবাইল সাংবাদিকতা এবং অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ, ১৮-১৯ নভেম্বর শিশু ও নারী উন্নয়নবিষয়ক প্রশিক্ষণ, ১৮-২০ নভেম্বর বেসিক সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং ২০ নভেম্বর সম্পাদকদের সঙ্গে শিশু ও নারীবিষয়ক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। ২০ নভেম্বর চারটি প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠান কুমিল্লা প্রেস ক্লাব সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কুমিল্লা-৬ আসনের সংসদ সদস্য আ ক ম বাহাউদ্দিন বাহার। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধান ছিলেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রধান অতিথি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন।

শিশু সাংবাদিকদের জন্য প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম (৫ম পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এ দুইদিনব্যাপী (৩-৪ ডিসেম্বর) শিশু সাংবাদিকদের জন্য প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। ৪ ডিসেম্বর পিআইবি সেমিনার কক্ষে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সদস্যদের জন্য তিনদিনব্যাপী সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

সুনামগঞ্জ জেলার সাংবাদিকদের জন্য মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

নজরুল ইসলাম মিঠু। বিশেষ অতিথি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম হাসিব। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণে ৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে।

সুনামগঞ্জের সাংবাদিকদের জন্য মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

সুনামগঞ্জ জেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (১৮-২০ ডিসেম্বর) মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ২০ ডিসেম্বর পিআইবি সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সিনিয়র সাংবাদিক আজিজুল পারভেজ। বিশেষ অতিথি পিআইবির পরিচালক (অধ্যয়ন, প্রশিক্ষণ ও প্রশাসন) মোহাম্মদ আফরাজুর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণে সুনামগঞ্জ জেলার বিভিন্ন গণমাধ্যমের ২৮ জন সংবাদকর্মী অংশগ্রহণ করেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ক্লাবের সদস্যদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ক্লাবের সদস্যদের জন্য তিনদিনব্যাপী (২২-২৪ ডিসেম্বর) সাংবাদিকতায় বুনিয়াাদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ২৪ ডিসেম্বর পিআইবি সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুভাষ চন্দ বাদল। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির গবেষণা উপদেষ্টা (চলতি দায়িত্ব) ড. কামরুল হক। প্রশিক্ষণে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ক্লাবের ২৮ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

পিআইবিতে পাবলিক প্রকিউরমেন্টবিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে সাংবাদিকদের জন্য দিনব্যাপী পাবলিক প্রকিউরমেন্টবিষয়ক প্রশিক্ষণ ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিআইবি সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের উদ্‌বোধন করেন পিআইবির পরিচালক (অধ্যয়ন, প্রশিক্ষণ ও প্রশাসন) মোহাম্মদ আফরাজুর রহমান। প্রশিক্ষণ শেষে পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। প্রশিক্ষণে বিভিন্ন গণমাধ্যমের ৩০ জন সংবাদকর্মী অংশগ্রহণ করেন।

হবিগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলার সাংবাদিকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত হবিগঞ্জ জেলার শায়েস্তাগঞ্জ, বাহুবল, চুনারুঘাট ও মাধবপুর উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (২৯-৩১ ডিসেম্বর) বেসিক জার্নালিজমবিষয়ক (আবাসিক) প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রশিক্ষণে ২৬ জন সাংবাদিক অংশ নিয়েছেন। ৩১ ডিসেম্বর পিআইবি সেমিনার কক্ষে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ওমর ফারুক। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ।

সিলেটে মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

সিলেটের সাংবাদিকদের জন্য প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত তিনদিনব্যাপী (২৩-২৫ ডিসেম্বর)

পিআইবি'র আয়োজনে দিনব্যাপী পাবলিক প্রকিউরমেন্টবিষয়ক প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করছেন অতিথিবৃন্দ

মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৫ ডিসেম্বর শনিবার সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থা হলরুমে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের সনদপত্র বিতরণ এবং প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিলেটের জেলা প্রশাসক এম কাজী এমদাদুল ইসলাম বলেন, সাংবাদিকতা আগের চেয়ে বর্তমানে অনেক প্রতিযোগিতামূলক। তবে এ পেশায় এখন অনেক আগাছা তৈরি হয়েছে। নামসর্বস্ব অনলাইন, ফেসবুকে লাইভ দিয়ে সাংবাদিক বনে যাচ্ছে। নামসর্বস্ব অনিয়মিত পত্রিকা ছাপিয়ে যেনতেনভাবে হেডলাইন দিয়ে জনগণের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে। তাই এসব আগাছা সরিয়ে ফেলার সময় এসেছে। সে জায়গাটি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্বে ছিলেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণে বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

পিআইবি'র উদ্যোগে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিচ্ছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য মুহম্মদ শফিকুর রহমান এমপি

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে পিআইবিতে সেমিনার অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর উদ্যোগে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে ১৫ ডিসেম্বর সকালে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিআইবি সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত সেমিনারে মুখ্য আলোচক হিসাবে বক্তব্য দেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য মুহম্মদ শফিকুর রহমান এমপি। তিনি বলেন, সবদিক দিয়েই দেশ অনেক এগিয়েছে। কিন্তু একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদারদের নৃশংসতায় আমরা যেসব শহিদ বুদ্ধিজীবীকে হারিয়েছি, তাদের সেই শূন্যস্থান এখনো পূরণ হয়নি। তিনি আরও বলেন, একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদার এবং তাদের দোসররা যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে, সেসব হত্যাকারীর প্রতি ঘৃণা আমরা আমাদের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে আজও ছড়িয়ে দিতে পারিনি। এটি আমাদের ব্যর্থতা। তিনি দেশে রাজাকারদের প্রতি ঘৃণা জানানোর জন্য একটি ঘৃণাস্তম্ভ বানানোর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতি অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, শহিদ বুদ্ধিজীবীদের রক্তের দাগ এখনো মুছে যায়নি। আমরা এখনো তাঁদের রক্তের মূল্য দিতে পারিনি। সেমিনারে মডারেটরের ভূমিকা পালন করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। তিনি বলেন, একাত্তরে সাংবাদিকদের একটি অংশ পাকিস্তানি সামরিক সরকারের পক্ষে কাজ করেছে। শহিদ বুদ্ধিজীবীদের হত্যায় তারা ভূমিকা পালন করেছে। তিনি আরও বলেন, দুঃখজনক হলেও সত্যি, আমরা শহিদ সাংবাদিকদের ভুলে গেছি। শহিদ পরিবারগুলোর খোঁজখবরও রাখি না। তিনি বলেন, ইতিহাস কখনো মুছে দেওয়া যায় না। সাময়িক ইতিহাস বিকৃতি করা যায়; কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসই প্রতিষ্ঠিত হবেই হবে। মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তির ইতিহাস বিকৃতির চেষ্টা কখনো সফল হবে না। সেমিনারে আলোচক হিসাবে বক্তব্য দেন শহিদ সাংবাদিক খোন্দকার আবু তালেবের সন্তান খোন্দকার আবুল আহসান, শহিদ সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেনের সন্তান তৌহিদ রেজা নূর। শহিদ বুদ্ধিজীবীর সন্তানরা আলোচনায় তাঁদের পিতার নানা স্মৃতি এবং পরিবারের নানা দুর্বিষহ চিত্র তুলে ধরেন। সেমিনারে বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা অংশগ্রহণ করেন।

রিয়াজ উদ্দিন আহমেদের কফিনে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পিআইবি'র কর্মকর্তাবৃন্দ